ইংলিশ চ্যানেল

নবপত্র প্রকাশনের বই

ইংলিশ চ্যানেল

কৃষ্ণা দত্ত

৮ পটুয়াটোলা লেন । কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশ : কার্তিক, ১৩৬৫

প্রকাশক : প্রসূন বসু

নবপত্র প্রকাশন/৮ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

নিউ মানস প্রিন্টিং/১/বি গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

দুই পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে পথ খুঁজে
পাওয়ার চেষ্টা করে চলেছে সেই সবিতাকে

ক্ষুদ্রতর গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে বৃহত্তর পৃথিবীর পথে পা বাড়িয়েছিল সবিতা। ভীরু মনে ছিল মুক্ত বিহঙ্গের আকাঙ্ক্ষা। লণ্ডনে সে স্বামী হারাল, একমাত্র মেয়েকে ঘিরে গড়ে উঠল তার স্বপ্ন। কেউ তাকে নিজের মতো করে কাছে টেনে নিল না, মুখর লণ্ডনে নিঃসঙ্গ জীবন ধীর গতিতে বয়ে চলল। নিজের দেশকে মনে হল না আপন। আবার লণ্ডনও রয়ে গেল সম্পর্ক এড়িয়ে। বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসে বিচিত্র জীবনের দর্শক হয়ে রইল সে। দর্শক অভিনেতা হতে পারল না।

এই উপন্যাসে সব কয়টি চরিত্রই কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত কোন মানুষের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকলে তা নিতান্তই আকস্মিক।

প্রথম খণ্ড

"Not far me the other dogs, running by my side :
Some have run a short while, but none of them would bide,
O mine is still the lone trail, the hard trail, the best,
Wide wind, and wild stars, and hunger of the quest"

Irene Rutherford Mcleod.

এক

ইছামতীর পটভূমিকায়

বৃষ্টি পড়ছে। কখন থেকে যে বৃষ্টি পড়ছে, সাবিতা জানে না। লণ্ডনের বৃষ্টি সবিতার ভাল লাগে না—শব্দহীন, রংহীন জলভরা এক শীতল অন্ধকার অনিশ্চয়তা। বাংলাদেশের বর্ষা নয়, যে নটরাজের নৃত্যে নূপুর বেজে উঠবে অঙ্গে-অঙ্গে, আকাশে-বাতাসে।

কতদিন, কত বছর হয়ে গেল—জানলার কার্নিশ গড়িয়ে গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। ফাঁকা বারান্দায়, সবিতা গুণতে লাগল ফোঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে—এক-টুপ—দুই-টুপ—তিন-টুপ—চার-টুপ পাঁচ-টুপ—নাঃ, সবিতার বারো পর্যন্ত গোণার ধৈর্য নেই।

একটি বোবা নিঃসঙ্গ কান্না সবিতার সারা শরীরের মধ্যে শিউরে উঠল। দারুণ শীতে বৃষ্টি হঠাৎ গায়ে পড়লে ভেতরটা যেমন করে ওঠে। কেন কান্না আসবে? দেশের জন্য? বিদ্রূপের রেখা সবিতার ঠোঁটে ছুঁয়ে যায়। এক গ্রামাঞ্চলের একঘেয়ে কুসংস্কার আর পরচর্চা, সব ইচ্ছা আর উচ্চাশার টুটি চাপার স্মৃতিতে ভরা তার দেশ। 'সবার সেরা' সবিতার দেশ!

মা-বাবা? কেন তাঁরা কি করেছেন সবিতার জন্যে? অস্বচ্ছল বৃহৎ সংসারে অবাঞ্ছিত আকস্মিক অতিথি বই তো সে আর কিছু নয়।

সবিতা যেন এখনও শুনতে পায়—সাবির এয়ো নাম আর ঘুচল না। আমাদের চোখ বুজলে, ও ভাইদের বুকের ভার হয়ে থাকবে। সমাজে নিয়ে যাওয়া যায় না, সবাই তাকিয়ে থাকে, কথা বলাবলি করে, এত বড় মেয়ে! মা গান গেয়ে চলেছেন।

বাবা আস্তে আস্তে তামাকে টান দিয়ে বলেন,—হুঁ—হুঁঃ—

সাবির বিদ্যা প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত। ওর সময়ে স্কুল বহুদূরে ছিল, যখন কাছাকাছি হাইস্কুল হল, তখন সাবির কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে। দামড়া মেয়ে পিঠে বিনুনী ঝুলিয়ে, পুরু শরীর দুলিয়ে, উঁচু-বুকে খাতা-চেপে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবে—মার সহ্য হয় না। সাবি বাবার হাতে-পায়ে ধরেছিল। লাভ হয়নি কিছু।

সবিতা দমবার মেয়ে নয়। ও ভাইদের বই পড়তে শুরু করল, এর কাছে, ওর কাছে বুঝতে চাইত। ছোট-ভাইকে পড়াতে আসত গ্রামের মাস্টার, সবিতা দরজার আড়ালে বসে বসে শুনত, আশে-পাশে কেউ না থাকলে ঘরে ঢুকে বলত, প্রবীরদা, আমার এ লেখাটা দেখে দিন না। গ্রাম্য মেয়ের জড়তা ছিল না সবিতার, লজ্জা ছিল এত ভুল হত বলে।

সবিতা বহু বছরের চেষ্টায় ছোট ভাই ভোলার সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে গেল, পঁচিশ বছর বয়সে। ও পাশ করল প্রথম শ্রেণীতে, ভাই পাশ করল তৃতীয় শ্রেণীতে।

মা-বাবা হয়তো আনন্দ প্রকাশ করতেন, যদি ভোলাও দিদির মতো ভাল করত পরীক্ষায়। ভোলা পড়তে গেল কলকাতায়, সবিতা রয়ে গেল টাকীর সেই একই ছোট্ট গ্রামে।

মা দ্বিগুণ-উৎসাহে চেষ্টা করতে লাগলেন সবিতার বিয়ের জন্য। সবিতা ছোট বেলায় বড় রুগ্ন ছিল, বয়সে বড় হতে লাগলেও বাইরে থেকে ধরা পড়েনি কিছু। কিন্তু হঠাৎ কোথায় গেল শরীর খারাপ, মা হঠাৎ একদিন চোখ মুছে দেখতে পেলেন, সবিতার দেহে জোয়ার এসেছে।

হাঁক ডাক পড়ল ঘটকের। হলে হবে কি, সাবির বড় বড় ঘোলাটে চোখে লজ্জার চিহ্ন নেই, পাত্রপক্ষ কালো অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ের লজ্জার অভাব স্বীকার করতে রাজী নয়।

অবিশ্বাস্য কাণ্ডও ঘটে। সবিতার বিয়ের পরে কতদিন শুনেছে,

শুনে তিক্ত হাসি বুকে লুকিয়ে রেখেছে—কি ভাগ্য করেই সাবি জন্মেছিল! বিলেত-ফেরৎ ছেলের জন্যেই ও তপস্যা করছিল বসে বসে। ভাগ্যের লিখন!

দেবেন্দ্রর বয়স যে চল্লিশের ওপর, বিলেতে একাউন্টেন্সি পাশ করেও সে-যে কলকাতার হাইস্কুলের এ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার, এ সব কথা কেউ আমল দেয়নি বিয়ের সময়।

কালীঘাটের মধ্যবিত্ত পাড়ায় দুটো ঘর নিয়ে হল সবিতার সংসার। সবিতা ভালবাসতে চেয়েছিল দেবেন্দ্রকে, টাক-পড়ে-আসা ভারী বয়সের অসাম্যকে উপেক্ষা করে: তার সুকুমার অমিলন দেহ-মন দিয়ে। সাড়া পায়নি। দেবেন্দ্রর দেহ-মন যেন প্রাণহীন দেওয়াল।

না, না, দেওয়াল নয়, সবিতা নিজেকে শুধরে নেয়, দেবেন্দ্র ছিল অসহায়, ক্লান্ত, রৌদ্রে শুকিয়ে-যাওয়া রসনিশ্চিহ্ন আখের ছিবড়ের মতো। সবিতা প্রথম প্রথম রাগ করত, অভিমান করত, কাঁদত—হ্যাঁ নির্জীব দেবেন্দ্রর পাশে শুয়ে দাঁতে দাঁত চেপে, ওর বড় বড় চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। সবিতার যৌনজ্ঞান ভাষা ভাষা, সমবয়সী বান্ধবী না থাকাতে কোনদিন জানতে পারেনি কতটা সত্য কে জানে। মার কাছে শুধু শিখেছে, পাপ আর লজ্জা—দেহ লজ্জার, পরিপূর্ণ-বক্ষ লজ্জার, অচেনা পুরুষের সঙ্গে কথা-বলা লজ্জার, আত্মীয়-পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা পাপ।

দেবেন্দ্রর কাছে কি চেয়েছে, কতটা চেয়েছে, কিভাবে চেয়েছে, সবিতা আজো হয়ত সঠিক বলতে পারবে না। কিন্তু সবিতা চেয়েছিল—আবেগে, কামনায়, ভালবাসায়, সবিতা ফুটে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু দেবেন্দ্রর না ছিল শক্তি, না ছিল ইচ্ছা।

সবিতার প্রথম মেয়ে হবার বহুদিন পরে যখন সে দেবেন্দ্রর বুকে মাথা রেখে কাঁদছিল, দেবেন্দ্র ওর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বলেছে, আমার বিয়ে করা উচিত হয়নি। তোমার ওপর আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

সবিতা উত্তর দেয়নি। দেবেন্দ্র আবার বলেছে, তোমার কি মনে হয় আমি যদি অন্য কোথাও চলে যাই, তোমাকে মুক্ত করে দেই, তুমি নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে পারবে?

সবিতা কান্না থামিয়ে বড় দুঃখে হেসেছিল—সবিতার আবার জীবন! তার আবার নতুন আর পুরাতন। সবিতা মুখে বলল ক্লান্তস্বরে, না ও ভেবে লাভ নেই। তুমি যা চাও, দেবেন্দ্র বলল, আমি দিতে পারব না।

তুমি চিন্তা কর না। স্বামীর অক্ষমতায় বিরক্ত হয়ে সবিতা সরে এসে বললে।

এর তিন বছর পর দেবেন্দ্র মারা যাওয়া পর্যন্ত সবিতা আর কোন দিন ওর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়নি। দেবেন্দ্র নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সবিতা এখনও হাসে ভেবে দেবেন্দ্র হয়তো তারপর থেকে সবিতাকে নিজের বড় মেয়ের মতোই ভালবাসতে শুরু করেছিল—স্নেহ আর মায়াভরা ভালবাসা!

সবিতা এক-একবার রাগে ঘৃণায় মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে, কিন্তু থাকতে পারেনি সেখানে। সবিতাকে পড়াতে লাগল দেবেন্দ্র, ওর ইচ্ছা সবিতা ইণ্টারমেডিয়েট দেয়, বি-এ, এম-এ পাশ করে।

এ সময়ে দেবেন্দ্রর দাদা শচীন এল লণ্ডন থেকে ছুটিতে কলকাতায়। শচীন অবাক হয়ে গেল এই দুর্ভীক্ষ-পীড়িত ছোট পরিবারটিকে দেখে, যেন খেতে পায় না, ধুঁকছে, হাসি যেন সন্ধানের বাইরে। শচীন বললে, কোন কথা নয়, আমার সঙ্গে চল লণ্ডনে। একে কী বলে বেঁচে থাকা?

দাদার মুখের ওপর না করার সাহস দেবেন্দ্রর নেই। তবু সে দুর্বলভাবে বলতে গিয়েছিল, চারিদিকে শূন্য চোখ বুলিয়ে, কেন এমন কি খারাপ আছি আর—!

শচীন কঠিনভাবে বলেছিল, দেখ দেব, তুমি একা ছিলে, দেশে

চলে আসতে চেয়েছ, তোমার ব্যবসা ভাল লাগে না, আমি কিছু বলিনি। তোমার এত কোয়ালিফিকেশন নিয়ে দেড়শো টাকায় মাস্টারী করেছ, তাও কিছু বলিনি। কিন্তু, শচীন উত্তেজিত হয়ে তুইতে নেমে এসেছিল—বৌ মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছিস, এরা যেন মরার জন্য কোন রকমে বেঁচে আছে।

সবিতা, শচীন হাঁক দিল। সবিতা ওর ক্ষীণায়মান দেহ নিয়ে ঘরে এসে হাজির হল, মাথায় অল্প একটু কাপড় টেনে।

শচীন ভ্রাতৃবধূর দিকে তাকিয়ে দেবেন্দ্রকে বললে, দেখ, বিয়ের সময় কি ছিল আর এখন কি হয়েছে?

দেবেন্দ্র দাদার চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করল, ভাবল, সবিতা রোগা হয়ে গেল কবে, কেন?

শচীন বলল সবিতাকে, আমি দেবকে বলছিলাম আমার সঙ্গে তোমাদের আসবার কথা। তুমি কি বল?

ভালই তো—সবিতা স্পষ্টস্বরে বলল, দ্বিধা না করে, ওর যদি মত থাকে। মায়ার স্বাস্থ্য হয়তো ওখানে ভাল থাকবে।

ব্যস আর কোন কথা নয়, শচীন বলল, তুমি তৈরী হয়ে নাও সাতদিনের মধ্যে।

শচীন বেরিয়ে গিয়েছিল নোটিশ দিয়ে।

সবিতা বহুদিন পরে স্বতস্ফূর্তভাবে হেসেছিল, কে জানে সে হয়তো বেঁচে উঠবে নতুন পরিবেশে, নতুন দেশে। যে দেশের স্বপ্ন মায়ার অঞ্জন মেখে ভারতের শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা বড় হয়ে ওঠে। সে বেঁচে উঠবে আর স্বপ্ন দেখবে, বেঁচে উঠবে আর জীবন পল্লবিত হয়ে উঠবে নতুনতর জ্ঞানে-পরিচয়ে-সার্থকতার অর্থপূর্ণতায়। সবিতা স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে কিছু বলতে গিয়ে অবাক হয়ে থেমে গেল। এক অজানা ভাবাবেগে হাসি মিলিয়ে গিয়ে শিউরে উঠল ওর পূর্ণ অধর। দেবেন্দ্র মাথা নীচু করে আছে, ওর চোখে জল টল টল করছে, আর সমস্ত শরীরের মধ্যে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই।

সবিতার বুকের মধ্যে আবার চমকে উঠল। তার কিছুক্ষণ পূর্বের স্বতঃস্ফূর্ত-আসা হাসি বুকের মধ্যে হিমের মতো জমে গিয়ে ওর দেহের চলমান রক্তকে যেন একেবারে ঠাণ্ডা করে দিল। সে নড়তে পারল না, কিছু বলতে পারল না। একটি মুহূর্ত কিংবা কতযুগ যে সবিতা দাঁড়িয়ে ছিল দেবেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে, সে জানে না। পাশের ঘর থেকে মায়া চীৎকার করে উঠল ঘুম ভেঙে।

দেবেন্দ্র যেন বহুদূর থেকে বলল, দেখ কি হল!

সবিতা কোনদিনও জানতে পারেনি দেবেন্দ্রর সেই মুহূর্তের মনের কথা। কিন্তু লণ্ডনের হাসপাতালে দেবেন্দ্রর মৃত্যু-শয্যায় এ দৃষ্টি সে আরো দু-একবার লক্ষ্য করেছে, ব্যাখ্যা করতে পারেনি, জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়নি।

রাত্রি বেলায় খেতে খেতে সবিতা বলেছিল, তোমার যখন ইচ্ছে নেই, তখন গিয়ে কাজ নেই। এখানেই তো বেশ চলে যাচ্ছে।

দেবেন্দ্র মুখ না তুলেই বলেছিল, না চল, গেলে বোধহয় ভালই হবে। অন্তত তোমার আর মায়ার তো কিছু সুরাহা হবে!

তার মানে? সচকিত সবিতা জিজ্ঞেস করে। দেবেন্দ্র উত্তর দেয়নি। সে চুপ করে গেল, কথা বলানোর সাধ্য কারুর নেই, একমাত্র মায়া ছাড়া।

সেই হল সবিতার বিলেত যাত্রা। লোকে আরেকবার বললে, সাবি কি ভাগ্যি করেই না জন্মেছিল! শুধু রাজা নয়, রাজা নিজে যেচে নিয়ে যাচ্ছে।

দুই

ছবি

তাই না তাই-ই। সবিতা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। নিশ্চয় এখনও বৃষ্টি পড়ছে। তবু ওঠা দরকার, ডাক্তারের কাছে ট্যাবলেট নিতে হবে, সার্টিফিকেট পাঠাতে হবে বস্-এর কাছে, কাজে হাজির না-হবার কারণ হিসেবে।

আর তা ছাড়া এখন না উঠলে ক্লিনার আসবে, সবিতা শুয়ে আছে দেখলে খবর যাবে হোস্টেলের ওয়ার্ডেনের কাছে, তার কাছে কৈফিয়ৎ দাও, শুয়ে থাকা কেন? কি হয়েছে? ডাক্তার ডাকতে হবে না কি? এত ঘন ঘন অসুখ করে কেন, 'সুপ' পাঠিয়ে দেব কি?

সবিতাকে করুণমুখে হেসে বলতে হবে, না ধন্যবাদ, আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।

কিন্তু শীতকালে লণ্ডনে বিছানা হচ্ছে একমাত্র আরাম আর স্বস্তির জায়গা। নাঃ, উঠতেই হবে, আশে পাশের ঘরে পায়ের শব্দ হচ্ছে।

কালকের ছাড়া জামা কাপড় ভাঁজ করাই আছে। সবিতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাপড় পরতে লাগল। এটা তার অভ্যাস। খুব যে তার আত্মরূপ-প্রীতি আছে তা নয়, তবু অভ্যাস। আজ সে তাকিয়ে দেখল—দেহে আটত্রিশ বছরের ছাপ পড়তে শুরু করেছে, তবে অঙ্গের বাঁধুনী এখনও নষ্ট হয়নি, বিশেষ করে কর্সেট আর ব্রাসিয়রের কৃপায়। চিরকালই সবিতার চোখের পাতায় কালো ছায়া ছিল, গভীর মায়ায় ভোলা চাউনি মনে হত অল্প বয়সে, এখন সে ছায়া গাঢ় হয়েছে। ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তার দুটো কালো পাখা চিরস্থায়ী বাসা বেঁধেছে চোখের

পাতায়, চোখের কোলে। তা সত্ত্বেও গ্রামের শান্ত কোমলতা সবিতার মধ্যে আত্মস্থ হয়ে আছে, যা এখনও মানুষকে আকর্ষণ করতে পারে।

লিপস্টিকের খাপ খুলে ঠোঁট রাখতেই, মনে পড়ে গেল ছবির কথা : একটু রং-বিলাসী হও সবিতা। রং মাখ।

কোথাও নেই, হাসপাতালে নয়, ঘরে নয়, অফিসে নয়, পৃথিবীর আনাচে কানাচে কোথাও দেবেন্দ্র নেই। শচীন্দ্র দেবেন্দ্রর দেহের অবশিষ্ট এক মুঠো ছাই পাঠিয়ে দিয়েছিল দেশে, গঙ্গার জলে মিশে সে ভস্ম কোথায় মিলিয়ে গেছে ?

সবিতা সে চিন্তায় সময় নষ্ট করেনি বেশি। সবিতার জীবনে দেবেন্দ্র কত অপরিহার্য ছিল, স্বামীকে না ভালবাসলেও, সে কোন দিন ভাবতে পারেনি দেবেন্দ্র-বিয়োগে এ বিশাল পৃথিবীতে সে টিঁকে থাকতে পারবে, অন্তত সে সম্ভাবনা তার কল্পনাতেও কোনদিন আসেনি।

অফিসে বন্ধুহীন সবিতা শূন্যঘরে ফিরে আসত শূন্যমনে। ছবি এসে ডাক দিত তাকে। সবিতা কোনদিনও ছবির কাছে মুখ কালো করে থাকতে পারেনি। হাসিমুখে বলেছে, বুড়ো বয়সে, বিধবা মানুষ—

ছবি আর বলতে দেয়নি, নিজের লিপস্টিক সবিতার ঠোঁটে মাখিয়ে দিয়েছে যত্ন করে। কোন আপত্তি শোনেনি।

একবার আয়নায় দেখ্। তোর মতো চেহারা যদি আমার থাকত না, দেখতিস কি কাণ্ড হত লণ্ডনে।

সবিতা হেসে বলল, এমনিতেই যা কাণ্ড হচ্ছে তোমার—

ছবি রেগে-মেগে বলল, দেখ্ তুই যদি ইণ্ডিয়া হাউসের ফ্রাসটেটেড কুচুটে বৌগুলোর মতো কথা বলবি তো দেখাব মজা।

ছবি তারপরেই হেসে ভেঙচিয়ে বলল, না ভাই আমার একা একা এত বোরিং লাগে ঘরে, তাই ভাবলাম চাকরি নিই ! তিনি শখ করে মুখ শুকিয়ে চাকরি করছেন। কি রকম গয়না পরে আসে লক্ষ্য করেছিস, যেন বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন রাখতে এসেছে !

দুজনে হেসে উঠল উচ্চকণ্ঠে। সবিতা বলল, তুমিও পরের পেছনে লাগতে কম যাও না !

ছবি দমবার পাত্রী নয়, বলে চলে, কাল যখন লিপস্টিক মেখে অফিসে যাবি, বৌগুলো বলবে চোখ ঘুরিয়ে ভ্রূ নাচিয়ে, ছিঃ, বিধবা মানুষ রঙিন শাড়ি পরছে, মাংস খাওয়ার কোন বাছ-বিচার নেই, আবার ঠোঁটে রং মেখে কাকে ভোলানো হবে এ্যা, শুনি ?

সবিতা ছবির কাছে হাসতে শিখেছে, নিজেকে নিয়ে, পরকে নিয়ে। এবার ও তাড়া লাগাল, চল্ টেট গ্যালারী বন্ধ হয়ে যাবে বৌদের শ্রাদ্ধ করে করে।

সবিতা পরে বুঝতে পেরেছিল, ছবি ওকে হাসাবার জন্যই এত কাণ্ড করে। নইলে ওর মনে দ্বেষ হিংসার পরিমাণ বড়ই কম। তবে রাগ ছিল, ওর নামে ওর পেছনে যে নিন্দাচর্চা হত, সে জন্য। অভিমানও সে কি করেনি, যখন সবিতা ওকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছিল !

এখন হলে সবিতা বিচার করত না ঘুনধরা সমাজের নীতিগত রীতি নিয়ে। আহত হয়ে পিছিয়ে যেত না ছবি পরপুরুষের সঙ্গে সহবাস করছে জানতে পেরেও।

ছবি যখন ইণ্ডিয়া হাউসের চাকরি ছেড়ে ফ্ল্যাট নিয়ে রবীনের সঙ্গে থাকত লাগল, ছবি নেমন্তন্ন করা সত্ত্বেও সবিতা এড়িয়ে গিয়েছিল। সে সময়কার লেখা ছবির চিঠি এখনও ওর কাছে আছে—সাধু বাংলায় —আমি কলঙ্কিনী. পুরোন বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করেছে, যে ছেলেরা ফুর্তি করার সুযোগে আমার আশে পাশে ঘোরাঘুরি করত, তারাও আজকাল সহজে কথা বলতে চায় না, অথচ আমি প্রকাশ্যে রবীনের সঙ্গে বসবাস না করে, তাদের সঙ্গে যদি রাত্রিবাস করতাম গোপনে, তাতে তাদের কোনই আপত্তির কারণ থাকত না। সকলের মনোভাব বুঝি, কিন্তু তুমি আমাকে এত ঘনিষ্ঠভাবে জেনেও যে আমাকে কোনদিন কোন কারণে এড়িয়ে চলতে পার, সে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি !

সবিতা আবার ঘনিষ্ঠতা শুরু করেছিল আরও অনেকের মতো। কিন্তু সে পরের কথা। ছবির সঙ্গে ওর আলাপ ইণ্ডিয়া হাউস অফিসে।

ছবি ছবির মতো করেই এক সপ্তাহ শুধু দেখল আর কান পেতে শুনল। পরের সপ্তাহে দুপুর বেলায় সবিতার ডেস্কের সামনে এসে বহু পরিচিতের মতো করে বলল, চলুন মিসেস বরাট. চা খেতে যাওয়া যাক। আমি স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এসেছি।

সবিতাকে কেউ বড়-একটা ডাকে না, সে এই অনাড়ম্বর আহ্বানে আশ্চর্য হলেও সহজভাবে হাসিমুখে বললে, চলুন। আপনার নামটা জানলে কথা বলার সুবিধা হত।

আমাকে সবাই ছবি বলে.ডাকে। আপনিও ডাকবেন। আমার নাম হচ্ছে খুরসিদ রহমান।

আমার নাম সবিতা।

জানি। আমিও আপনার নাম ধরেই ডাকব। মিসেস বরাট ডাকতে মুখ ভরে যায়। ছবি হেসে যোগ করে, তারপরে আলাপ যদি ভাল লাগার পর্যায়ে আসে, তুমিতে নামা যাবে, কি বলুন? পছন্দ অপছন্দর প্রশ্ন আর কি!

আপনি দেখছি, সবিতা কিছুমাত্র আহত না হয়ে অনায়াসে হেসে বলল, বাজারে জিনিস পছন্দ করার মতো কথা বলছেন!

ছবি ক্যান্টিনে ঢুকতে ঢুকতে বলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের অসুবিধা হচ্ছে, পছন্দের অপেক্ষা করে প্রতিদিনের মেলামেশা গড়ে ওঠে না।

কিন্তু পছন্দই কি সব সময় টিঁকে থাকে? সবিতা ছবির পেছনে যেতে যেতে বলে।

ছবি সঙ্গে সঙ্গে সবিতার মুখোমুখী হয়ে কিছু বলতে গেল, কিন্তু প্রসাদ নামে একটি বৈকালিক-ছাত্র দিনে-কেরানী ছেলে পেছন থেকে সামনে এসে ইংরেজীতে বললে, Please allow me to get your tea!

ছবি তার মুক্তার মতো দাঁতে হেসে বলল, সানন্দে। এই যে পয়সা নিন। ব্যাগ থেকে পয়সা বার করতে গেলে, দিনে-কেরানী বৈকালিক-ছাত্র প্রসাদ আলগোছে ছবির হাত ছুঁয়ে বলল, let me have the pleasure to-pay ! আর একদিন চা খাওয়াবেন ?

ধন্যবাদ। ছবি ভীড়ের মধ্য দিয়ে বহু ছেলে মেয়ের দিকে হাসির প্রত্যুত্তর দিতে দিতে এগিয়ে বলল, কোণার দিককার ছোট টেবিল লক্ষ্য করে।

সবিতা বসে বলল, আপনি এই ক'দিনেই দেখছি বহু লোককে চিনে ফেলেছেন !

ঐ যে, ছবি হেসে বলল, প্রতিদিনের দেখা-সাক্ষাৎ মেলা-মেশার কথা বলছিলাম যা পছন্দ-অপছন্দের অপেক্ষা রাখে না।

পছন্দই কি সবসময় টিঁকে থাকে ? সবিতার সেই প্রশ্নের উত্তর ছবি পরে দিয়েছিল ওকে।

লোকে জানে আমি কামালকে পছন্দ করে বিয়ে করেছি। আমিও তাই জানতাম। আমার বাবা-মা চেয়েছিলেন আমি কামালকেই পছন্দ করি। ভূইফোঁড় ভক্তদের আমল দিয়ে বসি এমন ভয় ছিল তাঁদের।

সবিতা কল্পনা করতে পারে। ছবি যে চুম্বকের মতো পুরুষকে আকর্ষণ করে সে তো দেখতেই পাচ্ছে। ছবির যৌবনবতী দেহ শুধু অটুট আছে বললে কম করে বলা হবে, যৌন-আবেদন সুদে-আসলে বাড়তে বাড়তে নিজের মধ্যে সুস্থির হয়ে গেছে। অথচ ওর মুখের ছাঁচ খুঁটিয়ে দেখতে গেলে সুন্দর নয়, নাকটা হয়তো একটু চাপা, রং কালো, কিন্তু দুটো কালো উজ্জ্বল চোখ বুদ্ধিতে, কৌতুকে সব সময় নাচছে ; পূর্ণ অধর ঈষৎ নীলাভা সুইডিস লিপস্টিক এ রঞ্জিত, আহ্বান আর প্রত্যাখ্যানে দোদুল্যমান, রহস্যময়। ওর আবেদনে একটু কাঠিন্য আছে, যে-কেউ এসে ফষ্টি-নষ্টি করার সাহস পাবে না। উগ্র বিদ্রূপের হাসিতে, অধিকাংশ ছেলেই কোন-না-কোন সময়ে নিজের পৌরুষের অভাবকে ধিক্কার দিয়েছে ইণ্ডিয়া হাউস অফিসে।

এই ছবি উদ্ভিন্ন যৌবনে সরল ছিল, তার বিশ্বাস ছিল প্রেমে, পৃথিবীতে। সে ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে, তার কামাল-এর সঙ্গে বিয়ে হবে। লরেটো হাউস থেকে বেরুল আঠারো বছর বয়সে বি-এ পাশ করে। চোখে তার স্বপ্ন, রোমান্সের স্বপ্ন। বুকে অজানা পিপাসা। কামালউদ্দিন ফিরে এসেছে অক্সফোর্ড থেকে দর্শনে ডক্টরেট নিয়ে।

কামালের অ-বয়সোচিত গাম্ভীর্য ছবিকে আতঙ্কিত করল না। আকর্ষণ যে করেছে, তাও সে বলতে পারে না। ছবির প্রজাপতির মতো চাঞ্চল্যকে কটাক্ষ করে ভক্তের দল বলল, তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।

ছবি ওদের কথা আমলই দিল না। সমীরের কথাই সে একমাত্র ধৈর্য ধরে শুনত, সে বলাতে, ছবি বলল, তুমি বিয়ে করবে আমাকে?

সমীর, ওর তরুণ মুখ লজ্জায়-ভয়ে-আশায় লাল করে বলল, তুমি যদি রাজী হও, এক্ষুনি।

ছবি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, হ্যাঁ, মুসলমান বিয়ে করে ত্যাজ্যপুত্র হও আর কি!

কেন বিলেতে চলে যাব।

যাবার ভাড়া পাবে কোথায়? সমীরের মাথা ঝাঁকি দিয়ে ছবি বলল, Grow সমীর, one can't live on romance!

সমীর চলে গেলে ছবি নিভৃতে কেঁদে বলে উঠেছে, কাপুরুষ। মুখে রোমান্সকে উড়িয়ে দিলেও তার ঘোরে ছবি তখন মদির মনোহর।

বিয়ে হয়ে গেল ছবির কামালউদ্দিনের সঙ্গে। সমীর দীর্ঘশ্বাস চেপে নিজের ঘরে বসে কবিতা লিখল। বাঙালী ছেলে আর কি করবে?

ছবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস নিয়ে পড়তে লাগল। তার এক বছর পরেই দাঙ্গা এল, রাতারাতি দেশ স্বাধীনতা পেল, ভাগ হয়ে গেল দেশ। ছবির বাবা ছিলেন সরকারী বড় চাকুরে। ছবির বাবা রাজী হননি পাকিস্তানে যেতে। কামালউদ্দিনের বাবা কেন্দ্রীয়

সরকারে সরবরাহ মন্ত্রী হয়ে চলে গেলেন কলকাতা ছেড়ে। কামাল বললে চল পূর্ব পাকিস্তান। ভাল হোক মন্দ হোক পাকিস্তান যখন হয়েছে, তখন এই সত্যকে স্বীকার করে তাকে গড়ে তোলা যাক।

ছবির ইচ্ছা ছিল না বিশেষ। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে যাতায়াত করা তখন বেশ বিপজ্জনক ও অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। সে রাজী হয়ে গেল।

ওরা চলে এল ঢাকায়। সেখানে গিয়ে প্রথম এবং একমাত্র পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। ছবি বলত সবিতাকে, দেখ কামাল এত ভাল না, এত ভাল যে, ওকে আমি ছেড়ে যেতে এত বছর দ্বিধা করেছি। ও যদি উত্তর মেরু, আমি তবে দক্ষিণ মেরু। সরব, আমার ছেলে এই বিস্তর ব্যবধান ঘোচাতে পারল না। বরং সরব বড় হতে থাকলেই আমি বুঝতে পারলাম ওর সঙ্গে যোগাযোগ আমার হবার নয়। ব্যর্থ চেষ্টা।

সবিতা লণ্ডনে থাকাকালে বহু দেশী-বিদেশী ব্যর্থ বিবাহিতের সংস্পর্শে এসেছে। তাদের মধ্যে যারা বিবাহ বিচ্ছেদ করেনি বা করতে পারেনি তারা প্রায় প্রত্যেকের প্রতিপক্ষকে দোষারোপ করে নিজে দোষ-মুক্ত হতে চেয়েছে। ছবি অযথা কামালকেও দোষ দিল না, নিজেকেও নয়।

সবিতার মনে পড়ল নিজের কথা, দেবেন্দ্রর দেবত্বময় ভাল-মানুষীর কথা। সে তবে একাই ভুক্তভোগী নয়। তবে ছবি সবিতার মতো দুর্বল অক্ষম নয়। সে এম-এ পাশ করল। বামপন্থী রাজনীতি করল। প্রেমে পড়ল। দেহ-মন-আত্মার বিকাশময় সমন্বিত যে প্রেম—ছবি সেই প্রেমে জীবনে সর্বপ্রথম তিরিশ বৎসর বয়সে অবগাহন করল। কুমারী-তারুণ্যে এই প্রেম আবির্ভূত হলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না, তুচ্ছ হয়ে যায় বাধা, দ্বিধান্বিত বিবেচনা।

কলকাতা থেকে ফিরে ছবি স্বামীকে বলল, আমি ভালবেসেছি।

কামাল তার বেদনাহত দৃষ্টি তুলে তাকাতে পারল না স্ত্রীর

চোখে। খাবার নাড়াচাড়া করে প্লেট সরিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল।

ছবির চোখে জল ভরে এল। বাবুর্চি এসে পেছনে দাঁড়াল। কান্না কণ্ঠ দিয়ে নামিয়ে ছবি বলল, টেবিল তুলে নাও।

কয়েক সপ্তাহ পরে ছবিই আবার বলল, আমি বিলেত যাব ভাবছি।

কেন ?

পড়তে যাব।

বেশ তো যাও।

ছবির বলা হল না। সে বলতে পারল না, কামাল তুমি আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে তুমি মুক্ত কর।

সরব দার্জিলিং নর্থ পয়েন্টে। কামালের ব্যাঙ্কে একাউন্ট আছে, কিন্তু ব্যালেন্স প্রতিমাসে ওঠে আর নেমে যায় মাসের শেষে।

ছবি বলল, ভেব না। আমি চাকরি করে পড়ব।

কামাল মাথা নেড়ে বলল, তুমি পারবে না ছবি। চাকরি করে পড়া বড় কঠিন, বিশেষ করে থিসিস লেখা প্রায় অসম্ভব।

ছবি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, আমি পারব। কত লোকেই তো পড়ছে।

কামাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমার শখ হয়েছে। চেষ্টা কর গিয়ে। আমি যথাসাধ্য পারি সাহায্য করব। কোন অসুবিধায় পড়লে আমাকে জানাতে দ্বিধা কর না যেন।

ছবি সিট পেল লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে। করাচীতে তুলে দিতে এসেছিল কামাল। ছবি বারণ করেছিল, শোনেনি। ছবি মৃদুস্বরে বলল, যাই তবে।

কামাল সকলের সামনে ফস্ করে ছবির হাত ধরে বলল, তুমি আমার কাছে আর ফিরে আসবে না ?

ছবি ঠোঁট কামড়ে কাঁপুনি থামিয়ে, কিছু বলতে গিয়ে, কিছুই বলতে পারল না আর।

কামাল ছবির হাত দু'হাতে চেপে বলল, আমি তোমাকে দোষারোপ করিনি কখনো।

ছবি বলা শেষ করে কিছুটা থেমে, সবিতাকে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে তোর খারাপ মনে হচ্ছে, না ?

কেন খারাপ মনে হবে ? ছেড়ে আসতে অনেকেই চায়। সাহস ক'জনার থাকে ?

আমার তো ছিল না। সবিতা আবার বলল, গোঁজামিল জোড়াতালি দিয়ে জীবন কাটালে সমাজ-বিধান সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু মৃত্যু হয় আত্মার।

হ্যাঁ, ছবি আস্তে আস্তে যোগ করে, জীবিত থাকা যায়, জীবন থাকে না।

সরবের কথা ভেবেই, বাড়ির থেকে পা বাড়াইনি। কিন্তু সে ভাল করেই জানে তার মা-বাবা দুই মেরুতে বাস করে।

রবীনের সঙ্গে ছবির আলাপ ছাত্রবাস থেকে। রবীন সেণ্ট-জেভিয়ার্স-এ পড়ত, ছবি লরেটোতে। রবীনের বাবার সঙ্গে ছবির বাবার পরিচয় ছিল। দুই পরিবারে ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও যাতায়াত ছিল।

রবীন কবে ওকে ভালবেসেছিল ছবি জানে না। ছবির বিয়ে হয়েছে, সে পাকিস্তানে ফিরে গেছে। যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে থাকা, ছবি বাপের বাড়ি কলকাতায়, পার্কসার্কাসে থাকতে এসেছে দু-চার মাসের জন্য, ছেলেকে সঙ্গে করে।

রবীনের সঙ্গে দেখা হয়েছে, যেমন হয়েছে আরো অনেকের সঙ্গে।

রবীন ওকে বেড়াতে নিয়ে গেছে, ডিনার খাইয়েছে ম্যাকিসন-এ, ফারপোয়, নেচেছে এক সঙ্গে। ভালবাসি একথা বলেনি কেউ কাউকে, যেন এটা চিরকালের গৃহীত সত্য।

ছবি চলে এল বিলেতে। বছরখানেক পরে রবীন আসল। রবীনই তার বাবার বন্ধুর সাহায্যে ছবির চাকরি করে দিয়েছিল ইণ্ডিয়া হাউসে। রবীন এসে দেখল, ছবি অনেক সময় নেবে চাকরি করে পড়া শেষ করতে। সে বলল, ছবি তুমি আমার কাছে এসে থাক।

ছবি বিশেষ আপত্তি করেনি। চাকরি ছেড়ে পড়াতে মন দিয়েছে। কামালকে লিখেছে, সে কোথায় আছে, আর চেয়েছে মুক্তি।

কামাল চিঠির উত্তর দেয়নি।

সবিতা প্রথমে আঘাত পেয়েছিল। আজন্ম সংস্কারে সঙ্কোচবোধ এসেছিল প্রাণ-খুলে মিশতে। ছবির চিঠি পাওয়ার পরে সে আবার যেতে শুরু করেছে। তার ভাল লেগেছে রবীনকে। ভাল লেগেছে ওদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের আত্মপ্রকাশকে।

রবীন না থাকলে, ছবি কখনো ছেলের কথা বলেছে, বলেছে সরবের কথা।

ছবির পড়া শেষ হল। ছবি ফিরে চলে গেল পাকিস্তানে। স্বামীর কাছে মুক্তি ভিক্ষা চাইতে, সন্তানের অধিকার নিতে। রবীনের কাজ শেষ হল, সেও ফিরে এল দেশে।

সবিতা যতদূর খবর পেয়েছে, ছবি এখনও কলকাতা-ঢাকা করছে।

ছবিকে বড় বেশি মনে পড়ে সবিতার। চিঠি লেখে না, তার চিঠি লিখতে ভাল লাগে না। কিন্তু মনে মনে সে অনেক কথা বলে ছবির সঙ্গে।

ছবি বলত, আরে হতভাগী প্রেমে পড়। দুবার তো পৃথিবীতে ফিরে আসবি না।

সে কথা মনে করে সবিতা অনেকদিনের মতো আজও হাসল।

সবিতা উত্তরে নিজের মনেই বলল, প্রেমে পড়ে তোমার কি সুখ হল ছবি?

ছবি উত্তর দিল, সুখ সুখ করে মানুষ সবসময় পাগল হয় কেন, বুঝি না। বোঝে না বেঁচে থাকার সার্থকতা, আরো বড় কথা। আমি সার্থক হয়েছি!

সবিতা হেসে হেসেই ভাবল, আমার সার্থকতা আমাকে ইশারায় ডেকে পালিয়ে গেল যে ছবি।

তিন

ভোলার বিয়ে

সবিতা পা টিপে টিপে নিচে নামল, যাতে ওয়ার্ডেনের খপ্পরে না পড়ে। খোপ-করা দেওয়াল বাক্সে (Pigeon hole) দেখল ওর চিঠি এসেছে। বাবা লিখেছেন। বাবা মোটামুটি নিয়মিত চিঠি লেখেন, মা-ও মাঝেমাঝে লেখেন ধর্মে মন দিয়ে জীবনযাপন করতে।

সবিতা দরজা বন্ধ করে রাস্তায় নেমে চিঠি পড়ল—

'কল্যাণীয়া মা সবিতা, আশা করি ভগবানের কৃপায় তুমি সুস্থ শরীরে আছ। আমরা ভোলার জন্য বড়ই চিন্তিত। চিঠিপত্র বহুকাল পাই না। পাঁচ বছর হইল বিলাতে গিয়াছে, এতদিনে পাশ করিয়া কি ফিরিবার সময় হইল না? তোমার মাতা এবং আমার শরীর মোটেই ভাল যাইতেছে না, আর কয়দিন বাঁচিব কে জানে! ভোলার জন্য তোমার মা বড়ই ব্যস্ত হইয়া থাকে। উহাকে বল, একবার যেন দেশে ঘুরিয়া যায়। পরীক্ষা পাশ করা যদি ভাগ্যে না থাকে, কেহই কিছু করিতে পারিবে না।'

শেষ পর্যন্ত না-পড়ে সবিতা চিঠি ব্যাগে রেখে দিল। রাগ করে সবিতা ভাবল, কি লিখবে সে? 'ভোলা জার্মান কন্যা বিবাহ করিয়া সুখে জীবনযাপন করিতেছে। দেশে ফিরিবার ইচ্ছা যদি কিছু থাকিয়াও থাকে, সাধ্য যে নাই।'

মাস খানেক আগে, ভোলা অফিসে ফোন করে বলল, দিদি, আজ বিকেলে তুমি কি করছ?

কিছু না। কেন?

আমি আটটার সময় তোমাদের মোড়ের কাফেতে থাকব, তুমি এস।

সবিতার ইচ্ছে হয়েছিল বলে, না। সারাদিন কাজের পর বাড়ি ফিরে আর বেরোতে ইচ্ছে করে না। তবু ভাইয়ের অনুরোধ না রেখে উপায় নেই। তা ছাড়া বহুদিন পর ভোলার সঙ্গে দেখা হবে। ও তাই বলল, আচ্ছা।

আটটার সময় সবিতা কফি হাউসে গিয়ে দেখল ভোলা এক মেম সাহেব নিয়ে বসে আছে। শুষ্ক, কঠিন শ্বেত মুখ। ঠোঁটে লিপস্টিক যা একটু রং এনেছে চেহারায়। বুক প্রায় সমান, কায়দা-করা জামাতেও ঢেউ খেলেনি।

মেয়েটি হেসে আহ্বান করল সবিতাকে। ভোলা উঠে সবিতার কোট খুলে চেয়ার এগিয়ে দিল বসার জন্য। কি খাবে? কফি না চা?

কফি, ব্ল্যাক।

ভোলা মুখ লাল করে ইতস্তত করে বাংলায় বলল, আমি বিয়ে করেছি ওকে। কি করব বল, ভোলা চোখ নামিয়ে যেন আপন মনেই বলল, একা একা আর আমি থাকতে পারি নে। ভোলা নিজের দুঃখ প্রকাশে লজ্জা পেয়ে, আবহাওয়া হাল্কা করার চেষ্টায় বলল, রকবাজী করে এসেছি দেশে। বার্মিংহাম, ক্রয়ডনে সে আড্ডা পাব কোথায়? হয়তো লণ্ডনে পেতাম। তুই তাড়িয়ে বাঁচালি আমাকে! ভোলা অভিযোগ-ভরা-কণ্ঠে হেসে বলে।

সবিতার হাসি পেয়েছিল ভোলার দ্বিধা আর অজুহাতের বহর দেখে। মুখে অবশ্য বলল, হাসিমুখে ইংরেজীতে 'অভিনন্দন।' কবে বিয়ে হল?

এই পনেরো দিন হল। আর, ওর নাম হচ্ছে কারিন।

কোথায় গিয়েছিলে মধুচন্দ্রিমায়?

উত্তর দিল কারীন, কোথাও যাইনি। প্রথম ঘর গুছিয়ে বসার আনন্দ উপভোগ করছি। পরের বছর গ্রীষ্মকালে যাব বেড়াতে।

সবিতা মনে মনে মন্তব্য করল, অর্থাৎ আপাতত পয়সা নেই। সবিতা আলাপ করার জন্য বলল, কদ্দিন লণ্ডনে আছ?

বছর খানেক হল।

ইংরেজী শিখতে এসেছিলে বুঝি ?

হ্যাঁ, কারীন বলল নিজের থেকেই, নটিংহিল গেটে-এর এক ফাদারের বাড়িতে কাজ করতাম। কারীন হঠাৎ হেসে ফেলল, ফাদার আর ওর স্ত্রী সব সময় আমাকে শোনাত আমি কত লাকি যে ওদের ওখানে কাজ করছি, এক সত্যিকারের খ্রীস্টান বাড়ীতে খ্রীস্টান আবহাওয়ায়। হা-হা-হা।

ভোলা হাসিতে যোগ দিল না। সবিতা আড়চোখে তাকিয়ে দেখল ভোলার মুখের রং পালটে যাচ্ছে। সে জানতে দিতে চায়নি, কারীন মেড হিসেবে কাজ করত, যেন সবিতা আর জানে না যে নিরানব্বই জন ভারতীয় ছেলে যারা শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, তার নিরানব্বই জনই প্রায় কন্টিনেণ্টাল মেড! ইংলণ্ডে বলতে গেলে একমাত্র কন্টিনেণ্টাল মেডই পাওয়া যায়। ওদের মধ্যে যারা দেশে ফেরে তারা ভাল সেক্রেটারী অথবা হোস্টেসের কাজ নেয় ফিরে গিয়ে। সবিতা ভোলার ভারতীয় ঝি-সংস্কার উপেক্ষা করে হেসে বলল, তাই বুঝি ? ভাল ব্যবহার করত ওরা ?

হ্যাঁ, তা করত, 'থ্যাঙ্ক উ' আর 'প্লিজ' ছাড়া কথা বলত না। তেমন আবার মিষ্টিমুখে খাটিয়ে নিত সকাল ছ'টা থেকে আরম্ভ করে—কথা শেষ না করে কারীন হো-হো করে হেসে উঠল, যেদিন আমার ডে-অফ থাকত, ফাদার বলত, চার্চে যাও, নয় ধর্মগ্রন্থ পড়। তা নাহলে নাচের ঘরে গেলেই আমার আত্মা পাপ থেকে আর কোনদিন উদ্ধার পাবে না। যেদিন প্রথম ভোলাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম ফাদারের মুখটা যদি দেখতে—

ভোলা লজ্জা পেয়ে বলল, আঃ কি ছেলেমানুষী হচ্ছে সকলের সামনে।

সবিতা কিন্তু হাসল। ওর ভাল লেগে গেল কারীনকে। সে জিগ্যেস করল, ফ্ল্যাট পেয়েছ ভাল ?

ফ্ল্যাট-লেট। একটি ঘর, রান্না ঘর, বাথরুম টয়লেট কমন।

কোথায় আছ এখন ?

লণ্ডন থেকে বাইরে।

ভোলা বাংলায় বলল, তোকে জানাইনি বলে রাগ করিসনি তো !

না। সবিতা হেসে বলল, আমার আপত্তির কোন প্রশ্ন নেই। তুমি বড় হয়েছ, যা ভাল বুঝেছ করেছ। দায়িত্ব তোমার। মা-বাবার কথা দুজনেই এড়িয়ে গেল।

আমার একদিন ডিনার দেওয়া উচিত—সবিতা কারীনকে বলল, কোথায় কবে যাবে বল ?

দিন ঠিক হল, পরের শনিবার। কারীন বলল, ইণ্ডিয়ান রেঁস্তোরাতে যাবে। ভোলা আর সবিতা ঠিক করল, রঘুস্বামীতে যাবে। ভারতীয় রেঁস্তোরার রান্না সবখানেই মোটামুটি এক, অর্থাৎ খারাপ। তবে শোনা আছে রঘুস্বামীতে কায়দা কানুন ভাল।

সবিতা বলল, তোমাদের সংসারে কি দরকার বল, উপহার দেব।

ভোলা চুপ করে থাকল। কারীন খুশীমনে বলল, আমাদের ভাল টি-সেট, ডিনার-সেট নেই, তোমার যা ইচ্ছা হয় দাও। ভোলা এবার বলল, না না, অত খরচ করাব দরকার নেই দিদি।

সবিতা বলল, এক ভাইয়ের বিয়ে হল আমার কাছে। দেশে বিয়ে হলে কত কিছু পেতিস আর তাছাড়া কাউকে তো কিছু দিইনি। অতএব কুড়ি পঁচিশ পাউণ্ড খরচ করা আমার উচিত।

কারীন বলল, It is sweet of you।

ভোলা বলল, এগারোটা বাজে, আমাদের ওঠা দরকার। কাল অফিস আছে।

দাম মিটিয়ে দিয়ে ওরা উঠল।

জ্যুক বক্সে তখনও গান হচ্ছে, পনেরো বছর বয়স্কা হেলেন শাপেরোর walking back to happiness…

সবিতা সেদিন ভোলার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সবিতা লণ্ডন-জীবনের বছর ছয়েক পরে মার চিঠি পেয়েছিল : ভোলা চার বছরের চেষ্টায় কোন রকমে আই. এস-সি. পাশ করেছে। কোথাও চাকরি না পেয়ে একটা কারখানায় ঢুকেছে সামান্য মাইনেয়। মা আফশোশ করে লিখেছেন, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষকালে কি কুলীগিরি করে ওর জীবন কাটবে?

ভাইরা রাজী হয়েছে, আমার দু-একটা গহনা বিক্রি করে ওর যাওয়ার খরচ উঠে যাবে। কিন্তু ওখানে গিয়ে তুমি ছাড়া দেখার তো আর কেউ নেই। শুনেছি ওখানে সকলেই চাকরি পায়, আর চাকরি করে পড়াশুনোও করা যায়। তোমার নিজের ছোট ভাই-এর জন্য এ সামান্য সাহায্য তুমি করবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তোমার বিশ্বাস ভুল। সম্পূর্ণ ভুল। সবিতা চিঠি শেষ করে নিজের মনেই বলে উঠেছিল।

মার চিঠি আসতে লাগল সপ্তাহে দুটো করে। সবিতা হাল ছেড়ে উত্তর দিল, 'ভোলা আসতে চায় সুখের কথা। কিন্তু এখানে এসেও ওকে কুলীগিরিই করতে হবে। আর সারাদিন পরিশ্রম করে বিকেলে, পড়াশুনো করা কষ্টকর, পাশ করা আরো শক্ত। প্রখর বুদ্ধি না থাকলে, এ ঝুঁকি নেওয়া ভুল হবে। আর চাকরি পাওয়া যে খুব সোজা, সে কথা সত্যি নয়!

আমার যা মাইনে তাতে কাউকে সাহায্য করা বিশেষ সম্ভব নয়। তবে অল্পদিন চেষ্টা করতে পারি। ওর দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত ওর নিজেরই নিতে হবে।

মা সবিতার চিঠি পেয়ে খুশি হননি তা উত্তরে বোঝা গিয়েছিল।

তবে স্পষ্ট করে লিখেছিলেন, ভোলা পরের মাসে আসছে। অর্থাৎ কুলীগিরি যদি করতেই হয় তবে বিলেতে শ্বেতচর্মের দেশে করাই ভাল। নিজের ছেলের বুদ্ধির অপ্রখরতা কোন্ মা আর কবে স্বীকার করেছে!

ভাইকে এতদিন পরে দেখবে, সবিতা খুশি হবে কিনা ভেবে পাচ্ছিল না। এদেশে থাকলে কারুর জন্য কিছু ত্যাগ করা, ঝামেলা নেওয়ার অভ্যাস চলে যায়। সবিতা প্রথমে বিরক্ত হল। শেষপর্যন্ত দেখা গেল রক্তের-টান এখনও ওর মধ্যে আছে।

তরুণ স্বাস্থ্যবান ভোলা। জীবন ঔৎসুক্যে চঞ্চল, কিন্তু তার বুদ্ধির প্রাচুর্য আছে এ অভিযোগ কেউ করতে পারবে না। সবিতা স্বীকার করল, মা নিজে না খেয়ে ভোলার শরীরকে গড়েপিটে তুলেছেন বটে। হ্যাঁ, সে সাহায্য করল বৈকি।

লণ্ডনের বিখ্যাত বাঙালী সেন-এর অপেক্ষাকৃত সস্তা নোংরা হোটেলে ভোলা থাকল তিন চার সপ্তাহ। সবিতা ওকে দেখাল, ট্রাফালগার স্কোয়ার, পিকাডেলী সার্কাস, লণ্ডন টাউয়ার। আর্ট-গ্যালারীতে গিয়ে ভোলা হাই তুলে বেরিয়ে এল।

ইণ্ডিয়া হাউসের চন্দ সবিতাকে বলল, ভোলাকে বার্মিংহামে পাঠিয়ে দিন। ওখানে চাকরি পাওয়া সহজ।

সবিতা ভোলাকে ওর এক সপ্তাহের মাইনে, আট পাউণ্ড দিয়ে বলল, যাও চাকরি খুঁজে নাও।

ভোলার লণ্ডনে খুব খারাপ লাগছিল না। তবে চাকরি নেহাৎ করতেই হবে, নিজে খুঁজে নিয়ে—একথা ভোলার মালুম হল। ভোলা আর যাই হোক, দরকার পড়লে যোগাড়ে আছে। তৃতীয় সপ্তাহে চিঠি এল, সে চাকরি পেয়েছে কারখানায়। সবিতা লিখল, কলেজে ভর্তি হবার কি করলে?

ভোলা লিখল, পলিটেক্নিকে ভর্তি হয়েছি।

সবিতা জানে, ভোলা সত্যিই চেষ্টা করেছিল পাশ করার। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারেনি। সে বার্মিংহাম থেকে সবিতাকে

লিখেছিল, পরীক্ষায় পাশ করে কোনদিন দেশে ফিরতে পারব, এ আশা আমার দিন দিনই চলে যাচ্ছে। অথচ এ দেশে চিরটাকাল থাকব, সে কথা ভাবতে গেলে আতঙ্ক হয়। আবার একেক সময় ভাবি, আমার মতো তো কত ছেলে থেকে গেছে, থেকে যাচ্ছে।

তুই ঠিকই লিখেছিলি দিদি, আমার বিলেতে আসা উচিত হয়নি। বেচারা মার জন্যই আরো কষ্ট হয়।

সবিতার চিঠি পড়ে দুঃখ হয়েছে। মাটি আর মানুষের সঙ্গে যোগা-যোগহীন, দিনগত পাপক্ষয়, জীবনের অভিশাপ, সবিতার মতো কে বুঝবে! তিন বছর পরে ভোলা ফিরে এল লণ্ডনের কাছে ক্রয়ডনে চাকরি নিয়ে।

ভোলা তখনও বলত দেশে ফেরার কথা, বিদেশে পড়ে থাকতে আর ভাল লাগে না। কিন্তু দেশে কি নিয়ে যাব, চাকরি তো পাব না। এদেশে অভিজ্ঞতার দাম আছে, এখন ক্রয়ডনে ভাল মাইনের চাকরি পেয়েছি, কিন্তু দেশে তো ওর কোন মূল্য নেই, মূল্য আছে ছাপা কাগজের। নামের সামনে পেছনে বিলিতি অক্ষরের। ভোলা তিক্ত দুঃখ নিয়ে বলেছিল। সবিতা সায় দিয়েছে, দেখ চেষ্টা করে আবার।

হ্যাঁ, তাতো করছি। সকাল আটটায় বেরিয়ে সাতটার সময় ফের, ফিরে রান্না করা, কারণ পকেটে এত পয়সা নেই যে বাইরে খাবে রোজ। তারপর বই নিয়ে পড়তে বসার ধৈর্য থাকে, না বুড়ো বয়সে খাতা পেন্সিল নিয়ে ক্লাসে দৌড়তে ইচ্ছে করে?

সবিতার মনে হয়েছিল, ওর যদি টাকা থাকত, ভোলাকে বলত চাকরি ছেড়ে ফুল-টাইম পড়াশুনো করতে। কিন্তু যা টাকা ছিল সে তো এক অনাত্মীয়র শ্রাদ্ধে গেছে। অবশ্য ফুল-টাইম পড়েও ভোলা যে বিশেষ সুবিধা করতে পারত, তা সবিতা মনে করে না। তবু চেষ্টা।

সবিতা ইংরেজীতে কেমব্রীজ প্রফিসিয়েন্সি পাশ করেছে বহু চেষ্টায়, চাকরির পরে পড়ার বই নিয়ে পড়তে বসলেই রাজ্যজোড়া ক্লান্তি নামে। তাই সে ভোলার দুঃখ বোঝে।

বিয়ের পরে ভোলার সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল সবিতার। সে বলেছিল, মাকে চিঠি লিখি না, কি লিখব বল। আর কোনদিন হয়তো দেশে ফেরা হবে না। যদি পাশ করতে পারি, যদি—

ভোলার চোখে সবিতা দেখেছিল প্রবাসীর দূরাগত দৃষ্টি, পেছনে ফেলে আসা জীবনের মায়া, ভবিষ্যতে তাকে ফিরে পাওয়ার দুরাশা।

ভোলা আবার বলেছে, কারীনকে নিয়ে তো আর গ্রামের বাড়িতে তুলতে পারি না!

না, সম্ভব নয়। সবিতা স্বীকার করেছে।

দিদি তুই মাকে লেখ আমার বিয়ের কথা। ভোলা অনুরোধ করেছে।

না। সবিতা রাজি হয়নি। তুমিই লিখবে তোমার ব্যাপার। বাড়িতে আমার এমনিতেই অজস্র সুনাম। মা ভাববেন, আমিই তোমাকে যোগাড় করে বিয়ে দিয়েছি।

বাবার চিঠি পেয়ে বুঝল সবিতা, ভোলা এখনও চিঠি দেয়নি। ওকে একটা ফোন করতে হবে। বিয়ে করার সাহস হয়েছে, বিয়ে করেছে বলার সাহস নেই কেন? ভোলা লেখে না কেন? অপরাধ বোধে—দেশে ফিরতে না পেরে মেমবিয়ে করেছে বলে? না কি সঙ্কোচ বোধে—পাশ করতে না পারার অক্ষমতার লজ্জায়? সবিতা মার জন্য দুঃখ বোধ করল, মা সত্যিই তার ছোট ছেলেকে বড় ভালবাসে। এদেশে আসার সময় মা আশঙ্কা প্রকাশ করাতে, ভোলা মার গলা জড়িয়ে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিল, তোমার মতো মার কাছে ফিরে আসব, না তো কি ওদেশের শাকচুন্নীদের হাতে প্রাণটা দেব!

মা শাসন করে বলেছিল, মনে থাকে যেন।

আমি ভুলে যেতে পারি, ভোলা দুষ্টু হেসে বলেছিল. কিন্তু তোমার চিঠি আমাকে মনে রাখিয়ে ছাড়বে, সে আমি জানি।

রাখবই তো। মা জোর দিয়ে বলেছেন।

মা আশা করেছিলেন, ছেলে বিলেত ফেরত হয়ে বড় চাকরি নেবে,

নরম দেখে বৌ যোগাড় করে দেবে, অন্য বৌদের মতো ছেলেকে আঁচলে গিরে দিয়ে শহরে ঢং ঢং করে নাচতে যাবে না, মার আজীবন দারিদ্র্যের দুঃখ সার্থক হবে, গর্ব আসবে বার্ধক্যে, স্বচ্ছল হবে শেষ জীবন!

সবিতা মাথা নেড়ে ভাবল, ভুল। আমাদের দেশের মা-বাবারা বড় বেশি আশা করে ছেলে মেয়েদের থেকে। ভুল, আর হয়তো অন্যায়ও। অন্যায় সন্তানের প্রতি।

চার

দূর হয়ে যাক কৃতজ্ঞতা

অন্যায়? সে ভুল আর অন্যায়ে দোষী কি সবিতা নিজেই নয়? মনে পড়ে গীতি একদিন কি বলেছিল। ছ্যাবলামীতে উচ্ছল গীতি মাঝে মাঝে বড় সত্যি কথা বলত, বয়সে সে বহু ছোট হলেও। সে বলেছিল, দেখুন সবিতাদি, আপনি যে টাকা দেন পূরবকে, নিজের কথা চিন্তা করে দেখেছেন? নাকি ভরসা করে আছেন, মায়া একদিন বড় হয়ে আপনার ভার তুলে নেবে? গীতি থামেনি, বলেছে, নেবে কেন? আপনি তো তাকে মানুষ করেননি। আর করলেই বা কি, কেন আপনি তার বোঝা হতে যাবেন? গীতি আরও বলেছিল, মায়া লেখাপড়া শিখছে, এদেশে বড় হয়েছে, হয়তো বিদেশী বিয়ে করবে, কিংবা জীবিকার প্রয়োজনে সে আরো বিদেশে ঘুরতে পারে। নাকি আপনি চান সে আপনার মুখ চেয়ে তার জীবনের শান্তি, সুখ, সুযোগ নষ্ট করবে ভারতীয় ঐতিহ্য বজায় রাখতে?

না, আমি সে তো চাই না। দুর্বলভাবে সবিতা বাধা দিয়েছিল গীতিকে।

তবে আপনার জমানো টাকা কেন আপনি পূরবকে দিয়েছেন, এখনও দেন? সে যদি ফেরৎ না দিতে পারে? ধরে নিলাম তার সদিচ্ছা আছে, কিন্তু তার বিধবা মা আছে না? অবিবাহিত বোন আছে না? সে নিজে বিয়ে করবে, ছেলেমেয়ে হবে না? পি. এইচ. ডি. সে যদি পায়ও এমন কি চাকরি পাবে যে আপনার ছ-সাতশো পাউণ্ডের ধার শোধ করতে পারবে?

সবই তো বুঝি, গীতির বাক্যস্রোতে সবিতা অসহায় হয়ে বলেছিল, কিন্তু ও যখন চায় আমি না করতে পারি না।

আপনার দুর্বলতা সে ভাল করেই বোঝে, তাই আমাদের দেশের গৌরব, হীরের টুকরো আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে টাকা শুষে নিচ্ছে।

না, আর দেব না। কোত্থেকে দেব?

হুঁ, গীতি হঠাৎ হেসে ফেলে বলেছিল, কাল ফোন করলেই আপনি তাড়াতাড়ি ছুটবেন।

সবিতা না হেসে পারেনি, ওর বলার ধরন দেখে।

পূরব সবিতার জীবনে এসেছিল ছবি সরে যাবার সময়ে। প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি সবিতা বইতে পড়েছে। কতটা গভীরভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা তার নিজের আছে, সে তা জানে না। সে জানেনা, মা-বাবাকে সে কতটা ভালবাসে, বা আদৌ বাসে কিনা। তারপর দেবেন্দ্র? তার স্বামী। স্বামীকে ভালবাসা স্ত্রীর কর্তব্য, যতদিন দেবেন্দ্র বেঁচেছিল সে তার কর্তব্য পালন করেছে, কিন্তু দেহমন জীবন উন্মোথিত করা অপরূপ অনুভব যে প্রেম, সে কখনও উপলব্ধি করেনি সবিতা।

হ্যাঁ, সে তার মেয়ে মায়াকে ভালবাসে বৈকি! কিন্তু দিনের-পর-দিন, দানে-সেবায়-আত্মত্যাগে যে ভালবাসা গড়ে ওঠে, সে সুযোগ সবিতা পায়নি। তার আগেই মায়াকে ছেড়ে দিতে হয়েছে পরের হাতে।

কিন্তু পূরব এল ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি করতে। কত ছেলে তো আসে, কত ছাত্র পাশ করে দেশে ফিরে যায়, নয় বিয়ে করে ইণ্ডিয়া হাউসের বদ্ধ দেয়ালে জীবন কাটিয়ে দেয়।

সবিতা ক্যান্টিনে লাঞ্চ খেত না। বিচ্ছিন্ন ছিল সে ইণ্ডিয়া হাউসের জীবনকেন্দ্র থেকে। তার দ্বেষ-বিদ্বেষ আশা উচ্চাশা, আকাঙ্খা-বেদনা, ফ্লার্ট আর রোমান্সের জীবন থেকে।

প্রথম দিকে মাঝেমাঝে ছেলেরা কিংবা কোন অফিসার চেষ্টা করত সবিতার সঙ্গে ভাব করতে, কেউ-বা অভিজ্ঞ বিধবার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করার অসদিচ্ছায়, কেউ-বা সত্য সমবেদনায়।

হয়তো কেউ এসে বলল, চলুন চা খাওয়া যাক। কিংবা, আমি আপনার ওদিকেই যাচ্ছি, এক সঙ্গে বাড়ি ফেরা যাবে। অথবা, এ উইক এণ্ডে কি করছেন ?

সবিতা প্রথম দিকে মাঝে মাঝে রাজি হয়ে যেত, কিন্তু দেখতে পেল অধিকাংশেরই ইচ্ছা অসৎ। দু-একজন বন্ধুও যে সে পেয়েছে অস্বীকার করবে না। দরকারের সময় সে জানে সাহায্য পাবে।

ছবি যাবার সময়ে পূরবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল চা-অবসরের সময়। সবিতা, এই হচ্ছে পূরব, বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ, ভারতবর্ষের হিস্ট্রি মেকার !

পূরব সবিনয়ে বলল, ইংলণ্ডে পরাজিত, বুদ্ধিস্খলিত, অধম বঙ্গ সন্তান।

ছবির সঙ্গে মিশে সবিতা তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালদের কথার মারপ্যাঁচ সম্বন্ধে পরিচিত। তবু সবিতা টের পেল পূরবের ঠাট্টার মধ্যে কোথায় একটা দুঃখ লুকিয়ে আছে।

সবিতা সোজাসুজি জিগ্যেস করল, কি করছেন ?

অর্থাৎ কি করতে এসেছিলাম ?

ছবি পূরবকে থামিয়ে বলল, ও এল. এস. ই. (লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স)-তে পি. এইচ. ডি. করছে।

ও-ও! পিএইচ. ডি.র প্রতি বঙ্গীয় শ্রদ্ধা তখনও সবিতার প্রবল, জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে ওর নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। এতঃ কম সে জানে!

ছবি ওসব আমল দেয় না। ও ইংরেজ চরিত্র সম্বন্ধে গম্ভীর মন্তব্য করতে লাগল, ওদের মুখগুলো দেখেছেন টিউবে, বাসে অফিসের সময়? ছবি একটা ভঙ্গী করল।

পূরব হো হো করে হেসে উঠল।

প্রত্যেকে একটি কাগজ মুখে করে থমকে বসে আছে, নয় cross-word puzzle করছে।

চঁ্যাচাঁমেচি গুঁতোগুঁতি না হলে বুঝি ভাল লাগে না? সবিতা বলল।

ছবি উচ্চশব্দে হেসে বলল, সবিতা হচ্ছে ardent loyalist, রানীর দেশ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না।

সবিতা তাড়া দিল, ওঠ, দশ মিনিট হয়ে গেছে।

ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি নিয়েছি কি করতে, পূরব বলল, যদি সময় মেপে চলতে হয়?

সেই শুরু হল আলাপ। পূরব মাঝে মাঝে ডাকতে আসত চা খাবার জন্য। সবিতা দু-একবার না বলেছে। কিন্তু সে ছাড়বার পাত্র নয়। হয়তো ছবি বলে গেছে, সবিতার ধারণা।

পূরবের গল্প শুনতে সবিতার ভাল লাগত। সবিতার স্বপ্ন ছিল সে (লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ) সোসিওলজি পড়বে। সবিতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করত, ছাত্ররা কেমন, অধ্যাপকরা কেমন, কি ভাবে পড়াশুনো হয়?

পূরব গল্প করত, বহু দেশের ছাত্রের সমাবেশ এই কলেজে। বহু রকমের ক্লাব আছে কলেজে, রাইডিং ক্লাব থেকে আরম্ভ করে মিউসিক ক্লাব পর্যন্ত। অধিকাংশ ছাত্রই রাজনীতি নিয়ে নিয়মিত কয়েক ঘণ্টা

পড়ে। কারণ টিউটরকে প্রবন্ধ লেখা দেখাতে হবে। আর তা ছাড়া বান্ধবী, হৈ-হুল্লোড়, নাচ আর উইক-এণ্ডের পরিকল্পনা করেই ওদের দিন কেটে যায়।

আলোচনা করেন না, দর্শন-কলা-সাহিত্য ? সবিতা বলল।

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে হয়। তবে ইংরেজ ছেলেদের সঙ্গে রাজনীতি সাবধানে আলোচনা করতে হয়।

কেন ?

একজন ইতিহাসের ছাত্রীর সঙ্গে একদিন আলাপ হয়েছিল। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, যদিও ইংরেজ ব্যক্তি-বিশেষ ভারতে অত্যাচার করেছে, শোষণ করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রধানত ইংরেজের আত্মত্যাগ আর সেবায় ভারতবর্ষ যা আজ তা হয়েছে।

তাকে বললাম কি হয়েছে, দারিদ্র্য আর corruption-এর কথা, দাঙ্গার কথা। সে চোখ জ্বলজ্বল করে উত্তর দিল, তবেই বোঝ, ব্রিটিশ যদি আরো কিছুদিন থেকে ভারতীয়দের গণতন্ত্র তৈরী করতে সাহায্য করত, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস দাঙ্গা হত না, corruptionও এত দেখা যেত না।

পূরব আরও অনেক গল্প করত। বলত, খুব কম ছেলেই অন্যদেশী ছেলের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করে। দেখবেন, প্রত্যেকে নিজের দেশের এক-একটি দলের মধ্যে রয়েছে। তার ওপর বাঙালীদের আলাদা গ্রুপ। ইণ্ডিয়া সোসাইটির ইলেকশনের সময় মারামারি লাগে কোন্ দল জিতবে। আমাদের স্বভাব সহজে বদলায় না।

সবিতা বলল, বিশেষ নয়। বাইরে চাকচিক্য লাগে।

ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিগ্যেস করা এদেশে অভদ্রতা। সবিতা মোটা-মুটি সেটা মেনে চলে। তবু কয়েকদিন পরে সবিতা জিজ্ঞাসা করল, থিসিস শেষ হয়নি, কলেজ ছাড়লেন কেন ?

ছেড়েছি ? পূরবের মুখ অন্ধকার হয়ে এল। চশমার ফাঁকে ওর

তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি নিভে গেল যেন। কথা খুঁজে খুঁজে বলল ফাঁকা চোখে, ছাড়িনি তো। ছাড়বও না।

পূরবের বাবা কলকাতার এক প্রাইভেট স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। ম্যাট্রিক পাশের সময় উনি মারা যান। সেই থেকে পূরব ট্যুশনি করে এম. এ. পর্যন্ত পড়েছে। মামার বাড়িতে থাকা খাওয়ার জায়গা ছিল কোনরকমে। দু-বছর বহরমপুর কলেজে মাস্টারি করে সামান্য কিছু টাকা জমিয়েছিল পূরব, লণ্ডনে ডক্টরেট করার উচ্চাশায়। মা এক কথায় রাজী হলেন; দমদমের একতলা ছোট্ট বাড়ি বিক্রি হল। মা ভাইদের হাতে-পায়ে ধরলেন ধার দেবার জন্য, পূরব ফিরে এসে সমস্ত ফেরৎ দেবে। পাটনার বড় মামা রাজী হলেন পূরবকে সাহায্য করতে।

আত্মবিশ্বাস ছিল পূরবের। কিন্তু এসে দেখল, বিলেতে শিক্ষা-ধারা ভিন্ন। বই-এর ইংরেজী লিখে, উদ্ধৃতি তুলে সে ফার্স্টক্লাস পেয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিলেতে বই-এর উদ্ধৃতি তুলে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা দিলে মাস্টার মশায়রা আদৌ চমৎকৃত হন না। উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর মৌল মননশক্তির পরীক্ষা দিতে হবে। সে যা এতদিন শিখেছিল তার অনেক কিছু ভুলে গিয়ে নতুন করে শিখতে হবে, জানতে হবে। আর এখানে পোস্টগ্রাজুয়েট ছাত্রদের সুপার ভাইজার বিশেষ সাহায্য করে না, দায়িত্ব নিজের। পূরব আশা করে এসেছিল ও সরাসরি থিসিস লিখতে শুরু করবে ডক্টরেটের জন্য। কিন্তু বছর দেড়েক কাজ করার পর সুপারভাইজার বললেন, কোয়ালিফায়িং পরীক্ষা দিতে হবে।

পূরবের তখন বুক দুড়দুড় করছে, নিজের যা রসদ ফুরিয়ে যাবে তিনমাস বাদে। মামা যদি কথা না রাখেন। কিন্তু পরীক্ষা দিতে যখন হবে, দিতেই হবে, এখন আর ফেরার কোন প্রশ্ন নেই। পূরব পরীক্ষা দিয়ে ট্রান্সফার পেল পিএইচ. ডি.তে।

এক মাস টাকা এল না। পূরব ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফট করে কোন

রকমে দিন চালাল। কর্নফ্লেক্স খেয়ে, হেঁটে কলেজে এসে। ঘর ভাড়াটা চুকিয়ে দিতেই হবে প্রতি সপ্তাহে—নইলে ল্যাণ্ডলেডি বলবে, পথ দেখ।

এর পরে তিন মাস টাকা এল। মা কান্নাকাটি করে লিখলেন, পাটনার ভাই টাকা দিতে পারবে না। কারণ সে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে এবং হবু জামাতাকে বিলেতে পড়ার খরচ দিতে হবে। এ তিন মাস মা গয়না বিক্রি করে, ভিক্ষা করে টাকা পাঠিয়েছেন। আর তিনি কোনদিকে কূলকিনারা পাচ্ছেন না।

ব্যাঙ্কে এমনিতেই ওভারড্রাফট হয়ে গেছে, সকলেরই বাঁধা-বরাদ্দ টাকা, কে তাকে টাকা-ধার দেবে ?

পূরবের মনে হল, সে কি ভুল করেছে এ দেশে এসে ! গরীবের ছেলের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার পরিণতি বুঝি এমনিই হয়।

পূরব জানে এদেশে বহু ভারতীয় ছাত্রই মধ্যবিত্ত সংসার থেকে এসেছে। সময়ই অর্থ—এর চেয়ে সত্য আর কি আছে ? সময়, বুদ্ধি, ধৈর্য, অসাধারণ পরিশ্রম আর ব্যাঙ্কের টাকার প্রতিটি পেনি হিসেব করে দৌড়ন। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ও, ডিগ্রি অথবা পিএইচ. ডি.র পেছনে। শূন্যহাতে কোন্‌মুখে ফিরবে দেশে ? আত্মীয়-স্বজন-পরিবার মুখ চেয়ে আছে, কবে ছেলে ফিরবে, তাদের কষ্ট-দুঃখ-আত্মত্যাগ সার্থক হবে ছেলের গৌরবে, অর্থোপার্জনে।

পূরব অন্ধকার ভেঙে হাসল, এই আমার ইতিহাস।

সবিতা ধরা-গলায় বলল, আর কতদিন টানা কাজ করলে আপনার থিসিস শেষ হবে ?

থিসিস লেখার ওই মুশকিল। সময়ের মাপজোক নেই। এক বছর, দেড় বছর, খুব খাটতে পারলে তবে যদি হয়।

কি ভাবে শেষ করবেন ভাবছেন ?

দেখি, পূরব বলল। ছ-সাত মাস কাজ করে যদি টাকা জমাতে পারি—পূরব তাই করল। ছ'মাস পরে কাজ ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি

পড়াশুনা আরম্ভ করল। মাস ছয়েক সবিতার সঙ্গে পূরবের দেখা নেই।

অফিসে ফোন করল পূরব, আপনার ঘরে শনিবার আসতে পারি কি ? পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল, একা একা আর থাকতে পারছি না।

সবিতা একটু ইতস্তত করে বলল, আচ্ছা, আসুন।

কখন ?

এই সাড়ে-ছ'টা-সাতটা। এসে খাবেন।

অনেক ধন্যবাদ।

সবিতা তখনও হোস্টেলে আসেনি। স্বামী বেঁচে থাকতে যে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত, সে বাড়িরই একটা ছোট ঘর নিয়ে আছে, ঘরেই রান্নার ব্যবস্থা। এর আগে পূরব কোনদিন আসেনি, আসতে চায়ওনি।

সবিতা কোন ছেলেকে ওর ঘরে ডাকে না। ওই বাড়িতেই আরো দু-তিনজন ভারতীয় আছে। সবিতার ভয়, তারা কি বলবে পূরবকে না বলার ইচ্ছা থাকলেও পারেনি। পূরব আসলে সবিতার ভালই লাগল। লুকিয়ে কিছু করার মতো ভাললাগা। সবিতা নিজেই অবাক হয়ে গেল, ওর নিজের ভাব দেখে। ও একটু অস্বস্তি বোধ করল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পূরবের গল্পের স্রোতে আত্ম-সচেতনতা মিলিয়ে গেল। সবিতা এককালে রান্না করে খাওয়াতে ভালবাসত লণ্ডনে আসার পর শচীন কত বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আসত প্রতি শনিবার তারা প্রশংসা করে কূল পেত না। এখন নিজের জন্য সে সেদ্ধভাতের বেশি-কিছু করে না। আজ সুযোগ পেয়ে সে রান্না করেছে বাংলা দেশের মতো—কপি ভাজা, মুগের ডাল, পোলাও, মাছ, মাংস, টক।

পূরব আনন্দ করে খেল আর বলল, আমার খাওয়া দেখে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের কথা মনে পড়ছে তো ! পড়ুক আমি নিরুপায়

সবিতা হেসে বলল, ছেলেরা তো জানে না, খাইয়ে কত আনন্দ।

পূরব খেতে খেতে বলল, মার কথা মনে পড়ছে। মা যদি জানতেন আমি এক বাঙালী মহিলার কৃপায় দু-বছরের খাওয়া উসুল করছি, তবে ছেলের কেরামতি দেখে খুশিই হতেন।

বেশ তো, সবিতা হেসে বলল, লিখবেন মাকে।

এঁ্যা? পূরব সবিতার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

কি হল? সবিতা কিছু না বুঝে জিজ্ঞাসা করে।

মাকে লিখতে হলে, পূরব হাত দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলল, অনেক কিছুই লিখতে হয়। কিন্তু মা বড় গোঁড়া, সেকেলে—

সবিতা তখনও ঠিক বোঝেনি তার এখানে খাওয়ার সঙ্গে মার গোঁড়ামির কি সম্পর্ক আছে। সে আর কিছু না বলে চুপ করে গেল। সেই প্রথম বোধ-করা-অস্বস্তি ঘরের মধ্যে আবার ছড়িয়ে পড়ল। ভারী হয়ে এল বদ্ধ ঘরের হাওয়া রান্না করা মাছ মাংসের গন্ধে।

পূরব একটু পরে বলল, চলুন একটু হেঁটে আসা যাক, এখনও বেশি শীত পড়েনি। মাথাটা ঠাণ্ডা হবে।

চলুন, সবিতা খুশি হয়ে রাজী হল।

ওরা বাস থেকে নেমে ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেণ্টে নামল। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল ব্ল্যাকফ্রায়ারস্-এর দিকে। এমব্যাঙ্কমেণ্ট জুড়ে আলোর মালা টেমস নদীর কালো স্থির জলে অল্প অল্প ছায়া ফেলছে। বড় রাস্তায় বাস, গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, হাওয়ায় হলুদ পাতা ঝরে পড়ছে বিগত গ্রীষ্মের দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে।

সবিতা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আসুন একটু দাঁড়িয়ে টেমস নদী দেখা যাক।

ওরা দু-জনে কার্নিশে ভর দিয়ে টেমস-এর মুখোমুখি দাঁড়াল। সবিতাই আবার বলল, টেমস দেখে আমার ইছামতীর কথা মনে পড়ে যায়। কি দুরন্তই না সে নদী! যখন ঝড়ের আগে চুপটি করে

বয়ে যায় তখন মনে হবে না ও কি ভীষণ একটা রাক্ষসী। পাড় ভাঙছে হা হা করে, বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঘর-বাড়ি-মন্দির।

সবিতা হাত বাড়িয়ে বলল, আর লণ্ডনের টেমস দেখলে হাসি পায়। ইংরেজদের মতোই সভ্য, ভদ্র, বিষ-দাঁত ভাঙা ঘরের পোষা ক্ষুধায় পরিশ্রান্ত কালো কোবরা যেন।

পূরব সবিতাকে এক সঙ্গে এত কথা বলতে শোনেনি, আর এমন করে তো নয়ই। সবিতা বাঁধের দেয়ালে হাত রেখে বলল, দেখুন না, দেখুন—

পূরব সবিতার হাতের ওপর হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল, তোমার কালো চোখে টেমসের ছায়া দেখতে আমার আরো অনেক বেশি ভাল লাগছে!

সবিতা অবাক হয়ে হাত টানার চেষ্টা করে কিছু বলতে যাবে, পূরব বাধা দিয়ে সবিতার হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বলল ইংরেজীতে, Don't, don't spoil the evening, please!

বুক এমন করে কাঁপে কখনও! ও যেন সদ্য উদ্ভিন্ন যৌবনা কিশোরী। প্রথম পুরুষের ছোঁয়ায় দেহের ভেতরটা দুলে দুলে উঠছে। সবিতার কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। দুর্বল হয়ে এল ওর পায়ের ভর।

পূরব ওকে কাছে টানার চেষ্টা করেনি, কিন্তু হাতও ছেড়ে দিল না। কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক গলায় বলেছে, যেন কিছুই হয়নি, চলুন বাড়ি ফেরা যাক, রাত হয়েছে। আমাকে আবার বই নিয়ে বসতে হবে।

সবিতা সারাপথ কোন কথা বলেনি। শুধু ওর শূন্যদৃষ্টি বারবার ঝাপসা হয়ে গেছে।

এর পরে মাসখানেক খবরাখবর নেই। সবিতাই একদিন চিঠি লিখল, অনেকদিন খবর পাই না, শরীর ভাল আছে তো?

পূরব ফোন না করেই এক সন্ধ্যায় ওর ঘরে উপস্থিত হল।

সবিতা ব্যস্ত হয়ে বলল, আসুন, বসুন।

কিন্তু সেই সন্ধ্যার পর থেকে যতদিনই পূরবের সঙ্গে সে একলা নির্জনে দেখা করেছে, স্বাভাবিক হতে পারেনি। সে যেন কেমন ছোট্ট, অসহায় হয়ে গেছে। গ্রাম্য বালিকার লাজনম্র ব্যকুলতা ঘিরে ধরেছে তাকে চারিদিক থেকে। চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে ব্যগ্র ভিক্ষায়।

সে ভুলে গেছে তার বয়সের গাম্ভীর্য, দুঃখময় জীবনের অভিজ্ঞতা। সে ভুলে গেছে, সে মা, সে বিধবা। তার বিগত জীবন সার্কাসের টার্গেটের চাকার মতো ঘুরে ঘুরে একটা কালো বিন্দুর মতো দূরে দূরে শুধু কেঁপেছে এক অবিশ্বাস্য অস্তিত্বের মতো। সবিতা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে তার মনোভাব গোপন রাখতে। সে জানে না কতটা সক্ষম হয়েছে। আদৌ হয়েছে কি না।

সবিতা চা হাতে পূরবের কাছে গেল, বলতে গেল, চা খান, কিন্তু এক ঝলকে পূববকে দেখে সে থমকে গেল।

কি হয়েছে? প্রায় আর্তনাদের মতো বলে উঠল সবিতা। পূরবের মুখ চোখ বসে গেছে, ওর সমস্ত মুখে এক শুষ্ক রক্তহীন নীল দুঃশ্চিন্তা।

সবিতা আবার বলল, সুপারভাইজারের সঙ্গে গণ্ডগোল হয়েছে?

পূরব মাথা নাড়ল, হাসার দুর্বল চেষ্টা করে।

মার অসুখ করেছে?

না। পূরব সদ্য ঘুম ভাঙার মতো হেসে বলল, দিন, চা খাওয়া যাক। আমি আজকে রান্না করব।

বেশ। সবিতা একটু সুস্থ হয়ে বলল, বেশ কি রান্না করবেন? ডাল আছে, চাল, ডিম, সসেজ আছে। হুঁ? হবে?

আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিন তো।

সানন্দে।

সবিতা ঘাঁটাতে ভালবাসে না, ভয় পায়। মনে হয় অন্যের দুঃখের বোঝা সে বইতে পারবে না। সে চায় আর সকলে সুখে আনন্দে জীবন কাটাক, সবিতা শুধু দেখেই তার আনন্দের ভাগ নেবে।

পূরব পেছন ফিরে রান্নার যোগাড় করতে করতে হালকা গলায় বলল, আমার বোনের বিয়ে।

ভাল কথা তো, সবিতা উৎফুল্ল হয়ে বলল, আপনার ক'-বোন ?

তিনজন। সকলেই আমার ছোট। লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি। অতএব বিবাহই একমাত্র গতি।

সবিতা রাগ করে বলল, নিজের কথা ভেবে, আপনি ওদের পড়াননি কেন ?

প্রাইভেট ট্যুশান করব, নিজে পড়ব, না পড়াব ?

তবু লেখাপড়া না-শেখার মতো দুর্ভাগ্য কিছু নেই। সবিতা বলে।

আমাকে দেখেও একথা বলছেন ?

হুঁ ! লেখাপড়া না-শিখলে বোধ-বুদ্ধি-ব্যক্তিত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আপনার এত দুঃখ কেন, পূরব হালকাভাবেই বলল, আপনি তো— ম্যাট্রিক পাশ।

এদেশে এসেছি বলে, দুচারটে ইংরেজী বই পুরোন বই-এর দোকান থেকে শখ করে কিনে পড়ি। এত কম বুঝি আমি, এত কম জানি !

পূরব ফিরে দেখল সবিতার চোখ জলে ভাসছে। পূরব উঠে এসে ওর কাঁধে আলগোছে হাত রেখে বলল, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা যদি আপনার মতো চিন্তা করত, তবে সর্ববিস্তারী পৃথিবী নেমে আসত ভারতবর্ষে।

অশিক্ষার ভাবপ্রবণতা ঝেড়ে ফেলে সবিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি যা রান্না করবেন সে তো বুঝতেই পারছি, সসেজ তো পুড়ে কয়লা হয়ে গেল।

পূরব লাফ দিয়ে দুহাতে ওকে বসিয়ে দিয়ে বলল, কয়লা হোক আর কাঠই হোক, আমি আজ রান্না করবই। আপনি শুধু বসে বসে খাবেন রানীর মতো।

সবিতা এতদিন এদেশে থেকেও, এখনও অস্বস্তি বোধ করে ছেলেরা রান্না করছে দেখলে।

সবিতা খেতে খেতে আলগোছে বলল, আপনার বোনের বিয়ে টাকার দরকার নিশ্চয়। আমি কিছু সাহায্য করতে পারি?

আপনি? পূরবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এক মুহূর্তে, আপনি ধার দেবেন? আঃ, সে আরাম করে একগ্রাস খিচুড়ী গিলে বলল, আমার প্রথম দিনই মনে হয়েছিল, বিধাতা যদি কেউ থাকে তারই নির্দেশে আমার আপনার প্রথম সাক্ষাৎ। পূরব জলের গ্লাস মদের মতো তুলে বলল, সাল্যুট! দীর্ঘজীবী হোক আমাদের বন্ধুত্ব।

সবিতা হাসল পূরবের ছেলেমানুষী দেখে।

সবিতা সেই প্রথম চেক লেখা আরম্ভ করল পূরবের নামে। সাঁইত্রিশ পাউণ্ড, প্রায় পাঁচশ' টাকা।

ইংরেজরা বলে, যদি বন্ধুত্ব রাখতে চাও তবে ধার দিও না, ধার কর না। এ প্রবাদ এর পরে সবিতার বহুবার মনে হয়েছে। ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেণ্টে টেমসের ধারের এক হেমন্ত সন্ধ্যার জন্য দাম দিতে হবে তাকে সারাজীবন ধরে।

একমাত্র গীতিকেই সে পূরবের কথা বলেছে। নাম বলেনি। গীতি তীব্রস্বরে মন্তব্য করেছে, আপনার বন্ধু imposter। আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে exploit করেছে। এরাই আবার দেশে ফিরে সমাজের মাথায় বসবে।

গীতি একেকদিন বলত, জানেন সবিতাদি, দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। আমি আর যাই করি, বিলেত-ফেরৎ ছেলে বিয়ে করব না।

যদিও গীতি শেষ পর্যন্ত তাই করেছিল। কিন্তু সে আরেক ঘটনা।

সবিতা নিজেও যে ধীরমস্তিষ্কে চিন্তা করে পূরবকে ঠক মতলববাজ, সুযোগ অন্বেষণী ভাবেনি কখনও তা নয়। ওর মনে হয়েছে পূরব চিন্তা করেই সবিতার সঙ্গে আলাপ করেছে, এগিয়ে এসেছে, বয়স্কা বিধবার শুষ্ক জীবনে এক ফোঁটা জলের লোভ দেখিয়ে, তাকে সর্বস্বান্ত করেছে দেহে-মনে-অর্থে।

সবিতার একথা স্বীকার করতেই হবে তার দেহ নিয়ে খেলা করেনি কোনদিন পূরব। সুযোগ পেয়েছে, সুযোগ নেয়নি। আধুনিক বৃটেনে প্রেমের ইতিহাসে এটা অবিশ্বাস্য ঘটনা কিংবা ঘটনার অভাব বলা চলে। পূরব অনায়াসেই দ্বিতীয় মায়ার কায়া সবিতাকে উপহার দিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারত, যা বহু ভারতীয় ছেলেই বিদেশিনীর সঙ্গে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পায় না।

তার জন্য সবিতা কৃতজ্ঞ হবে কিনা মনস্থির করতে পারে না।

না, না, সবিতা মাথা নেড়ে নিজের মনেই বলে উঠেছে, সে হয়তো অবিচার করছে পূরবের প্রতি। পূরবের আকর্ষণ হয়তো সত্য ছিল, সবল ছিল না।

না, সবিতা ভাববে না, সে আর ভাবতে পারে না।

এর পরে পূরব বছর দেড়েক ছিল লণ্ডনে। বহুবার টাকা নিয়েছে। শেষের দিকে ভিক্ষা চায়নি, দাবি করেছে। সবিতা ইতস্তত করলে বিরক্ত হয়েছে, রাগ প্রকাশ করেছে। শেষপর্যন্ত ডকটরেট করে দেশে ফিরে যাবার ভাড়া আধাআধি সেই সবিতাকেই দিতে হল।

সবিতার সঙ্গে পূরব নানান গল্প করত, মাঝে মাঝে শুধু ইশারায়, ছোট্ট কথায়, চোখের ভাবে, হাতের স্পর্শে নিজের মনোভাব প্রকাশ করত।

আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, কলেজের পাটটা চুকিয়ে নিই, তারপরে চিন্তা করে দেখা যাবে কি করা যায়।

সবিতা হয়তো কোনদিন বলল, আমি মায়াকে ফেলে কিছুতেই দেশে ফিরতে পারব না।

কোন কিছুর জন্যেই নয়?

না, যতদিন না মায়া বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে।

ওঃ, পূরব দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে।

পূরব বলেছে, মাকে নিয়েই মুশকিল, মা আমাকে বড় আশা করে, বড় কষ্ট করে মানুষ করেছেন। মাকে আমার দুঃখ দিতে মন চায় না।

আমার মনে হয় জীবনের একটা নিজস্ব গতি আছে, পূরব দার্শনিক মন নিয়ে বলেছে, মানুষ ছক কাটে, পরিকল্পনা করে, আন্তরিক দৃঢ়তা নিয়েই এগিয়ে যেতে চায়, কিন্তু তার চারপাশের দাবি আর বন্ধন এত জটিল, এত শক্ত, ঘটনার বিচিত্র আকস্মিকতা এত অসম্ভাব্য যে কোথায় মিলিয়ে যায় স্বপ্ন, কল্পনা, সেন্টিমেণ্ট আর পরিকল্পনা! বাকি থাকে করুণ ধ্বংসস্তূপ। তবু জীবন তো দাঁড়িয়ে থাকে না, তাকে চলতেই হয়।

পূরব হঠাৎ সবিতার হাতে মুখ ঢেকে বলেছে আমি বড় ক্লান্ত সবিতা, এই বিশ্রাম যদি আমার অনন্ত হত—

সবিতা বাধা দিত না কথার স্রোতে। বোঝার চেষ্টা করত, কিছু-বা বুঝতে চাইত না। শেষের দিকে মনে হত, এ শুধু কথা, সুন্দর গোছানো কথা। কথা দিয়ে বানানো পৃথিবীর মরীচিকা সাজানো।

শেষের দিকে সবিতার মন বিষিয়ে গিয়েছিল। সন্দেহে, নিজের প্রতি বিতৃষ্ণায় মনে হত, পূরব তার কাছে টাকা ছাড়া কি জন্য আসবে? সে অসুন্দর, অশিক্ষিতা, বয়স্কা। তার তো দেবার মতো কিছু নেই। ব্যাঙ্কের টাকা ছাড়া।

জীবনের শনিকে যেন বিদায় দেবার জন্যই সে রাজী হয়ে গিয়েছিল জাহাজের ভাড়া দেবার।

পূরব দেশে ফিরে দু-বছরে একটি মাত্র চিঠিই লিখেছিল:

সুচরিতাসু,

দেশকে যেন আবার নতুন করে আবিষ্কার করছি। নতুন চোখ দিয়ে নতুন ভাব নিয়ে। মাকে যখন প্রথম পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম, দেখলাম, মায়ের চোখে জল। মার সুন্দর কষ্ট-

সহিষ্ণু ঠোঁটে ঈষৎ কাঁপা হাসি। তখন মনে হল, শুধু এইটুকু দেখার জন্যই আমি সারা পৃথিবী পায়ে হেঁটে ঘুরে, ফিরে আসতে রাজী আছি। সব কিছু ত্যাগ করে, ধন-মান-প্রেম।

সেন্টিমেন্টাল মনে হচ্ছে, না, শত হলেও বাঙালী কিনা! বাংলা দেশের মা ছেলেকে বড় দুর্বল করে দেয়। তার স্নেহের বাঁধন এমনই যে ছাড়া পেলেও ছুটে আসতে হয়। অথচ আধুনিক যন্ত্র প্রতিযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে সে বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে না আসলে উপায় নেই, উন্নতি নেই। আমরা যতই পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বার্থপরতার দোষ দিই না কেন, এর প্রাচুর্য, জীবন যাপনের স্বাচ্ছন্দ্য, ব্যক্তি প্রাধান্যের ওপরেই নির্ভর করে গড়ে উঠেছে।

চাই আর না-চাই, তার স্রোতের বেগে ভারতবর্ষের হাজার বছরের শক্ত শ্যাওলা-ধরা-দেয়াল ভেঙে ভেঙে পড়ছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তারই ভিত তৈরী করছে, জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে।

বহু অসম্মান আর পরিশ্রমের পর একটা চাকরি পেয়েছি, চারশ টাকার। বিলেত ফেরতের দাম বড় কমে গেছে। কিন্তু আমার pick and choose করার ক্ষমতা নেই। ভিত গড়ার কর্মকার। তাই বহু বিলেত ফেরৎ ছেলে যখন তিনশ-চারশ টাকার অঙ্ক দেখে মুখ ঘুরিয়ে ফের সাগর পাড়ি দেয় তাদের আমি খুব দোষ দিতে পারি না।

কলকাতায় মোটামুটি ভদ্রভাবে জীবন-যাপন করতে গেলে প্রায় একারই চারশ টাকা লাগে। সুতরাং আমার জীবন-সংগ্রাম এখনও বড় তীব্র। মা-বোনদের নিয়ে একটা ফ্ল্যাটে আছি। ছোট বোনকে স্কুলে ভর্তি করেছি। মনে হয় ওর ইচ্ছা আছে, বুদ্ধিও আছে। ওর কিছু হবে। আপনার কথা স্মরণ করেই ছোটবোনের পরীক্ষার দিকে নজর দিয়েছি। মেজটির বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সুচিত্রা-উত্তমের পোকা ওর ছোট্ট মাথায় কিলবিল করছে।

পুরোন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা কেমন দূরে দূরে সরে যায়, এড়িয়ে যায়। আর তথাকথিত বিলেত

ফেরতদের সঙ্গে মিশতে হলে বিলিতি চাল আর পকেটে পয়সা, দুটোই দরকার, যা আমার নেই। অথচ আমি এদের মধ্যে দু-একজনকে জানি যারা ইস্টএণ্ডের শ্রমিক বস্তিতে শীতের দিনেও বিনা আগুনে, বিনা স্নানের ঘরে, কর্নফ্লেক্স খেয়ে পরীক্ষায় পাশ করেছে। তাদের এখানে দেখে মনে হবে ওয়েস্ট এণ্ডের সার্ভিস ফ্ল্যাটে ছিল, ল্যাণ্ড লেডি 'বেকন এণ্ড এগ' নিয়ে এসেছে ব্রেকফাস্টে, রাত্রিবেলার বাথসল্টের গন্ধে টবের জল ভর্তি করে বলেছে, 'স্নান তৈরী!'

সবিতা এখানে না হেসে পারেনি। ওর মনে পড়েছে হেমন্ত ভরতীর কথা।

পূরব চিঠি শেষ করেছে ঃ অতএব আমি একা। গঙ্গার ধারে সন্ধ্যার সময় বসে থাকলে সেই টেমস নদীর কথা মনে হয়। সেই দুই নদীর ফাঁক, আর শূন্যতা মায়ের স্নেহে, সারাদিনের কাজে, হাজার দায়িত্ব আর চিন্তায়, কোন কিছুতেই ভরে ওঠে না।

কোন অপ্রীতিকর স্মৃতি, কোন ভুল বোঝার বেদনা আজ মনে করব না। শুধু অনুরোধ করব, আমাকে বিশ্বাস করুন, একদিন-না-একদিন আমি আপনার ধার শোধ করবই, যদিও ঋণ শোধ করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। (কেন, নেই কেন? সবিতা বোবা পশুর মতো ভেতরে ভেতরে কেঁদে উঠে বলে, কেন নেই?)

আপনার সস্নেহ সহানুভূতি (সস্নেহ! সবিতা আর বাদবাকী ক্ষীণ বোধশক্তি নিয়ে আস্তে আস্তে নিজেকে বলেছে, শুধু স্নেহ আর সহানুভূতি!) আর অর্থ সাহায্যের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, যার অভাবে আমার দেশে ফেরা হত না।

সবিতা খোলা চিঠি হাতে শূন্য চোখে, শূন্য মনে বহুক্ষণ একভাবে বসে ছিল। আর যেন নড়ার ক্ষমতা নেই। চলার শক্তি নেই, কারণ তার পা দুটো যেন আপনা থেকেই খসে পড়ে গেছে। দেবেন্দ্রর মৃত্যু সংবাদে সবিতা এ ভাবেই বসে ছিল—তবে ভয়ে, এই বিশাল লণ্ডনে,

বিচিত্র দেশে—একা পরিত্যক্ত সবিতার নিজের শক্তি দিয়ে বেঁচে থাকতে হবে, সেই জীবন সংগ্রামের আতঙ্কে। সবিতা রবি ঠাকুরের কবিতা ম্যাট্রিক সিলেকসনে ছাড়া পড়েনি, না হলে সে দেবযানীর মতই ধিক্কার দিয়ে বলত, দূর হয়ে যাক কৃতজ্ঞতা!

পাঁচ

সবিতার হোস্টেল বাস

তোমার মধ্যে আমি কোন সঙ্গতি দেখি না। ছবি একদিন রাগ করে বলেছিল সবিতাকে। লোকমতকে তুমি উপেক্ষা করেছ, অথচ লোকভয় তোমার আঠারো আনা।

দেবেন্দ্র মারা যাবার পর জীবনধারণ বদলাবার কথা সবিতার মনেই আসেনি। দেবেন্দ্র বলেছিল রোগশয্যায়, আমার যদি কিছু হয়, তুমি যাতে সুখী হও সে ভাবেই চলাফেরা কর, লোকের কথা কানে নিও না।

সে কথা সবিতার মনে পড়েনি। মনে পড়ল, মা যখন পাঠালেন সরু কালোপেড়ে ছুটো শাড়ি, বাবা পাঠালেন ভগবৎ গীতা। সাদা শাড়ি ছুটো সে গ্রীষ্মকালে পরার জন্য রেখে দিল চেস্ট অফ ড্রয়ারে।

যে কোন বইতেই তার আসক্তি। বিশেষত তার কোয়েকার (Quaker) বন্ধু হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে অনেক সময়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাই সে ভগবৎ গীতা পড়ল।

ধর্ম কোনদিন সবিতাকে আকর্ষণ করেনি। কেন করেনি সে নিজেও জানে না। যদিও সে গ্রামে মানুষ, বাড়িতে পুজো-পার্বণ, ধূপ-ধূনো, প্রসাদ, ঘণ্টা, শাঁক বাজানো নিত্যকার ব্যাপার ছিল।

মার আদেশে সবিতা নিজেও সন্ধ্যে হতে শাঁক বাজিয়েছে. ভোর

বেলায় তুলসী তলায় গড় হয়ে মাথা ছুঁয়েছে, যোগাড় করে দিয়েছে পুজোর সরঞ্জাম, স্নান করে গরদের শাড়ি পরে। এ ছিল তার মার কথা মেনে চলা, আত্মার যোগ ছিল না, আকাঙ্ক্ষা ছিল না সামান্যতম।

এই প্রসঙ্গে ওর হেমন্তের কথা মনে পড়েঃ জানেন পাশ্চাত্য সভ্যতা এত বিলাসমগ্ন বস্তুগ্রাসী দিকভ্রষ্ট মনে হয় কেন! কারণ ওদের কোন বিশ্বাস বা বিশ্বাসের জোর নেই। যীশুখ্রীস্ট ওদের নিত্য-কার জীবনে, রাজনীতিতে, শিক্ষায় জড়িয়ে আছে, অথচ ওরা জীবন যাপন করে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। শুধু এই বিশ্বাসের জোরেই কমিউনিস্ট রাশিয়া এত সবল হয়ে উঠেছে, অবিভক্ত ওদের ব্যক্তিত্ব! রাশিয়ার বাগানে একশটা ফুল ফুটছে না, সে কথা সত্য; কিন্তু Singleness of purpose উড়িয়ে দেবার কথা নয়।

হেমন্ত জোরে নিশ্বাস নিয়ে, পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে, ছোট খাটো একটি বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হয়ে বলল, জার্মানীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, ওরা গাধার মতো খাটে। মিলিটারী ট্রাডিশনের অত্যাচার থেকে ছাড়া পাবার জন্য জার্মান মেয়েরা ভাষা শেখার নামে বিদেশে এসে যে-কোন ছেলের সঙ্গে রাত্রিবাস করছে। ফ্রান্স, ইটালীর যুবকদের দেখে মনে হবে, তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌন এ্যাডভেঞ্চারে তাদের বহুমুখী প্রতিভা প্রমাণ করা। ইংলণ্ড বনেদী দেশ, ঐতিহ্য আঁকড়ে পড়ে আছে, হয়তো ভণ্ড মুখোশ পরে, কিন্তু মিসস্ট্রেস থাকলেও ওরা গলাবাজী করে বাহাদুরী নেয় না।

হেমন্তর পাঞ্জাবী স্ত্রী ভরতী দেয়ালে হেলান দিয়ে নিবিষ্টভাবে দেয়াল-কাগজের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল। সে নিরাসক্তকণ্ঠে ভালমানুষের মতো বলল, আর আদর্শবান ভারতীয়রা বিলেতে এসে কন্টিনেণ্টাল স্কার্ট-এর পেছনে ছুটছে। কি বিশ্বাসের জোর!

হেমন্ত আবহাওয়া হালকা করার ছলে বলল, রোম দেশে রোমানদের মতো ব্যবহার করতে হয়।

হেমন্তর কথা শুনল না ভরতী। সামান্য তীক্ষ্ণ হল ওর কণ্ঠ, ভারতীয়দের মতো ভণ্ড এদেশের লোকেরাও নয়। যৌনদমিত প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় শিশুরা প্রথম স্বাধীন দেশে ছাড়া পেয়ে যা সব ব্যবহার করে না, মাথা হেঁট হয়ে যায়। সে জন্য তো কোন ভাল ঘরের ইংরেজ মেয়ে ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে ডেট করতে রাজী হয় না।

হেমন্ত ফোড়ন কাটল, ভারত-কন্যারা নিশ্চয় প্রাপ্ত-বয়স্ক শিশু-শ্রেণী থেকে বাদ পড়ছে না, ওই যে কি বললে—Sex repressed.

সবিতা আর না থাকতে পেরে বলেছে, আঃ! থাম তো! ছেলেমানুষের মতো সব সময় ঝগড়া!

এ তো ঝগড়া নয়, মতের অমিল। হেমন্ত সাহায্য করেছিল বোঝার।

হেমন্ত বিশ্বাস কিছু করুক-আর-নাই-করুক, সবিতা জানে সে নিজে হয়তো শান্তি পেত ভগবানে বিশ্বাস করতে পারলে, ডাকতে পারলে। কিন্তু সে পারে না, তার হৃদয়ে কোথাও সে সাড়া পায় না।

সবিতার কোয়েকার বন্ধু, প্রতিবেশী মিস জোনস ওকে একবার উইক এণ্ডে রেডিং-এর কাছে রেজিয়ার্স পার্কে নিয়ে গিয়েছিল। Social integretine research centre-এ প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্রে। এর প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর স্ত্রী কোয়েকার ডাঃ জনসন ছিলেন মনোবিজ্ঞানের ডাক্তার। তাঁর স্ত্রী ছিলেন স্কুলের ইন্সপেকট্রেস। তাঁরা তাঁদের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে এবং আরো কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে বিরাট জমিসুদ্ধ দুর্গের মতো বাড়িটি কিনেছিলেন। এক পুরোন লর্ডের বিধবা স্ত্রীর কাছ থেকে। সাত আট জন সেই দুর্গে বসবাস করে এবং প্রতি সপ্তাহ-শেষে তারা বিভিন্ন ধরনের আলোচনার আসর ডাকে।

দুটো কোর্স সাধারণত চলে একসঙ্গে। সবিতা যেবার গিয়েছিল, সেবার ছিল 'গান্ধীজীর দর্শন' আলোচনা এবং ক্লাসিকাল গান শিক্ষার আসর।

সবিতা গান্ধীজীর দর্শন প্রসঙ্গেই গিয়েছিল। ও আসার আগে গান্ধীজী সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনা করে এসেছিল, যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে বসে।

তিন চার জন তাদের লেখা পড়ল এবং প্রতিবারেই প্রত্যেকে আলোচনায় যোগ দিল। রবিবার সকালবেলায় ছিল ছুটি; কিন্তু দশটার সময় বাগানের কোণায় সমবেত হল গান্ধীজীর দল, দু-এক জন অন্য দলের লোকও যোগ দিল। কোন বাধাবাধি নেই, ইচ্ছা মতো।

কোয়েকার সম্প্রদায় পুরুত বা চার্চে বিশ্বাস করে না, বা বিশ্বাস করে না কোন অনুষ্ঠানে। বিশ্বাস করে ধীর চিন্তায়, সুস্থির অনুভবে। তারা মনে করে যীশুখ্রীস্ট মানুষের হৃদয়ে বাণী পাঠান, যোগাযোগ করেন। সেই কায়দায় মিটিং বসল বাগানে, অধিকাংশ লোকেরা চোখ বুঁজে থাকল। সবিতা আস্তে আস্তে লক্ষ্য করল ওদের। তিন চার জন শিক্ষক, একজন কলেজের লেকচারার, একজন পেণ্টার। এক ভদ্র মহিলা এসেছে; তার স্বামী ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতবর্ষকে সাহায্য করছে ইঞ্জিনীয়ারিং পরিকল্পনায়। সে তার পোশাক পরিচ্ছদ, মেক-আপ সম্বন্ধে বড় সচেতন। দু-জন রিটায়ার্ড স্কুল ইনসপেকট্রেস আছে, তার মধ্যে একজনের বাবা উড়িষ্যার মিশনারী ডাক্তার ছিলেন এবং তার জন্ম সেখানেই।

মিশনারী কন্যা কথা বলে উঠলে সবিতা প্রথমে চমকে উঠেছিল। এত চুপচাপ চারিদিক। শুধু অল্প হাওয়ায় গাছের সবুজ পাতা মাঝে মাঝে কাঁপছে, যেন তারাও টের পেয়েছে এখানে কিছু মানুষ গভীর চিন্তায় মগ্ন, তাকে বিরক্ত করা যাবে না। সে বলে উঠল স্থিরকণ্ঠে, গান্ধীজীর অহিংসাই একমাত্র পথ পৃথিবীর সামনে, এ ছাড়া হাইড্রোজেন বোমার যুগে বাঁচার উপায় নেই।

ব্রিটিশ প্রতিনিধি-জায়া বলল, গান্ধীজী আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন; অথচ একমাত্র এই পথেই কোন দেশের সচ্ছল সভ্য উন্নতি হতে পারে।

ইটালিয়ান ভাষা-শিক্ষক তার গম্ভীর পরুষকণ্ঠে বলল, কথাটা হচ্ছে গান্ধীজীর চিন্তা এবং দর্শনকে বিবেচনা করে দেখা। তাঁর দর্শন কতটা আধুনিক যুগে প্রযোজ্য এবং বিশেষ করে আমাদের ইংলণ্ডে।

চিত্রকর বলে উঠল, পাশ্চাত্য সভ্যতা তার আত্মিক মূল্য হারিয়ে ফেলেছে, বস্তুসংগ্রহের প্রতিযোগিতায়।

সবিতা মনে মনে মন্তব্য করল, হ্যাঁ, তাই বোধহয় তুমি নৈর্ব্যক্তিক চিত্রে আত্মার জ্বালাময় রং ছিটিয়ে বেড়াও।

সবিতা লক্ষ্য করল এই সমাবেশ ঠিক আলোচনার আসর নয়, কিংবা ভগবানের গুণগান তারা করছে না। যে যার মনের চিন্তা প্রকাশ করবে, একজনের সঙ্গে আরেকজনের সেই চিন্তার যোগাযোগ থাক বা না থাক।

মিস জোনস পরে জিজ্ঞাসা করেছিল সবিতাকে, আশা করি তোমার খুব খারাপ লাগেনি ?

না, বলতে গেলে ভালই লেগেছে।

মিস জোনস একদিন বলল সবিতাকে, সে রেজিয়ার্স পার্কে গিয়ে বসবাস করবে এবং তাদের কাজে সাহায্য করবে। তার যাবার আগে সে কি সবিতার কোন উপকারে আসতে পারে ?

সবিতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এতদিন সে মিস জোনসের কথা ভাবেনি কেন ? সবিতা বহুদিন থেকেই মনে করছিল ঘর ছেড়ে দিয়ে হোস্টেলে গিয়ে থাকবে। একা একা নিজেকে বয়ে বেড়াতে সে আর পারে না। বিশেষ করে নিজের জন্য রান্না করতে ইচ্ছে করে না। তার ফলে সকালে শুধু এক কাপ চা, বিকেলে ফিরে কোনরকমে যা হোক কিছু গেলা। ওর স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

উপরন্তু পূরব দু-তিনদিন আসার পর রূপানন্দ, তার পাশের ঘরের প্রতিবেশী, যার মুখে সবসময় বাঁকা হাসি আঠার মতো লেগে থাকে এবং যে নিজেকে ইনটেলেকচুয়েল সিনিক বলে আত্ম-প্রচার করে,

মন্তব্য করল, Mrs. Barat, you have at last aquired a boy friend and a young one, for that too.

সবিতা ওর সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু রূপানন্দ স্থির করেছে যেহেতু সবিতার ছেলে-বন্ধু যাতায়াত করছে এখন তার ঠাট্টা করার অধিকার জন্মেছে। সবিতা মুখ ঘুরিয়ে শান্তভাবে বলল, সে আমার ছেলে-বন্ধু নয়, পরিচিত।

I beg your pardon, রূপ-এর ঠোঁটের হাসি বিনয়ে প্রসারিত হল, you mean he is your gentleman friend !

নিজের চরকায় তেল দাও। সবিতা রাগ করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

সেদিন সে স্থির করেছে এ বাড়ি ছাড়তে হবে। মিস জোনস-এর অনেক সমাজসেবা বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। সুতরাং সবিতা বলল তাকে হোস্টেলের কথা, যে হোস্টেলে কোন ভারতীয় নেই।

মিস জোনস ঠিক করে দিলেন এই হোস্টেল, মার্বেল আর্চের কাছে। এটা মোটামুটি ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেণ্ট হোস্টেল। তবে জোনস বলাতে ওরা সবিতাকে নিতে রাজী হল। ছেলেদের হোস্টেল মেয়েদের কাছেই; কিন্তু খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা-প্রেম, খেলাধুলো মেয়েদের বাসস্থানেই হয়। রাত সাড়ে-দশটার সময় ছেলেদের চলে যেতে হয় এবং ছেলেরা কোন মেয়ের ঘরে আসতে পারে না। অন্তত সেই হচ্ছে নিয়ম।

প্রথম দিনই ওয়ার্ডেনকে সবিতার পছন্দ হল না। কঠিন শুষ্ক-মুখ, মধ্য-বয়স্কা। কিন্তু কড়া মেক্-আপে মুখের ভাঁজ ঢাকার চেষ্টা বড় চোখে লাগে।

কিছু-কিছু মধ্যবয়স্কা মহিলাও আছে ওখানে। তিনজন অবিবাহিতা, দুজন বিবাহবিচ্ছেদ-ভোগী। আর সব অল্প বয়স, ষোল থেকে আরম্ভ করে কুড়ি-পঁচিশ পর্যন্ত।

ছোট ছোট টেবিলে চার পাঁচজন করে খাওয়ার ব্যবস্থা। বুড়োরা একদিকে বসে তরুণ-তরুণীদের অধঃপতনে বিস্ময় প্রকাশ করে আর বলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্যাস্ত কি সাধে হয়েছে।

সবিতার সঙ্গে আস্তে আস্তে আলাপ হল দু-একজনের। সবিতার যেচে আলাপ করার স্বভাব নেই, ওর মনে হয় লোকে ওর সঙ্গে কথা বলতে চায় না। সেই যে গ্রামে মা বাবা শিখিয়ে ছিলেন লুকিয়ে থাকতে, ছোট হয়ে থাকতে, সেটা সবিতা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তদুপরি শ্বেতচর্মভীতি চলে গিয়েও কোথাও হয়তো রয়ে গেছে। আর তাছাড়া ইংলণ্ডের জাতীয় চরিত্র ভদ্রতা ছাড়া বন্ধুত্বের হাত সহজে বাড়িয়ে দেয় না।

তাই সবিতা মোটামুটি সকলের মধ্যে থেকেও এক[illegible] গেল। একদিন সে বসবার বড় ঘরে গিয়েছিল টেলিভিসন দেখ[illegible] কিন্তু পালিয়ে আসার পথ পায় না শেষে। এ যেন সার্ব[illegible] ক্লাস, জোড়ায় জোড়ায় পড়ে আছে কার্পেটে, সোফায়, চেয়ারে। [illegible]-ঘাটে মাঠে আবেশতপ্ত চুম্বনরত যুগল দেখে তার চোখ সয়ে গেছে বলেই সবিতার ধারণা ছিল। কিন্তু সেই ঘরে ঢুকে নিজেকে তার সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত বিরক্তিকর মনে হল। দু-একজন ছেলেমেয়ে অলস কৌতূহলে সবিতাকে দেখল কি দেখল না, ফের নিজেদের কাজে মগ্ন হয়ে গেল।

সবিতা বেরিয়ে আসতে স্পিনস্টার বুড়ী এলিজাবেথ নাক শিঁটকে বললে, কোন ভদ্র মনের লোক এ সহ্য করতে পারে না।

বুড়ী সবিতার কানের কাছে সরে ফিস ফিস করে বলল, আচ্ছা আমি শুনেছি, ভারতবর্ষে বিধবাদের পুড়িয়ে মারা হয়?

সবিতা এদেশে নানাধরনের অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে শুনে অভ্যস্ত। সে ধৈর্য ধরে বললে, হত—উনবিংশ শতাব্দীতে, এখন হয় না।

আমরা গিয়ে বুঝি বন্ধ করেছি?

সবিতা বলল, হ্যাঁ। এই বলে বুড়ীর হাত থেকে যদি ছাড়া পাওয়া যায়।

বুড়ী খুশি হল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুড়ী মাথা নেড়ে হেসে বললে, যেন মস্ত তর্কে জিতেছে, রঙিন (কালারও) লোকেরা আমাদের গালাগাল দেয় ! আমরা তোমাদের উপকার করেছি কি না সেটা বল !

সবিতা উত্তর না দিয়ে বলল, যদি কিছু মনে না কর, আমি শুতে যাব, আমার বড় ক্লান্তি লাগছে।

নিশ্চয়। আমিও তো যাচ্ছি।

সবিতার লক্ষ্য পড়ল একটি মধ্যবয়সী মহিলার প্রতি। মহিলা বেশির ভাগ একা একা খায়, নইলে অন্যদের সঙ্গে খেলেও গম্ভীর হয়ে থাকে। ও একদিন মহিলাটির দিকেই তাকিয়েছিল। টেবিল-সঙ্গী বললে, ওতো তোমার দেশের। আলাপ হয়নি ? ওর নাম মিস মেভিস স্মিথ।

সবিতা একদিন সুযোগ পেয়ে মেভিস-এর টেবিলে গিয়ে বসল।

সুপ্রভাত !

সুপ্রভাত। আবহাওয়া নিয়ে কথা বলতে সবিতাও শিখেছে। এদেশে যেমন বলে, অপরিচয়ের বরফ যদি ভাঙতে চাও, আবহাওয়া নিয়ে কথা বল। কিংবা পরিচিতের সঙ্গে দেখা হয়ে কথা খুঁজে পাচ্ছ না আবহাওয়া নিয়ে কথা বল। সবিতা তাই জানলা দিয়ে দৃষ্টি একঝলকে ফিরিয়ে নিয়ে বললে, আজ বেশ শীত পড়েছে না ?

হুঁ। মেভিসও জানলার দিকে তাকাল। যেন ওখানে লেখা আছে শীত পড়েছে।

তোমার এখন ঠাণ্ডা সয়ে গেছে ?

মেভিস সবিতার দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে বললে, একটু হেসে, ঠাণ্ডা আমার কোন দিনই অভ্যাস হবে না, যেমন কোলকাতার পচা গরম হয়নি।

তোমার এদেশে থাকতে ভাল লাগে ?

ভাল মন্দ আর কি বল, জীবন কেটে যাওয়া নিয়ে কথা।

কি গভীর দার্শনিক সত্যিই না মেভিস বললে, সবিতা মনে মনে

মন্তব্য .করে। মেভিস তার ভাঁজে ভাঁজে রুজ চিহ্নিত মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বললে, এরা বড় স্বার্থপর জাত।

তাই বুঝি? সবিতা এবার বুঝতে পারল ও কেন ধরতে পারেনি, মেভিস এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। ও এত রং মেখেছে মুখে যে নিজস্ব রং ধরা মুশকিল। কাছে আসলে ভেতরটা গুলিয়ে ওঠে সেণ্টের আর পাউডারের কড়া গন্ধে।

সবিতা পরে দেখেছে মেভিসের মনটা ভালই, কিন্তু এদেশে থৈ পায়নি। ব্যাঙ্কে কেরানীগিরি করেই জীবন কাটাতে হচ্ছে। আশা করে এসেছিল হয়তো ইংরেজ বিয়ে করে জাতে উঠবে। কিন্তু প্রতি-যোগিতার বাজারে তার বয়স আস্তে আস্তে হাতের মুঠো দিয়ে গড়িয়ে গেছে। দেশকে ফেলে এসে সে সর্বস্বই হারিয়ে বসে আছে।

এদেশে মধ্যবয়স্কা অবিবাহিত মেয়ে দেখলেই সবিতার মনে পড়ে যায় একটি ইংরেজ লাইব্রেরিয়ান ক্রীস্তিন-এর কথা। সে দেখতে অসুন্দর ছিল, কিন্তু মুখে হাসি ছাড়া কথা বলত না। ওর সঙ্গে সবিতার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। ও একদিন বলেছিল সবিতাকে, সে সবিতা বলতে পারত না, জান সবিটা, চল্লিশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি, প্রতিদিন ভেবেছি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে, সে আমার হৃদয়ের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হবে, কিন্তু দেখা হল না, এল না কেউ।

ক্রীস্তিন কিন্তু হালকাভাবেই বলছিল, ইংরেজদের সহজে ভাব-বিলাসে চোখ ছলছল করে না। তবু সবিতা টের পেল দুঃখের রেশ কোথাও লুকিয়ে আছে।

বছর খানেক আগে আমার জন্মদিন ছিল। চল্লিশ বছর পূর্ণ হল। ভোর বেলা উঠে জানলা দিয়ে দেখলাম বরফ পড়ে সব সাদা হয়ে আছে। নিজেকে এত শুভ্র, মুক্ত মনে হল! আমার মনে হল, আর আজ থেকে কারুর জন্য অপেক্ষা করব না এই ভেবে যে, আমার শুষ্ক যৌবনে কেউ জোয়ার আনবে। আজ থেকে আমি নিজের জীবন

নিয়ে সত্যিকারের বেঁচে উঠব। বিশ্বাস কর সবিটা, খ্রীস্তিন আন্তরিক-ভাবে বলল, সেই থেকে আমি শান্ত, স্বাধীন!

সবিতা মাথা নেড়েছে, এ ভাবে কোন কুমারী মেয়েকে সে আগে কথা বলতে শোনেনি।

মেভিসের মুখে মেকী রঙের উগ্রতা দেখে সবিতা নিজের মনে বললে, মেভিস এখনও মুক্ত হয়নি আশার গোলামি থেকে।

টোনী আর জন-এর কথা সবিতার চিরকাল মনে থাকবে।

টোনীকে দেখলে বোঝা যায় সে এককালে রূপসী ছিল। এখনও সেই রূপের সুন্দর সৌম্যতা মানুষকে আকর্ষণ করে। এদেশে মেয়েরা বিয়ে করে না, করতে পারে না। ছবি হলে বলত, ধরতে পারে না। সবিতা জানে না টোনী কেন বিয়ে করেনি। হয়তো যুদ্ধে ওর প্রেমিক মারা গেছে।

মেয়ে মহলে টোনীর অনেক সমঝদার ছিল। ওর স্বভাবই এমন যে হিংসে করে কেউ দূরে সরে থাকতে পারে না।

জন আইরিশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পা খোঁড়া হয়ে গেছে। সে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে কেরানীগিরি করে। এক কোনায় বসে খায় মাথা নিচু করে। কিন্তু জামা কাপড়ে খুব ফিটফাট। মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত সযত্ন ব্রাসে সর্বদা ঝক ঝক করছে। টাই কখনো এদিক ওদিক হয় না। সবিতার সঙ্গে ওর একদিন আলাপ হয়েছিল। আয়ার্লণ্ড সম্বন্ধে যাচ্ছেতাই বলল, ঝগড়াটে অলস জাতি। কথা বলতে পারলে আর কিছু চায় না। কেবল নরক গুলজার—ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে।

সবিতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তাই বুঝি তুমি কখনও কথা বলো না!

জন মনোযোগ দিয়ে কাঁটা-চামচ দিয়ে লাল বিন্স তুলে খেতে লাগল, যেন সবিতার সঙ্গে সে কোনদিন কথা বলেনি, বলবেও না।

সবিতার রাগের চেয়ে হাসিই পেল।

কয়েক মাস পরে সে লক্ষ্য করল বয়স্কা মহলে এক চাপা উত্তেজনা। অনবরত ফিস ফিস ফিস আর থামে না। টোনীর টেবিলে সবিতা সেদিন বসেছিল। একজন বললে, তোমাকে আমি খুব miss করব কিন্তু। সকলেই করবে।

তুমি চলে যাচ্ছ নাকি? টোনীর ফরশা সুন্দর মুখ লাল হয়ে গেল লজ্জায়, চাপা আনন্দে।

টোনী ডান হাত মেলে ধরল টেবিলের ওপর, ওর আঙুলে বিবাহ চুক্তির আংটি।

সবিতা বিস্ময়ে বললে, তুমি বিয়ে করছ? কাকে? আমরা জানি?

টোনী তাকাল ঘরের কোনার দিকে। জন মুগ্ধ বিহ্বল হাসি হাসি দৃষ্টি নিয়ে টোনীর দিকে তাকিয়ে আছে। বিস্ময়! কি বিস্ময়!

How wonderful! সবিতা খুশি হয়ে বলল, আমার অভিনন্দন রইল।

কিন্তু সবিতা তখনও বিস্মিত। জন আর টোনীকে একসঙ্গে কখনও দেখেনি। পরে জানা গেল ওদের প্রেম হত হস্টেলের বাইরে। কারণ টোনী চায়নি তার বান্ধবীদের টেবিল ছেড়ে যেতে এত বছর এক সঙ্গে খাবার পর। মাসখানেক পরে ওরা বিয়ে করে চলে গেল নতুন ফ্ল্যাটে। ওয়ার্ডেন হিংসা চেপে রাখার চেষ্টা করে বললে, আশা করি তোমরা সুখী হবে।

টোনী স্নিগ্ধ হাসি হেসে নিজের হাত জনের হাতে রেখে আশ্বস্ত করার জন্যে বললে, Sure we will be! Thank you!

ছয়

হেমন্ত ভরতী

What will be, will be, অর্থাৎ যা হবার তাই হবে। ভরতী এই গানটি করতে বড় ভালবাসত। কেউ কিছু দ্বিধা প্রকাশ করলেই হল।

ভরতী ইণ্ডিয়া হাউসে এল মোমবাতীর শিখার মতো। ছিপছিপে, লম্বায় সাড়ে-পাঁচ ফিট, একটু হয়তো উগ্র, টিকোল সুন্দর মুখ। দেশে লোকে ওকে ধবধবে ফরশা বলত, তবে বিদেশে ভারতীয়রা বলবে, ও কালো নয়।

ভক্তমণ্ডলী যেন অপেক্ষা করেই ছিল, আনাচে কানাচে। ভরতী কাউকে আমল দিল ঈষৎ হেসে, কাউকে মোটেই দিল না। যাদের দিল না, তারা বললে, হুঁ, মেম সাহেব ছেড়ে ওর দিকে তাকাতে বয়ে গেছে।

সিঁদুর-পরা আর বিয়ে-পালিয়ে-যাওয়া মেয়েরা মন্তব্য করলে, দেশে তো ছেলে দেখেনি জন্মে। নাচুনে! ঐ তো শরীর! গায়ে এক ফোঁটা মাংস নেই।

ভরতী যখন চাকরি করতে এল সবাই গোপনে নিশ্বাস ফেলে ভাবলে, আর যাই হোক বছর গড়ানো দিন-আসা দিন-যাওয়ার একঘেয়েমি তো কাটবে! সকলে কৌতূহলভরে লক্ষ্য করতে লাগল কে শেষ পর্যন্ত টোপ গেলে। মনে হল চিন্ময় রাজ্যজয় করেছে। ভরতী আর চিন্ময় দুদিন পরেই অভিন্ন হয়ে গেল। চিন্ময় নিজেও 'লিঙ্কস্ ইন্'-এ আইনের ছাত্র। অতএব স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল দর্শকের। প্রথমেই যা হৈ চৈ। পাকাপাকি যদি কেউ কারুর সঙ্গে জুটে গেল

তবে দর্শক সময় নষ্ট করে না বিশেষ। বড়জোড় খোঁজ নেবার চেষ্টা করে, সহবাস করছে কি না।

দর্শকদের মনস্তুষ্টির জন্য কে জানত ইণ্ডিয়া হাউসের রঙ্গমঞ্চে যুগ-পুরাতন ত্রিভুজের জটিল খেলা শুরু হবার জন্য আসর তৈরি হচ্ছে।

ভরতীর বাঙালী এবং তার সংস্কৃতির প্রতি বড় মোহ ছিল। সেজন্য সে পঞ্জাবী অথবা অন্য কোন প্রদেশের ছেলেকে আমল দেয়নি। তার ধারণা ছিল বাঙালী-ভদ্রলোক মাত্রই কালচারড ও ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল, মুখে তাদের রবিঠাকুর, ইলিয়টের কবিতা, কণ্ঠে তাদের রবিঠাকুরের মধুর সুরধ্বনি।

স্বভাবতই ভরতী মহিলামহলে জনপ্রিয় ছিল না। মেয়েরা তার শুভ্র মরালগ্রীবায় দেখত রূপের অহঙ্কার। বার-এর ডিনার খাবার জন্য ভরতী তাড়াহুড়ো করে অফিস ছাড়লে, তারা দেখতে পেত শিক্ষার গরব, যেন ও একাই লেখাপড়া শিখছে লণ্ডনে।

ভরতী খুঁজছিল বন্ধু— যার সঙ্গে গল্প করা যায় নিঃসঙ্কোচে, চিন্ময়ের অভাবে উপেক্ষা করা যায় অন্য ছেলেদের কৃপাভিক্ষা।

ভরতী একদিন অপেক্ষা করছিল দুপুরবেলায়। চিন্ময় তাকে লাঞ্চে ডাকতে আসবে। সাড়ে-বারোটা বেজে গেল, সে এল না। আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকী। ভরতী রাগ করে ভাবল, সে আজকে লাঞ্চ খাবে না। চিন্ময় আসলেও মুখ ঘুরিয়ে থাকবে।

ওর হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, সবিতা এক কোণে জানলার ধারে বসে স্যাণ্ডউইচ, চা খাচ্ছে, আর বই পড়ছে। সবিতার সঙ্গে ওর আলাপ আছে, কিন্তু কথা বলার বিশেষ সুযোগ হয়নি। ভরতীর খুব ইচ্ছা করল, ওর কাছে গিয়ে বসে। আবার ভাবল, বিরক্ত করা উচিত হবে কি ?

সবিতা একবার মুখ তুলতেই দেখতে পেল ভরতী ওর দিকে

তাকিয়ে আছে। ও হেসে বলল, ইংরেজীতে, লাঞ্চ খেতে যাননি যে আজ ?

ইচ্ছে করল না। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে ভরতীর।

তা হলে আসুন, আমার স্যাণ্ডউইচ বেশি আছে।

ভরতীকে বেশি জোর করতে হল না। সে উঠে এসে বসল সবিতার পাশে। রুটি খেতে খেতে বলল, বেশ খিদে পেয়েছিল। কি বই পড়ছেন ?

এই জনসন্-এর একটা বই পড়ছি।

সেকেলে ইংরেজী পড়তে কিরকম অদ্ভুত লাগে, না ?

হ্যাঁ। তবে আমি আধুনিক বই খুব বেশি পড়িনি, সে জন্য আমার অসুবিধা হয় না। সবিতা স্বাভাবিকভাবেই বলল, আমি তো বিশেষ কিছু লেখাপড়া শিখিনি !

ভরতী অন্য কথা পাড়ল।

আপনি এখানেই লাঞ্চ খান বুঝি ?

হুঁ, সবিতা হেসে বললে, পয়সাও বাঁচে, আর তা ছাড়া আমার ওদের সঙ্গে—কথাটা শেষ না করে, একটু থেমে বলল, আমার একা একা ভাল লাগে এককে সময়।

ভরতীর ভাল লেগে গেল সবিতাকে।

এই সময়ে চিন্ময় হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকল, আরে তোমাকে আমি সারা ভারতবর্ষে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না, আর তুমি এখানে লুকিয়ে আছ !

ভরতী চায়ের কাপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। চিন্ময় বলল, তুমি রাগ করেছ ? তোমাকে আশ্চর্য করে দেব বলে জানাইনি, অফিসে সকালে আসছি না।

ভরতী মুখ তুলল এবার।

চিন্ময় বললে, বল তো কাকে এনেছি সঙ্গে করে ?

চিন্ময় সরে দাঁড়াতেই ভরতী দেখতে পেল, এক সুকুমার বঙ্গসন্তান

দাঁড়িয়ে আছে, দিশি কাটের স্যুট পরা। ঠোঁটে বোকা-বোকা চালাক-হাসি, চোখে আড়ষ্ট কৌতূহল।

কি, চিনতে পারলে? হেমন্ত—

ওঃ, ভরতী হাত বাড়িয়ে দিল, আরে, আপনার কথা এত শুনেছি! কবে এলেন?

আজ। হেমন্ত মিষ্টি হেসে বললে।

চিন্ময় সবিতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল হেমন্তর।

নমস্কার।

নমস্কার।

চিন্ময় ভরতীকে বললে, আমি এখন পালাচ্ছি। তুমিও এস না আমাদের সঙ্গে!

কি করে যাব এখন? কাজ আছে না?

মাথা ধরেছে বা যাহোক কিছু বল একটা। হেমন্তকে লণ্ডন দেখাব।

এর পর থেকে ফাঁক পেলেই ভরতী সবিতার সঙ্গে গল্প করত— নিজের কথা, চিন্ময়ের কথা, পড়াশুনোর কথা।

ভরতী একদিন সবিতাকে ধরে নিয়ে গেল অফিস ফেরত ওর ঘরে। চিন্ময় হেমন্তকে নিয়ে বেরিয়েছে চাকরির খোঁজে, কার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

পাটনীতে নেমে ভরতী বলল, আমার রান্না করতে ভাল লাগে না। সুতরাং ডিম ভাজা আর রুটি খেয়ে থাকতে হবে, সাবধান করে দিচ্ছি।

সবিতা বলল, আমার কোন আপত্তি নেই। হোস্টেলে তো খেতাম আলু, বাঁধাকপি আর মাংস সেদ্ধ, অক্সটেল-এর ঝোল দেওয়া!

ভরতী দরজা খুলতে খুলতে বললে, সত্যি তুমি যে কি করে খাও ইংরেজী সেদ্ধ, বছরের-পর-বছর, আমার ধারণার বাইরে।

অভ্যাস হয়ে গেছে।

নিরলঙ্কার ঘর। খাট পাতা থাকায়, চলাফেরা করার বেশ অসুবিধে। সবিতা বুঝতে পারল, ভরতী মোটেই গোছানো নয়। নোংরাও বটে। বই-খাতা, কাপড়-চোপড় চারিদিকে ছড়ানো। আ-ধোয়া ডিশ, কাপ, সসপ্যান, মুখ ধোবার বেসিনে এখনও পড়ে আছে। স্টোভের তলায় খবরের কাগজ জলে আর আগুনের আঁচে খসে খসে পড়ছে।

ভরতী উদাসীন। কারুর যে এ ঘরে এসে খারাপ লাগতে পারে, বসতে ইচ্ছে না করতে পারে, সে তার ধারণার বাইরে। ও বিছানার বেডকভারের একটা দিক সমান করে বলল, বস না, make yourself at home !

সবিতা মনে মনে বলল, এ ঘরকে নিজের মনে করতে পারব না। মুখে বলল, তুমি আমার জন্য চিন্তা কর না।

ওর মনে পড়ে গেল, খ্রীস্তিন-এর সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল, colour-bar, বা বর্ণ বৈষম্য নিয়ে।

খ্রীস্তিন বলছিল, দেখ তোমার আগে আমি কোন কালো ব্যক্তির সঙ্গে মিশিনি। আমাকে যদি কেউ এসে বলত, তোমার পাশের ঘরে কালো লোক আছে, আমি বেশ দ্বিধা করতাম !

সবিতা বললে, একটু হেসে, সত্যি ?

হ্যাঁ। কারণ তাদের আচার-ব্যবহার, জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। আমার মনে হয়, বর্ণ বৈষম্যের উৎস হচ্ছে অজ্ঞানতা, না জানার ভয়। খ্রীস্তিন হেসে বললে, তুমি সত্যি করে বলত, এ দেশে আসার আগে তোমার প্রতিবেশী যদি আমি হতে চাইতাম, তুমি কি করতে ?

সবিতা হাসতে হাসতে বলল, আমি যে পরিবেশে থাকতাম

সেখানে তোমার আসার সম্ভাবনা নেই। আর তুমি যদি আসতেও তবে দরজা খুলতাম না।

খ্রীস্তিন হাসল। বললে, আমার এক বন্ধু একবার আমাকে বলেছিল, তার বন্ধুর পাশের বাড়ির ভারতীয়রা নাকি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ময়লা ফেলত। যাবতীয় সব! আমি বিশ্বাস করি না। ফেললেও নিশ্চয় ওরা অশিক্ষিত হবে।

না, না। সবিতা ওকে আশ্বস্ত করল, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও কোলকাতায় হরদম দেখেছি, জানলা দিয়ে হেন জিনিস নেই রাস্তায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে না!

খ্রীস্তিন বাদামী চোখ তুলে বললে, সত্যি?

সত্যি বৈকি!

সবিতাকে বহু ভারতীয় পছন্দ করত না, তার একটি কারণ হচ্ছে সে সত্যি কথা বলত, বিদেশীদের প্রশ্নের উত্তরে। ঢাকবার চেষ্টা করত না।

ভরতী হঠাৎ ফিরে বললে, তুমি কি এত ভাব বলতো সারাক্ষণ?

আজে-বাজে। বেশিদিন এদেশে থাকাতে এত কিছু দেখেছি, শুনেছি—সব কথা মনে পড়ে যায়। ইংরেজীতে যাকে বলে. association of ideas!

ভরতী বলল, অর্থাৎ আমার অপূর্ব ঘরটি তোমার মনের মিউজিয়ামে স্থান পেল। এ্যাঁ—?

সবিতা লজ্জা পেয়ে বললে. সর, আমি কাপ, ডিসগুলো ধুচ্ছি, তুমি রান্না কর।

রাজী!

ভরতী ছোট টেবিলে খাবার যোগাড় করতে করতে বলল, চিন্ময় আমাকে প্রপোজ করেছে।

ভাল কথা। কবে বিয়ে করছ? সবিতা কাপ সাবানের ফেনায়

ধুতে ধুতে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু উত্তর পেল না। সবিতা পেছন ফিরে দেখল, ভরতী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে ভাঙা ডিমের খোসা নিয়ে। মুখে চিন্তার ছায়া।

সবিতা কাপ ধুতে লাগল।

ভরতী নিজের থেকে বলল, ওর ছটফটে গলায় ক্লান্তি নেমে এল, পড়াশুনোর কি হবে বল? বিয়ে করা মানে সংসার পাতা। তার পয়সা কোথায়! না হয় গরীবভাবেই থাকলাম, কিন্তু সংসারের কাজ করব, না পড়ব?

তাছাড়া আমি আমার ছোট বোনকে কথা দিয়েছি, আমি পাশ করে ওকে নিয়ে এসে পড়াব। সে অপেক্ষা করে আছে। সুতরাং পাশ করা যাবে একদিন বলে বিয়ে করে বসলে তো আর হয় না!

চিন্ময় কি বলে?

চিন্ময় বোঝে না। ও বলে ইচ্ছে থাকলে সব হবে। কি করে হবে তো জানি না। ওর প্রায়ই টাকা পাঠাতে হয় দেশে।

পরে বিয়ে কর, পাশ করে।

আমি তো তাই বলছি। কিন্তু জান তো, চিন্ময় কিরকম গম্ভীর একগুঁয়ে প্রকৃতির। তর সইছে না!

ভরতী একটু চুপ করে থেকে বলে উঠল, দূর হোক, চিন্তা করে কি হবে? হজমের গণ্ডগোল হবে শুধু। What will be, will be···sarah sarah···

সবিতা হেসে বলে, তোমাকে আমার এই জন্যই ভাল লাগে।

চিন্ময় আমাকে বলে, আমি fatalist, ভাগ্যবাদী। কিন্তু তা সত্য নয়, আমি বিশ্বাস করি কর্মে। চিন্তায় চুল পাকাতে আমি রাজী নই।

ওরা খেতে বসল। ভরতী হৈ হৈ করে গল্প করতে লাগল। চিন্ময় ওকে একবার ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিল, কতকগুলো বাঙালী মেয়ে এমন বোকার মতো সেজে এসেছিল না, দু-ধারে বিনুনী,

গোড়ায় নয়, আগায় রঙিন ফিতের বড় বড় ফুল, গালে রুজ লাগিয়েছে, তাকানো যায় না ! সত্যি কেন যে—

দরজায় টোকা দিল কে। ভরতী উজ্জ্বল হয়ে বলল, নিশ্চয় চিন্ময়। হ্যাঁ ?

ভেতরে এস।

দরজা খুলে ঢুকল হাসিমুখে এক ভারতীয় মহিলা। ভরতী চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে, কি সৌভাগ্য আমার। এস বীণা, এই হচ্ছে সবিতা বরাট।

সবিতা নমস্কার করল হাত তুলে। বীণা কোন রকমে নমস্কার ফেরত দিল। ভরতীকে উদ্দেশ্য করে বললে, আমি একটা পার্টি দিচ্ছি এই শনিবার, চিন্ময়কে নিয়ে তোমার আসতে হবে।

নিশ্চয় আসব। উপলক্ষটা কি ?

আমার বিবাহবার্ষিকী। রঞ্জিত আসছে আমেরিকা থেকে। বলেছি, ও যদি এ বছর না থাকে, তবে আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ করব। লাস্যময়ী বীণা অনায়াসে হেসে বললে।

সবিতার বীণাকে যেমনই লাগুক, ওর মূল্যবান সাজের আর রুচির প্রশংসা না করে পারল না।

ভরতী বললে, কিছু খাবে নাকি ?

বীণা ওর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পাউডার-কম্প্যাক্ট আর লিপস্টিক বের করে ছোট আয়নায় নাক-পাউডারের কাজ সম্পন্ন করে বললে, উহুঁ আমার সময় নেই, অনেক কাজ পড়ে আছে।

ভারতী বললে, নিমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ।

Pleasure ! বীণা অন্তর্হিত হল। বাইরে গাড়ির স্টার্টারের শব্দ হল।

সবিতা মন্তব্য করল, বেশ দেখতে ভদ্রমহিলা।

পঞ্জাবী নাকি ?

না, বাঙালী।

ওঃ—

বিয়ে করেছে পঞ্জাবী। সে অনেক কাণ্ড করে।

ভরতী শুরু করল বীণার ইতিহাস, এদিক দিয়ে সে ছবির মতো এবং ছবির মতোই সে বিচারকের আসন নেয় না। গল্প করতে পারলেই খুশি।

মানিকতলার পুরনো বাসিন্দারা জানত বীণা এক নামকরা ডাক্তার এবং সম্মানিত পরিবারের অবৈধ সন্তান। সত্যের অপলাপ না করে বলতে হয় বীণার বেনামী বাবা আড়াল থেকে বীণাকে স্কুলে পড়িয়েছে, কলেজে পড়িয়েছে। বীণার মা মেয়েকে বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছে কলেজী শিক্ষা আর রূপ ভদ্রসমাজে প্রবেশের একমাত্র ছাড়পত্র নয়, বংশপরিচয় নিয়ে লোকের মাথাব্যথা আরো বেশি। বীণা বিরক্ত হয়ে রঞ্জিতের সঙ্গে 'ইলোপ' করে গিয়ে বিয়ে করল। সুপুরুষ পঞ্জাবী রঞ্জিতের বড় বদনাম ছিল পাড়ায়।

কিছুদিন পরে রঞ্জিত সাগর পাড়ি দিল বীণাকে নিয়ে ব্যবসা সূত্রে।

রঞ্জিত এখন সাগরপারে ব্যবসায়ী। কি ব্যবসা সে করে কেউ জানে না। তাকে অনবরতই আমেরিকা, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, কন্টিনেণ্ট আর লণ্ডনে হাওয়াই জাহাজে উড়ে বেড়াতে হয়। মার্বেল আর্চে বাড়ি কিনে দিয়েছে বীণাকে। গাড়ি আছে, মাসে দুদিন বা দু-মাসে সাতদিন সে পরিবারের আরাম উপভোগ করে। দুই ছেলেকে বাক্স বাক্স চকলেট কিনে দেয় আর পিঠ চাপড়ে বলে, পড়াশুনো ভাল হচ্ছে তো? যা দরকার You just have to name it!

অতএব বীণা হচ্ছে, এদেশের ভাষায় দূর্বা বিধবা বা grass widow। দেশের বি. এ. পাশ, বার-এ ঢুকেছে। নতুন নতুন ছেলের সঙ্গে তাকে প্রায়ই আইনের পড়াশুনো নিয়ে গভীর আলোচনা করতে হয় মার্বেল-আর্চের বিলাসময় লাউঞ্জে।

বীণাকে দোষ দিতে পার না? ভরতী তুষ্টু হেসে শেষ করলে গল্প ও একটা sex crazy—

বছর দেড়েক পর বীণাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল, সবিতার। ভরতী তখন হেমন্তকে ছেড়ে একটা বড় ঘর ভাড়া নিয়ে বীণার বাড়িতে থাকত। সবিতা সহজে লোককে ঘৃণা করে না; কিন্তু নানান কাণ্ড দেখার পর বীণার কাছে আসলেও ওর গা বমি বমি করত।

ভরতীর ছোট বোন আসার আগে ও অসুস্থ হয়ে পড়ে ছিল বিছানায় ছ-সাতদিন। সবিতা ওর ঘরে এসেছিল দেখাশোনা করার জন্যে।

বীণার তুই দেওর এসেছে দেশ থেকে। সেই উনিশ বছরের দেওরের সঙ্গে বীণার মাখামাখি চরমে উঠল। ওর দেওর শমন কিছুদিন পরে শুকিয়ে যেতে লাগল, আর বীণা মধ্য-যৌবনে সৌন্দর্যের পাপড়ি মেলে দিল চারদিকে।

সেদিনের কথা সবিতা কোনদিন ভুলবে না। রঞ্জিতের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি, তারপর বীণার সেই চীৎকার, মারামারি।

সবিতা ভরতীকে বললে রাত তুটোর সময়, আমি চললাম। আর পাঁচ মিনিট থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমি ট্যাক্সী ডেকে যাচ্ছি।

ভরতী ওকে বাধা দেয়নি। একটু হেসে বলেছে, রঞ্জিত আমাকে বড় জ্বালাবার চেষ্টা করে, হয়তো আমিই কোনদিন মার খাব বীণার কাছে। এঘর ছাড়তে হবে ছোট বোন আসার আগে। কিন্তু ঘর পাওয়া যা মুশকিল।

সবিতা ট্যাক্সী আসলেই চলে গিয়েছে।

কিন্তু এসব অনেক পরের কথা। কয়েক বছর পরে সবিতা খবর পেয়েছিল রঞ্জিত কোলকাতায় হাতে-নাতে ধরা পরেছে স্মাগলিং-এর দায়ে।

ভরতী একদিন খুশিমুখে বলল সবিতাকে, জান হেমন্ত আমাদের সঙ্গে চাকরি করছে পরের সোমবার থেকে।

তাই বুঝি। নিরাসক্তভাবে বলল সবিতা। কি পড়তে এসেছে ও?

কস্ট-একাউন্টেন্সী। পাশ করলে খুব ভাল মাইনে পাওয়া যায় দেশে, হাজার টাকায় আরম্ভ। ভাল নয়?

ভাল তো!

সবিতা লক্ষ্য করতে লাগল ভরতী যত না চিন্ময়ের গল্প করে, হেমন্তর কথা আর ওর শেষ হয় না।

সে জন্য সবিতা খুব অবাক হয়নি, যখন চিন্ময় সবিতাকে চা খেতে ডেকে গম্ভীর, মৃদুস্বরে ঘোষণা করলে, ভরতী বিয়ে ভেঙে দিয়েছে।

সবিতা সাবধানে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল, শব্দ না করে। কোন কথা বললে না।

চিন্ময় একটু ঝুঁকে ব্যাকুলভাবে বললে, আপনি ওকে একটু বলুন। বলুন, ও চাকরি ছেড়ে পড়ুক, আমি বিকেলে কাজ করে সব ম্যানেজ করব!

আর আপনার পড়াশুনো? সবিতার মুখ দিয়ে আপনা থেকে বেরিয়ে গেল।

সে আমি যেমন করে হোক শেষ করব পরে। ও তো আগে শেষ করুক। তাহলে আপনি বলবেন—

না। সবিতা স্পষ্ট করে বললে, আমার বলাতে যদি কিছু হত তবে বলতাম। আপনি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলুন। তাতে যদি কিছু হয়।

চিন্ময় আর জোর করল না। মুখ নিচু করে চা খেয়ে উঠে পড়ল।

সবিতা 'না' বললেও, চিন্ময়ের মুখ স্মরণ করে সে স্থির থাকতে পারল না! সে ভরতীর কাছে গিয়ে বললে, আজ বিকেলে আমার ওখানে এস না। বিশেষ ব্যস্ত না থাকলে।

ভরতী কাজে মনোযোগ দিয়ে বললে, আমি এখন ভীষণ পড়াশুনোয় ব্যস্ত। পরে একদিন যাবখন।

সবিতার জোর করা স্বভাব নয়, সে বুঝল ভরতী ওকে এড়িয়ে যেতে চায়। সে বললে, আচ্ছা।

এক সোমবার ভরতীকে দেখা গেল না। পরের দিন সবিতা একটি ছোট্ট চিঠি পেল ঃ বন্ধুদের মধ্যে তোমাকেই একমাত্র জানাচ্ছি, আমি হেমন্তকে বিয়ে করেছি, এই শনিবার। চাকরি ছেড়ে পড়াশুনোয় মনোযোগ দিয়েছি।

তুমি আমার সম্বন্ধে কি ভাববে জানি না। তবে যদি কোনদিন আমাদের এখানে আস, বড়ই খুশি হব আমরা দুজনে।

ভরতী হেমন্তর গল্প করলেও সবিতা ওকে কখনও একা হেমন্তর সঙ্গে দেখেনি। হেমন্তর চাকরিতে যোগ দেবার মাস-খানেক পরেই এ ঘটনা ঘটাতে সবিতা একটু আশ্চর্য হল। তবে মনে পড়ল ভরতীর কথা, আমি কর্মে বিশ্বাস করি।

চিন্ময়ের সঙ্গে পাঁচ বছর পরে দেখা হয়েছিল একদিন রাস্তায়। হস্তে শ্বেতাঙ্গিনী, গম্ভীর চিন্ময়ের মুখে কথার ফুলঝুরি ; সে এখনও 'বার' করছে বৈকি ! নিশ্চয় সে ভবিষ্যতে পাশ করবে। আপাতত জীবন উপভোগ করছে। Life is short and night is young what do you say darling ?

সুইস-বান্ধবী লাস্যময় ভঙ্গী করে আধো-আধো কন্টিনেণ্টাল এ্যাক্‌সেণ্টে আস্তে আস্তে বলেছে, ee is a very noটি boy !

হেমন্ত যেন জয় করতেই এসেছে এদেশে। ওর শ্যাম মুখে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, রসালো ঠোঁটে সুন্দর কথার ফুলকি, ঈষৎ ঢেউ খেলানো কালো চুলে যেন কোমল হাতের ছায়া স্থায়ী বাসা বেঁধেছে।

সবিতা ভাবলে, হেমন্ত হচ্ছে বাংলা দেশের মিষ্টি নায়ক। যত

মিষ্টি, তত বলিষ্ট নয়। কথনে যত কৌশল, মননে তত আলস্য। তর্কে যত অনুরাগ, কর্মে ততই বিরাগ।

বিয়ের কিছুদিন পরে, হেমন্ত সবিতার ডেস্কের সামনে দাড়িয়ে বললে, সবিতা দেবী, নিমন্ত্রণ করতে এসেছি, ফেরাবেন না।

হেমন্তর কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভাঙা, যার দরুন রোমান্টিক পরিবেশে ধারণা হতে পারে ভাবগভীরতায় মৃদুস্বর স্খলিত হয়ে আসছে।

হেমন্তর নাটকীয় ভঙ্গীতে কথা বলা দেখে, সবিতার হাসি পেল। সে গম্ভীর হয়ে বললে, ফেরাব ধরে নিয়েই নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন বুঝি ?

না, আপনি হবেন আমাদের গরীব-সংসারের প্রথম সম্মানিতা অতিথি !

কথার খেলা সবিতার আসে না। সে বললে, কবে ?

শনিবার। সন্ধ্যায়। আমি এসে নিয়ে যাব কি আপনাকে ?

না, না, আমি নিজেই যেতে পারব।

সবিতা লক্ষ্য করল হেমন্তের প্রস্থান। এর মধ্যেই হেমন্তের পরিবর্তন এসেছে। টাই বাঁধতে শিখেছে ঠিক করে, চোখে মুখে, চলনে 'আমিও-লণ্ডনবাসী' এই স্বস্তিবোধ এসেছে। দরিদ্র বঙ্গ-সন্তান হেমন্ত এখন নিখুঁত কায়দায় হাত বাড়িয়ে বলতে পারে, হাউ ডু ডু !

ওদের বাড়ি কিংবা একঘরো ফ্ল্যাটে গিয়ে হেমন্তর সম্বন্ধে সবিতার ধারণা বদলে গেল। ভরতী রানী, হেমন্ত সেবক। রান্না করছে, বৌর জন্য মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট এনে দিচ্ছে। দু-জনের হাসিতে, কথায় ঠাট্টায় সন্ধ্যাটা কাটল ভাল। কিন্তু তবু যেন সবিতার মনে হল, কোথায় যেন ঠিক মেলেনি। দুজন দুজনকে যেন বড় বেশি ঠাট্টা করছে। তার মধ্যে সরল রসবোধ থাকতে পারে, কিন্তু বিষ লুকোন আছে আরো গভীরে। সবিতা নিজের মনে বিরক্ত হয়ে

ভাবলে, সে নিজে জীবনে সুখী হয়নি বলেই হয়তো সুখের মধ্যেও দুঃখ খুঁজে বেড়ায়।

হেমন্ত অভিযোগ করল, মিসেস বরাট, আর তো শুকনো রুটি চিবিয়ে পারিনে।

ভরতী আদর করে হেমন্তর চুল টেনে বললে, আহা! কি ভুলই হয়ে গেছে শুষ্ক পঞ্জাবকন্যাকে বিয়ে করে।

হেমন্ত দুধের বোতল দিয়ে রুটি বেলতে বেলতে বলল, আমি এ ভুল করতে আবার রাজী।

ভরতী দুষ্টু হেসে বললে, অত জোর করে কিছু বল না! one never knows!

সবিতা আরো কয়েকবার গেছে ওদের বাড়িতে। আস্তে আস্তে দেখেছে ঠাট্টার সরল হাসি শুকিয়ে বিদ্রূপে বেঁকে গিয়েছে।

সবিতা একদিন গিয়ে ঠিক করে ফেলল আর সে আসবে না ওদের বাড়িতে। হেমন্তর ওপরে সবিতার একটু মায়া পড়েছিল। ওরা দুজনেই সবিতাকে সাক্ষী করে ওদের ঠাণ্ডা যুদ্ধ চালাত।

ভরতী বললে, এস সবিতাদি। আমাদের প্ল্যানটা ভাল হয়েছে কি না বল।

কি তোমাদের প্যান?

আমরা দুজনে আলাদা থাকছি।

ভরতী হো-হো করে হেসে উঠল সবিতার মুখের ভাব দেখে, না গো না, separation নয়। আমার পরীক্ষা পর্যন্ত। আমি কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারি না হেমন্ত থাকলে, আর ফাইন্যাল একবারে আমাকে পাশ করতেই হবে। হেমন্তর পড়াও এগোচ্ছে না আমার জন্যে। বোন আসছে। তুমি কি বল?

সবিতা মতামত না জানিয়ে বললে, টাকা ম্যানেজ করতে পারবে?

সবিতা হেমন্তের মুখ দেখতে পেল না, সে রান্নায় ব্যস্ত পেছন ফিরে।

হ্যাঁ। হেমন্ত এক পাকিস্তানী বন্ধু যোগাড় করেছে। সে রাজী হয়েছে হেমন্তকে একটা ঘর ছেড়ে দিতে। আমি চাকরি আরম্ভ করলে হেমন্ত ওর ঘর ভাড়া শোধ করবে। আর সন্ধ্যেবেলা হেমন্ত এসে এখানে খাবে।

অর্থাৎ রান্না করে দেবে সবিতা মনে মনে বলে।

হেমন্ত একটু হেসে বললে, পাকিস্তানী হলেও বাঙালী তো, বাঙালীর দুঃখ বোঝে। ঠাট্টা করে কথাটা বললেও কেউ কোন কথা বলল না মুহূর্তের জন্য।

হেমন্ত সেই মুহূর্তের অস্বস্তি ভাঙার জন্যই সোৎসুকে বলতে শুরু করল, জানেন সবিতাদি, অদ্ভুত ছেলেটি, জাহাজ থেকে পালিয়ে এসেছে ছ-বছর আগে। রুটির কারখানায় চাকরি করে। দিন-রাত্রি খেটে ইস্ট এণ্ডে একটা পুরোন বাড়ি কিনেছে। ঠিক করেছে ভাইদের নিয়ে এসে এদেশে পড়াবে। নিজে নামও সই করতে পারে না। আমি ওকে ইংরেজী আর বাংলা শেখাব কথা দিয়েছি। তার বদলে অবশ্য ও আমাকে ঘর ভাড়া ছেড়ে দেবে।

ভরতী বলল, কই তুমি তো আমাকে সে কথা বলনি?

আজকেই ওর সঙ্গে কথা হয়েছে, তোমাকে বলার সময় পেলাম কোথায়!

সবিতা বলল, শুনেছি ওরা বছরের-পর-বছর আছে অথচ এক অক্ষর ইংরেজী বলতে পারে না, থ্যাঙ্ক উ ছাড়া?

হ্যাঁ সত্যি, কি করে কাজ করে, কি করে চালায় কে জানে! হেমন্ত ভরতীর দিকে চোখ টিপে বললে, আমার শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়ও বহু পাবেন ইস্ট এণ্ডে, তাদেরও একই অবস্থা।

ভরতী বললে, আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা সব পড়ুয়া ইন-টেলেকচুয়েল কিনা!

না ঠাট্টা নয়, হেমন্ত বললে, ওরা অদ্ভুত কষ্ট সহ্য করে এদেশে টাকা জমায়। তবে বেশির ভাগ পঞ্জাবীরা চেষ্টা করে ছেলে বৌ নিয়ে আসতে। কিন্তু পাকিস্তানীরা মেমসাহেব বান্ধবী করলেও নিয়মিত টাকা পাঠায় দেশে। পরিবার আনে না। ওদের জিজ্ঞেস করুন ওরা বলবে, কয়টা বছর পরেই দেশে ফিরে যাব, জমি-জমা কেনা হোক দেশে!

ওরা নাকি বিছানা ভাগাভাগি করে থাকে শুনেছি, সবিতা বললে, রাত্রে যে কাজ করে দিনের বেলায় তার বিছানার অধিকার দিনের শিফ্‌টে যে কাজ করে সে রাত্রি বেলায় শোয়!

সত্যি! ভরতী এবার যোগ দিল, সে বললে হাসতে হাসতে, আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা, ইঞ্জিনীয়ার। ফার্মের কাজে বার্মিংহামে এসেছিল ট্রেনিং-এ। হঠাৎ একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল। মনে হল সে স্বপ্ন দেখছে একজন তার ঘরে ঘোরাঘুরি করছে। জোর করে সে চোখ খুলতেই লোকটি বলে উঠল, হিন্দিতে, ঘাবড়াও মাৎ ইয়ার, আমি সোফায় ঘুমোচ্ছি, কাল যা হোক ব্যবস্থা হবে।

লোকটি সত্যি সত্যিই কাপড় জামা খুলতে আরম্ভ করল। ইঞ্জিনীয়ার দাদা আমার ইংরেজ privacy-তে বিশ্বাস করে। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, তার ঘরে বলা-কওয়া-নেই ঢুকে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, সে সোফায় ঘুমুবে!

ইঞ্জিনীয়ার দাদা কোনরকমে ঘুম চোখে ড্রেসিংগাউন চাপিয়ে ল্যাণ্ডলেডিকে হাঁক ডাক পাড়লে। ল্যাণ্ডলেডি তার বিশালবপু নিয়ে চোখ মুছে যা বললে, তাতে এই দাঁড়ায়, লোকটিই আমার দাদাকে দয়া করে ঘর ছেড়ে দিয়েছে। সে রাত্রের শিফ্‌টে কাজ করে, সপ্তাহ শেষ কাটায় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে। বুড়ী বললে, দাদার যদি এ ব্যবস্থা পছন্দ না হয় অনায়াসে এখনই বাড়ি ছেড়ে যেতে পারে, এক সপ্তাহের ভাড়া মিটিয়ে। ল্যাণ্ডলেডি সর্বশেষে মনে করিয়ে দিল দাদাকে, This is a free country, in case you don't know!

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। সবিতা বলল, তোমার দাদা কি করল ?

কি আর করবে। দাদা ঘরে ঢুকে দেখে লোকটি সোফায় পা তুলে অর্ধশায়িতভাবে মিটি মিটি হাসছে। সে বললে, যদিও সে নিজে ভাল ইংরেজী বলতে পারে না, তবে বোঝে। বললে, ইংলণ্ডের ল্যাণ্ডলেডিরা হচ্ছে রক্তশোষক, আমার থেকে পুরো ভাড়া নিচ্ছে, অথচ আমার ঘর তোমাকে দিয়ে কাউকে কিছু বলেনি। Blood sucker !

দাদা কোথায় ভাবছিল, লোকটিকে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বার করে দেবে, তার বদলে বললে, আমারই সোফায় শোয়া উচিত, তোমারই তো আসলে বিছানা।

কুছ পরোয়া নেই, ইয়ার !

ওরা আবার হাসল।

কিছুক্ষণ আগের ভারী আবহাওয়া যেন হালকা হয়ে গেল। সবিতা হঠাৎ উঠে পড়ে বলল. আমি যাচ্ছি।

সে কি, খেয়ে যাও।

আমার একটা দরকারী কাজের কথা মনে পড়ে গেল। সবিতা কোন আপত্তি না শুনে বেরিয়ে এল। কাজ কিছুই নয়। আবার ঝগড়া বাধার আগেই সে সরে পড়তে চায় হালকা হাসির ছোঁয়াচ নিয়ে।

হেমন্ত বিদেশী ফার্মে চাকরি পেয়ে ইণ্ডিয়া অফিস ছেড়ে দিল। যাবার দিন দেখা করতে এল সবিতার সঙ্গে। অনেক দিন পরে সে হেমন্তকে দেখে অবাক হয়ে গেল। সে যেন বুড়ো হয়ে গেছে, মাথার চুল হালকা হয়ে আসছে, যেন কোমল হাতের ছায়া দূরে সরে যাচ্ছে। মলিন মুখ। পাইপ ঠোঁটে মুখ রক্ষা করার হাসি। লণ্ডনবাসীর জেল্লা কোথায় ? হেমন্ত স্বভাব-সুলভ ভূমিকা না করে বললে, ভরতী পাশ করেছে।

চমৎকার! সবিতা আর না ঘাঁটিয়ে চুপ করে গেলে। অন্য সময় হলে বলত, কবে নিমন্ত্রণ পাচ্ছি পুনর্মিলনের?

কিন্তু বোঝা গেল, হেমন্ত কিছু বলতে চায়। সে আশা করে থেকে, তারপরে নিজেই বললে, সাড়ে-পাঁচটা তো বাজে। চলুন না চা খেয়ে নেওয়া যাক বাড়ি ফেরার আগে।

সবিতার ইচ্ছা হল বলে, না। না, সে শুনতে চায় না, ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক-শিশুদের কান্না আর গোঙানি। সে যে নিজে কত ক্লান্ত কেউ যদি জানত! হেমন্ত আবার বললে আবেদনের সুরে, চলুন না।

চলুন।

ওরা চ্যারিং ক্রসে লায়নস করনার-এ গেল। বিরাট হলে শুধু আলো আর কাচের প্রতিবিম্ব, ঝকঝক করছে। আমেরিকান কায়দায় খাবার জায়গাটি তৈরি হয়েছে। মাঝখানে বিরাট oven plate-এ হ্যামবুর্গার তৈরি হচ্ছে, তার তিন পাশে ঘোড়ার হিলের মতো লম্বা উঁচু টুল মাটিবদ্ধ হয়ে আছে, কাচের দেয়ালের পাশে আবার আরেক সারি বসার খাওয়ার ব্যবস্থা। আয়তন, আয়োজনে অভাব নেই, কিন্তু সৌন্দর্যের ছোঁয়া বড়ই কম। কাচের দেয়াল দিয়ে দেখা যায় দ্রুত চলমান নিঃশব্দ জনতা, আর অবিরাম ধাবমান যানবাহন ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে বুড়ো হকার চেঁচিয়ে উঠছে, ইভনিং নিউজ! ব্রেণ্ডার হত্যাকারীকে পাওয়া গেছে! সবিতা মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল, অধিকাংশ লোকই অফিস-ফেরত একা নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছে কিংবা না খেয়ে কাগজ পড়ছে। হয়তো পড়ছে ফুটবল পুলের প্রতিফল, খেলার খবর, হত্যা, যৌন-অপরাধ, ডাকাতি আর সমাজ গুজবের মুখরোচক ঘটনা!

সবিতার মনে পড়ে গেল, সে একদিন গীতির সঙ্গে গ্রীষ্মকালে এক পার্কের খোলা কনসার্ট শুনতে গিয়েছিল। কনসার্ট শেষে পার্শ্ববর্তী ইংরেজ বৃদ্ধার সঙ্গে গীতির আলাপ হল। সে বললে কথায় কথায়,

তুমি আমাদের দেশে পড়তে এসেছো, কিন্তু ভুল ধারণা নিয়ে যেও না ইভনিং পেপারগুলো দেখে। টাইমস পড়, গারডিয়ান পড়, ডেলী টেলিগ্রাফ পড়, রবিবারের অফজারভার পড়—

এদেশের বুড়ীরা বড় বকে! গীতি মিষ্টি হেসে বললে, সত্যি তোমাদের উঁচুদরের পত্রিকার সঙ্গে আমাদের দেশের পত্রিকার কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু গীতি হাসি মধুরতর করে বললে, কিন্তু আর যা সব কাগজ বেরোয় এদেশে এবং সাধারণ লোকেরা যা পড়ে থাকে, তার মতো রুচিহীনতায় আমরা বোধহয় কোনদিন নেমে যেতে পারব না।

ইংরেজ মহিলা আন্তরিকভাবে গীতির সঙ্গে একমত হল, Believe me, we are all ashamed of those papers!

সবিতা চেয়ারে বসতে বসতে ভাবলে, এদের কারুর মুখে লজ্জার কিন্তু কোন চিহ্ন নেই।

হেমন্ত চা নিয়ে এল, দুটো hot dogs সঙ্গে।

পাইপে আগুন ধরিয়ে বললে, ভাবছেন আপনাকে কেন টেনে আনলাম।

হ্যাঁ ভাবছি। সবিতাকে অস্পষ্টবাদিতার দোষ কেউ দিতে পারবে না।

হেমন্ত পাইপ টানে কায়দা করার জন্য নয়, কম খরচের জন্য। সে পাইপে আবার আগুন ধরাবার চেষ্টা করে বললে, পাইপ মুখে রেখেই, বন্ধুত্বের চেয়েও বড় মনে করেছিলাম প্রেম। এপাশে ওপাশে কোনদিকে তাকাইনি। যে উচ্চাশা নিয়ে এত কষ্ট করে এদেশে এসেছিলাম সে সাধনার কথাও একবার মনে হয়নি। শুধু ভেবেছিলাম ভরতীকে পাশে পেলেই আমার জীবন সার্থক হবে। What a fool I was! I even betrayed my dearest friend for that girl!

সবিতা হতাশ হয়ে ভাবলে, এই আরম্ভ হল! বাঙালী ছেলেরা

সোজাসুজি কথা বলতে পারে না কেন? ঘর যখন পুড়ে যাচ্ছে তখনও কি রুমালে ফুল তুলতেই হবে?

হেমন্ত পাইপ নিয়ে আজকে মরেছে। আগুন ধরিয়ে পরিষ্কার করে তামাক ভর্তি করে কূল পায় না। হেমন্ত যেন নিজেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলল, বলে উঠল তামাক পরিষ্কার করতে করতে, ভরতী আর আমার সঙ্গে থাকবে না বলেছে। legal separation চাইছে।

কেন? সবিতা শান্তভাবে বললে।

ও পঞ্জাবী বাঙালী বনে না।

হেমন্ত যেন বিরক্ত হয়ে বলল।

সবিতা বলল, তবে সাদা কালো তো আরোই বনবে না।

বনে তো না-ই।

সবক্ষেত্রে একথা সত্য নয়। সবিতা প্রতিবাদ করল। মুখ তুলে দেখল ওদের সামনের টেবিলে একটি আফ্রিকান নিগ্রো মেম সাহেবের গালে গাল লাগিয়ে বসে আছে। চায়ের কাপে চা পড়ে আছে, ধোঁয়া উঠছে বৃথাই।

কিন্তু হেমন্তর সমস্যা এখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সাধারণ নীতিগত নয়। সে উঠে পড়ে বলল, একটি উদাহরণ দেখান কে সুখী হয়েছে? সাংস্কৃতিক ব্যবধান হচ্ছে মস্ত বড় জিনিস!

সবিতা জানে, মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনকে দেখে, তা যতই সত্য-বিরুদ্ধ হোক না কেন। সুতরাং তর্কের মধ্যে যেতে সবিতা বিশেষ রাজী নয়। সে শুধু বলল, সংস্কৃতি যদি বড়ই হয়, তবে তার হৃদয়ের পরিধি এত ছোট হবে কেন, যে ভিন্ন সংস্কৃতিকে সে গ্রহণ করতে পারবে না? তাহলে আপনাদের বিদেশে শিক্ষার সাধনা করতে আসাই তো ভুল। সবিতা মনে মনে বলল, শিক্ষার সাধনা তো বটে! বিলিতি ডিগ্রির ছাপ নিয়ে বড় মাইনের চাকরি আর সম্মানের লোভেই শতকরা নিরানব্বই পয়েন্ট নয়জন তথাকথিত ভারতীয়রা সাধনা করতে ছুটে আসে এ দেশে।

দেখুন, সবিতা পরিষ্কার করে বলল, নিজেকে ভুলিয়ে লাভ নেই। পাত্রী আর সময় নির্বাচনে ভুল আসল কথা, কোন বিদেশ, ভিন্ন প্রদেশ বাজে অজুহাত! কেন সবিতার বিয়ে হয়নি খাঁটি বাঙালী ভদ্র সন্তানের সঙ্গে?

হেমন্ত সবিতার কাছ থেকে এ ধরনের কথা আশা করেনি। সে তা হজম করার চেষ্টা করে বলল, সে যাই হোক, বিয়ে তো ছেলেখেলা নয়। হঠাৎ পছন্দ হল নতুন পোশাক কিনলাম, পুরোন হলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

সবিতা বলতে পারত, ওদের বিয়েটা নতুন পোশাক কেনার মতো লোভ করেই হয়েছিল। কিন্তু ওর আর আঘাত দিতে ইচ্ছে করল না। সে বলল, আমাকে কেন বলছেন এ সব কথা।

আর কাউকে বলার কি মুখ আছে? পুরু চশমার ফাঁকে মনে হল হেমন্তের চোখ ঝাপশা হয়ে এসেছে।

দেখুন আমার পক্ষে ভরতীকে বলা কিছু সম্ভব নয়। অনুরোধ আসার আগেই সবিতা পাশ কাটাবার চেষ্টা করল। বলল, ও আমাকে জিজ্ঞাসা করে তো এ সিদ্ধান্তে আসেনি।

অর্থাৎ আপনি আমাকে দোষ দিচ্ছেন? হেমন্ত উগ্র হবার চেষ্টা করল।

আমার কাউকে দোষ দেবার প্রশ্নই ওঠে না। সবিতা বিরক্ত হয়ে বলল, আমি ডিভোর্স কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট নই।

সবিতা একটু লজ্জা পেল এভাবে কথা বলাতে। সে আস্তে আস্তে বলল, কিছুদিন যেতে দিন না। যদি মিল হবার হয়, তবে অমিলের কারণগুলো আপনা থেকেই আস্তে আস্তে সরে যাবে। ভরতী তো ছেলেমানুষ নয়।

হয়তো ঠিক হবে। হেমন্ত আশাহীনকণ্ঠে বলল, যেন নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্যই, আমি ওকে আমার জীবন নিয়ে খেলা করতে দেব না। দেব না ডিভোর্স! কোনদিনও নয়।

সবিতা ক্লান্ত স্বরে বলল, চলুন, রাত হয়ে যাচ্ছে।

টিউবে বসে সবিতা ভাবলে, হেমন্তের আত্ম-অহঙ্কারে আঘাত লেগেছে! সে ভালবাসে বলেই যে ছেড়ে দিতে আপত্তি করছে, তা সত্য নয়। তবে পঞ্জাবী বাঙালীর কথা তুলত না।

প্রায় মাস ছয়েক পরে ভরতীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সবিতার, Old Vic-এ ইবসেনের Ghost দেখতে গিয়েছিল ওরা। কিছুক্ষণ ফ্লোরা রবসনের কথা হল।

ওর অভিনয় দেখতে থাকলে মনেই পড়ে না, ভরতী বলল, ফ্লোরা রবসন এত কুৎসিৎ দেখতে।

শেষের সিনটা অদ্ভুত করেছে, কোন কথার দরকার হয়নি।

ওরা কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল রাস্তায়। সবিতা বলল, তুমি একা এসেছ নাকি, হেমন্ত আসেনি?

ওর সঙ্গে তো আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ভরতী এমনভাবে বলল যেন ছাড়াছাড়ি না হলেই প্রশ্ন করার প্রশ্ন উঠত। কেন হেমন্ত তোমাকে বলেনি? ভরতী একটু মুখ টিপে হেসে বলল, উত্তরের অপেক্ষা না করে, মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলা আসে বোধহয় seduce করার জন্য। অতএব বেশ খানিকটা ঝগড়া হয়। যাবার সময় বলে যায় এই শেষ। আবার আসে পরদিন।

সবিতা ওর বলার ধরন দেখে না হেসে পারল না। ওয়াটারলুতে পৌঁছে ভরতী বলল, চল রয়েল ফেস্টিভ্যাল হলে একটু শেরী খাওয়া যাক।

সবিতা ইতস্তত করছে দেখে ও বলল, উঁহু আমি এখন স্কুলে মাস্টারী করছি, supply teaching, অতএব ব্যাগে দু-চার পেনি খুঁজে পাবে। তুমি কিন্তু আমার অতিথি।

বেশ।

রয়েল ফেস্টিভ্যাল হলের সব কিছু ভাল লাগে সবিতার। কুৎসিৎ ধূসর লণ্ডনে এই হলটি যেন জীবন্ত মরীচিকা! সবিতা এখানে মাঝে

মাঝে কনসার্ট শুনতে আসে, সস্তা টিকিটে অবশ্য। শখ করে এককাপ চা খায়। কাচের দেয়ালের ধার ঘেঁষে বসে গ্রীষ্মকালে দেখে ফুলের বাহার। প্রমেনাডে প্রেমিক প্রেমিকারা কোর্টিং করতে ব্যস্ত। টেমস নদীতে হাঁস ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, ও পাড়ে ক্লিওপেট্রার নিড্‌ল বা সূচ আকাশ-অভিলাষী। মনে পড়ে সবিতার ওর কাছাকাছি কোথাও পূরব ওর হাত ধরেছিল আর বলেছিল, কথা বল না, শুধু অনুভব করতে দাও। মানুষের অনুভূতি এত ভঙ্গুর কেন? কই সে তো ভুলতে পারল না সেই সন্ধ্যার অনুভব, তার চেয়েও বেশি—উপলব্ধি, কেন? হয়তো তার জীবনে আর কিছু নেই, নতুন ঘটনা ঘটে না বলে।

সবিতার বড় বড় চোখের পাতা নেমে এল।

ভরতী হঠাৎ বলল, তুমি কোনদিন প্রেমে পড়েছ? না, না, স্বামী বাদে!

প্রেম কাকে বলে জানলে, সবিতা দুঃখ ভোলার চেষ্টা করে বলল, বলতে পারতাম পড়েছিলাম কিনা। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন না রোমান্টিক প্রেম জীবনে একটা—Achievement!

ভরতী জানে সবিতার একটু দুর্বলতা আছে বড় বড় লেখকদের উদ্‌ধৃত করা। তবে সে তাকে ক্ষমা করতে পারে, কারণ সবিতা বই পড়ে বলে। আর অন্য ছেলেরা—বিশেষ করে বাঙালী ছেলেরা—ভরতী নিজের মনে রাগ করে বলল, অন্তত হেমন্ত লোকের মুখে শুনে, খবরের কাগজে, ম্যাগাজিনে উদ্‌ধৃতি পড়ে বলত। মুখে অবশ্য বলল, প্রেমের কিন্তু রকম আছে—একটা গিলটি করা, আর একটা খাঁটি সোনা!

হেমন্তের সঙ্গে আমার প্রেম হচ্ছে সেই গিলটি সোনা। যা সোনার চেয়েও বেশি চকচক করে, চোখ ভোলায় মনও হয়তো ভোলে দু-দিন, কিন্তু রঙ টেঁকে না।

ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছ!

বিয়ের পরে দেহের পিপাসা মিটতেই আমার মাথা রাতারাতি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ওভেন-এর ভেতর থেকে গরম ডিশ বের করেই ঠাণ্ডা জলের কলের তলায় রাখলে জান তো ডিশ কিরকম সঙ্গে সঙ্গে ভু-টুকরো হয়ে যায়। আমারও সেই অবস্থা হয়েছিল। চেষ্টা করেছিলাম সহ্য করার। এখন ও আমার কাছে আসলেও আমার গা ঘিন ঘিন করে।

ভরতীর চোখে-মুখে পাতলা ঠোঁটে ঘৃণা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তবু সবিতা না বলে পারল না, হেমন্ত কিন্তু তোমাকে ভালবাসে।

ও যে ভালবাসে না, ভরতী বলল, এ সত্য ও স্বীকার করতে চায় না নিজের কাছেও। হেমন্ত শুধু জানে সেক্স। স্ত্রী, পরস্ত্রী, কুমারী বারাঙ্গনা—কোনটাতেই আপত্তি নেই। কথা—শুধু কথা দিয়ে নিজেকে ভোলায়, আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করে। কিন্তু শূন্য মস্তিষ্কের, শূন্য কথায় আমার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই আর। যথেষ্ট হয়েছে বাঙালীর ভুঁইফোঁড় কালচারে।

সবিতা কি বলবে ভেবে পেল না। সে বুঝল ভরতীর মনে অনেকদিনের জমা রাগ আর বিদ্বেষ পুরোন সঙ্গী পেয়ে ফেটে পড়েছে। সে শেরীর ছোট্ট গ্লাসে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগল।

ভরতী এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, যাকগে, নষ্ট দুধের জন্য দুঃখ আর রাগ করে কি হবে। দোষ আমারও কম নয়। ভাগ্য ভাল কোন ছেলেমেয়ে নেই।

ভরতী উঠতে গেল, সবিতা বাধা দিয়ে বলল, আর এনো না আমার জন্য। আমার একটুতেই নেশা ধরে যায়।

ভরতী হেসে বললে, তুমি আর মানুষ হলে না। এতদিন এদেশে থেকেও।

সবিতা দুঃখ করে বলল, কি করব বল, শত হলেও গ্রামে জন্ম তো। সবিতা আবার হাসে। সবিতা জিজ্ঞাসা করল, তোমার বোন আসেনি ?

কবে! পড়ছে তো। আমি যদি দেশে ভাল চাকরি পাই চলে যাব। দেশ থেকে টাকা পাঠাবো ওকে। ডিভোর্স দিতে রাজী হচ্ছে না হেমন্ত।

একদিন এস না, আমাদের ওখানে। বোন আমার সঙ্গেই আছে।

যাব খন।

সবিতার যাওয়া হয়নি। ভরতীকে সে দোষারোপ করে না, হেমন্তর সঙ্গে থাকতে পারেনি বলে। পরে শুনেছে লোকমুখে, হেমন্ত পাশ করে, ন-শ টাকা মাইনের চাকরি নিয়ে দেশে ফিরে গেছে, ভরতী ঢুকেছে সুপ্রীম কোর্টে। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, না হবার প্রয়োজন হয়নি, সবিতা জানে না। অনেক সময় ভাবে কি হয়েছে ওদের?

সাত

সবিতা, লণ্ডনে কেমন কাটছে?

আপনি আবার বিয়ে করেন না কেন? গীতি জিজ্ঞেস করে।

এ বয়সে? সবিতা হেসে বলেছে।

আপনার তো এমন কিছু বয়স হয়নি, বা দেখায়ও না। তাছাড়া বিলেতে তো বুড়ো-বুড়ীরাও বিয়ে করে।

আমাকে কে বিয়ে করবে, বল? সবিতা ঠাট্টা করার চেষ্টা করেছে।

চেষ্টা করেছেন?

এদেশে এমনিতেই এত প্রতিযোগিতা, আমার মতো আনাড়ী গেঁয়ো মেয়েছেলে কোন পাত্তা পাবে না। সবিতা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, কোন potential ছেলে আমার কাছাকাছি এলেই আমার কেমন যেন বুক শুকিয়ে যায়।

গীতি হো-হো করে হেসেছে।

সবিতার সত্যিই ভয় করে ছেলেদের। সেই যে মা ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত উঠতে বসতে বলছে, বাইরে যাবি না। চোখ বড় করে তাকাবি না কোন ছেলের দিকে। তোর বিয়ে দেব এমন ভাগ্য করে আসিনি, পুরুষের থেকে যত পারিস দূরে সরে পবিত্রতা বজায় রাখিস। চোদ্দ পুরুষের যেন মাথা হেঁট না হয়।

কথাগুলো মনে করে সবিতাও গীতির সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল। তবে গীতির মতো প্রাণ-খোলা হাসতে সে পারে না, তারুণ্য তার দেহে, তরুণস্বপ্ন তার মনে, হাসি সহজেই আসে তার।

সবিতা একবার কি ভয়ই পেয়েছিল! দেবেন্দ্র মারা যাবার কিছু দিন পরে, ওর এক বন্ধুর বন্ধু অনাথবন্ধু, দেশ থেকে এসেছিল কয়েক-দিনের জন্য কি ব্যবসার সূত্রে।

সবিতা তখন নিজের দুঃখের সাগরে এত দিশেহারা যে ভদ্রলোক আলাপ করার চেষ্টা করলেও, সে বিশেষ মন দেয়নি। অনাথবন্ধুকে সে উল্টোদিকের ঘর ঠিক করে দিয়েছিল।

রাত্রে হঠাৎ দরজায় টোকা। ঘুমের ওষুধ খেয়েও সবিতার ঘুম আসেনি, শুধু মাথা ঝিম ঝিম করছে। সে সবে ভাবছে, আরো দুটো ট্যাবলেট খেলে কি রকম হয়।

আবার টুক টুক—

কে?

টুক টুক—

সবিতা কোন রকমে ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে দরজা খুলে দেখে অনাথবন্ধু দাঁড়িয়ে আছে স্লিপিং স্যুট পরে, নূতন দেশ থেকে করে আনা; দেখেই সবিতার রক্ত চড়ে গেল মাথায়। ভদ্রলোক জানে ড্রেসিংগাউন না পরে বেরোতে হয় না লোকের সামনে।

কি চান? সবিতা রুক্ষভাবে বললে।

পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক অনাথবন্ধু চোখ মুখ কুঁচকে বললে, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। আমাকে ভেতরে আসতে দিন, প্লীজ!

কাল সকালে বলবেন। সবিতা তখনও রুক্ষ। আচ্ছা আপদ জুটেছে তো, কোন ভদ্রবুদ্ধি তো নেই-ই, বললেও শোনে না।

অত্যন্ত জরুরী, বিশ্বাস করুন। অনাথবন্ধু পায়ে ধরে আর-কি।

সবিতা দেখল, পাশের ঘরের লোক উঠে যদি এ দৃশ্য দেখে, তবে তার সুনাম কিছুমাত্র বাড়বে না। সবিতা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, আসুন পাঁচ মিনিটের জন্য।

অনাথবন্ধু সময় নষ্ট করল না। সবিতার হাত ধরে বিনয়ে বরফের মতো গলে গিয়ে এক নিশ্বাসে বলে চলল, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, আমাকে আপনার ঘরে দয়া করে থাকতে দিন। আমার যা সম্পত্তি আছে সমস্ত আপনার নামে লিখে দেব, আপনার মেয়েকে সব চেয়ে ভাল ইস্কুলে পড়াব। আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

রাগে, ভয়ে, সবিতা কি করবে ঠিক পেল না। ভাগ্যবশতঃ অনাথবন্ধু বড়ই ক্ষুদে চেহারার মানুষ। সবিতা কোন কথা না বলে, দরজা খুলে, প্রায় ওকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল।

গীতিকে সে এ গল্প বলেনি। ছবিকে বলেছে, ওর হাসি আর থামেনি। ছবি হাসতে হাসতে ব্যাখ্যা করেছে, ক্ষুদে বন্ধু কি করবে বল, চারদিকে মেম-সাহেবদের উদ্ধত বুক আর নগ্ন মসৃণ পা দেখে ওর মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল; থাকতে না পেরে বাঙালীই সই, একটু রোমান্স করতে এসেছিল রাত্রিবেলায়। জন্মে তো আগে দেখেনি। চাই কি তোকে বিয়েও করে ফেলতে পারত।

হ্যাঁ, এ্যাদ্দিনে সতীন নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করতাম। কিংবা অনাথবন্ধু হয়তো আন্তর্জাতিক বিবাহ-জালে বিশ্বাসী, আমাকে লণ্ডনেই রেখে দিত। পায়ের ওপর পা তুলে ‘মেড’ নিয়ে থাকতাম ভাল!

আযৌবন পুরুষকে ভয় করতে শেখানো সবিতা সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারে না। কেউ আগ্রহ প্রকাশ করলেই শামুকের মতো সে গুটিয়ে গেছে নিজের মধ্যে!

বিধবা হলে লোকে করুণা করে, অসৎ সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। সম্মান দিয়ে জীবনের সঙ্গী করতে কে চায়? স্বামী হারালে যেন জীবনের বাক্য-রচনায় দাঁড়ি পড়ে গেল। তার পরে যা, তা হচ্ছে পুরনো জীবনের কঙ্কাল। না বেঁচে উপায় নেই বলে কাজ করতে যাওয়া-খাওয়া-ঘুমোনো, আর মন আছে বলে চিন্তা করা। সে চিন্তার না আছে আদি, না আছে অন্ত। শীতকালের নিরেট কুয়াশায় যেমন জানলা ঝাপশা হয়ে যায়—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে জানলা মুছলে আলো দেখা যাবে, দেখা যাবে দূরের পথে কি অপেক্ষা করছে। কিন্তু কুয়াশা ভেদ করে কিছুই দেখা যায় না। কেবল ধোঁয়াটে, ধূসর সূর্য-ঢাকা অন্ধকার।

দোষ সে কাকে দেবে, বুকে হাত রেখে বলতে পারে না শচীন্দ্র তাকে সাহায্য করতে চায়নি, বলতে পারে না মা-বাবা লেখেননি, ফিরে এস আমাদের কুড়ে ঘরে। সবাইকে সে ফিরিয়ে দিয়েছে।

নিজের ওপর নির্ভর করতে সে শেখেনি কোনদিন। ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছে মেয়েদের জীবন গুটির মতো, এক হাত থেকে আরেক হাতে, দরকার হলে প্রথম হাতে ফিরে আসে। এ সত্য সে মন থেকে কোনদিন মানতে পারেনি। দিবা-স্বপ্ন দেখেছে কত দিন, একা সে বেড়িয়েছে পৃথিবীতে, নিজের গুণে, নিজের অধিকারে সে আকর্ষণ করছে, সম্মান-প্রশংসা-স্নেহ। অথচ আত্মজীবনকে প্রতিষ্ঠা করার মতো শিক্ষা, ক্ষমতা, আর মনের জোর কোনটাই তার কোনদিন ছিল না, আজও নেই।

দেবেন্দ্র যখন লণ্ডনে এল স্ত্রী-কন্যা নিয়ে, শচীন্দ্র আশা করেছিল ছোট ভাইয়ের হাতে ম্যানেজারী দিয়ে সে নিশ্চিত হবে; ব্যবসার

প্রসারে মনোনিবেশ করতে পারবে। আর এ আশা করা কিছু আব্দার নয়। শচীন তার চার ভাইকে এদেশে এনে উচ্চশিক্ষিত করেছে, সমাজারোহণে আর অর্থোপার্জনের দরজা খুলে দিয়েছে। কেউ যদি তার সুযোগ না নিয়ে থাকে, শচীন্দ্রকে অন্তত দোষ দিতে পারা যায় না।

দেবেন্দ্র একদিন বলেছিল সবিতাকে, দাদার হচ্ছে dynamic character, প্রথম যুগের আমেরিকানদের মতো।

শচীন্দ্র কতদূর পড়ে ছিল কি পড়েনি, তার খোঁজ কেউ নেয় না আজ। সে ষোল বছর বয়সে দেশ ছেড়েছিল লুকিয়ে জাহাজে উঠে, সমস্ত পৃথিবী ঘুরে ওর পছন্দ হল লণ্ডন। লণ্ডনেই আছে সোনার খনি; সোনার খনি আবিষ্কার করতে হলে মাটি খুঁড়তে হয় মজুরের মতো। শচীন্দ্র ছিল পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, মানুষকে মুগ্ধ করার যাদু তাকে শিখতে হয়েছে বেঁচে থাকার সংগ্রামে। কোন কষ্টই তার কাছে বড় মনে হয়নি, কোন মিথ্যাই তার কাছে পাপ মনে হয়নি, কারণ সে জেনেছে বড় হতে হবে, বড় সে হবেই।

শচীন্দ্র প্রথম বিয়ে করল এক সাদামাটা ইংরেজ মেয়েকে, যে স্বামীর সঙ্গে সমানে খাটতে রাজী। আস্তে আস্তে গড়ে উঠল ভারতীয় রেস্টুরেণ্টের ব্যবসা।

তখনকার দিনে ইংলণ্ডে বা লণ্ডনে ভারতীয় রেস্টুরেণ্টের ছড়াছড়ি ছিল না। সুতরাং সোনার খনির মুখ যেন দেখা গেল।

শচীন্দ্র একজন-দুজন করে চার ভাইকেই নিয়ে এল লণ্ডনে, তারা দাদার কাজে সাহায্য করতে পারবে বিকেলে, দিনের বেলা পড়াশুনো করার সুযোগও রইল।

কেউ হল ইঞ্জিনীয়ার, কেউ হল এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, কেউ হল ডাক্তার। শচীন্দ্রর ব্যবসা যখন দাঁড়িয়ে গেল, সে চায়নি ভাইদের নিজের কাজে রেখে দিতে। দেশে ফিরে যেতে হবে, শচীন্দ্র আর সাহায্য করতে রাজী নয়। বললে, লেখাপড়া শিখেছ, বড় হয়েছ, এবার জীবনে বড়-কি-ছোট হবার দায়িত্ব তোমাদের একার।

মণীন্দ্র শুধু থেকে গেল ইংলণ্ডে। মণীন্দ্রকে দিয়ে শচীন্দ্রর বহু আশা ছিল? সে শুধু চিকিৎসক হবে না, আবিষ্কারক হবে—ভারতবর্ষের চিকিৎসা ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গিলফোর্ড হাসপাতালে মণীন্দ্র তখন হাউস-সার্জন। ন্যাশনাল এমারজেন্সীতে অভিজাত পরিবারের মেয়েরাও বেরিয়ে আসছে। রুথ এল গিলফোর্ড হাসপাতালে নার্সিং করতে। সে নাকি লর্ড পরিবারের মেয়ে। দীর্ঘ কিন্তু ক্ষীণকায় বঙ্গসন্তান মণীন্দ্র দাদার আশা ভরসা চুরমার করে ঝপ করে বিয়ে করে বসল রুথকে, অবশ্য গোপনে।

শচীন্দ্র ক্ষমা করতে পারেনি। সে নিজে ইংরেজ বিয়ে করেছে সত্য, তাকে ডিভোর্স করেছে, আবার বিয়ে করেছে রূপসী সুইডিস আর্টিস্টকে সেও সত্য। কিন্তু তার ভাইরা যে বিদেশিনী বিয়ে করবে এবং বিদেশে বসবাস করবে, সে শচীন্দ্র সহ্য করতে পারেনি। এ যেন দেশকে ঠকিয়ে নেওয়া।

যাই হোক মণীন্দ্রর আর আবিষ্কারক হওয়া হল না। সে যুদ্ধের পরে নিজের চেষ্টায় সার্জারী খুলে বসল। রুথ নার্সিং ছেড়ে দিলে। বিশালবপু নীলরক্তাধিকারী রুথ-এর অপ্রতিহত কর্তৃত্বে মণীন্দ্র পসারে মনোনিবেশ করল। এমন কি শচীন্দ্র পর্যন্ত রুথকে এড়িয়ে চলত।

ইঞ্জিনীয়ার ভাই দেশে উন্নতি করল, কিন্তু দেবেন্দ্রর কোন উচ্চাশা নেই। দাদা খুশি হবে বলেই যেন সে পাশ করেছে।

দেবেন্দ্র নিজের কথা বলতে ভালবাসত না। সে সেজ হলেও, সব ভাইরা এমন কি শচীন্দ্র পর্যন্ত ওকে একটু ভয় করে চলত। দেবেন্দ্র লণ্ডনে ফিরে এসেই স্পষ্ট করে বলল, আমি আপনার ব্যবসায়ে কাজ করব না।

শচীন্দ্র জানে তার ভাই একবার মন ঠিক করে ফেললে, তাকে ফেরানো যাবে না। সে ঈষৎ হতাশ এবং বিরক্ত হয়ে বলল, গরীবানা যদি তোমার বিলাস হয়, আমার কিছু বলার নেই।

শচীন্দ্র এখন লণ্ডনের অন্যতম একজন ধনী, বিরাট সুন্দর বাগান-বাড়িতে থাকে। শোফার রোলস রয়েস চালায়।

দেবেন্দ্র বলল, আমি ফ্ল্যাট খুঁজে নিচ্ছি।

পরের ধনে সবিতার লোভ নেই, তবু তার ইচ্ছা ছিল দেবেন্দ্র দাদার সঙ্গে কাজ করে। একটু ভালভাবে থাকে, মেয়েকে আরো যত্ন করে মানুষ করে। ধন, বিলাসসামগ্রী সে জীবনে বড় দেখেনি, সে জন্য তার আকাঙ্ক্ষাও নেই। দাদার অপূর্ব সাজানো, ফিটফাট বাড়ি দেখেও তার লোভ হয়নি। সে ভেবেছে, এ ধরনের বাড়িতে সে কোনদিনই থাকতে পারবে না, মনে করতে পারবে না, এ তার নিজের সংসার।

সবিতা বললে স্বামীকে, দাদাকে একবারে না করা কি ঠিক হল ?

দেবেন্দ্র বই বন্ধ করে, বাড়িতে কারুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে যা সে কদাচিৎ করে, পূর্ণ দৃষ্টি সবিতার ওপর রেখে সে বললে, বিধাতা এ পাগলা যুগে আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ভুল করেছেন। আমি তোমাকে বিয়ে করে, কষ্ট দিয়ে, তার চেয়েও বড় ভুল করেছি।

আমার কষ্টের কথা কে বলেছে। সবিতা রাগ করে বলল।

কেউ বলেনি, আমি বুঝতে পারি। দেবেন্দ্র দূরত্ব রেখে কাছে এসে সবিতার মাথায় হাত রেখে শান্তস্বরে বলেছে, আমাকে ক্ষমা করার চেষ্টা কোরো তুমি। শান্তি পাবে।

সবিতা বলতে চাইল, কি আবোল তাবোল বকছ ক্ষমার কথা ! কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। বহুদিন পরে আপাত-অকারণে তার বড় কাঁদতে ইচ্ছে করল। সে কাঁদল না।

দেবেন্দ্র হাত সরিয়ে, সোফায় হেলান দিয়ে দৃষ্টি শূন্যে রেখে আস্তে আস্তে বললে, এই ইঁদুরের দৌড়-প্রতিযোগিতায় আমি যোগ দিতে রাজী নই। বড় ডিগ্রি চাই, কনুই দিয়ে ঠেলে একজনকে সরিয়ে ধনী হতে চাই, সুন্দরী স্ত্রী শুধু নয়, সুন্দরী মিসট্রেস, বড় গাড়ি, বড় বাড়ি—আমি চাই না সবিতা। তুমি শুধু বোঝার চেষ্টা

কর, রাজ্যের আবর্জনা জড়ো করে, তাকে সিন্দুকে পুরে রাখা আর হারানোর ভয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

আত্মবোধকে প্রকাশ করার ক্লান্তিতে যেন দেবেন্দ্র চোখ বন্ধ করল। সবিতা এই প্রথম এবং শেষ শুনলে দেবেন্দ্রর চাওয়া-পাওয়ার কথা।

এর পরে সে বহুদিন ভেবেছে দেবেন্দ্রর না চাওয়ার কথা। হাতড়ে হাতড়ে বই পড়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে তাঁর স্বামী কি বোঝাতে চেয়েছিল সেদিন।

কখনো মনে হয়েছে, উপেক্ষায়, দুঃখে, করুণায় এ শুধু দুর্বল দেবেন্দ্রর বাক্যরচনা। অক্ষমতাকে ঢেকে রাখার আত্মসন্তুষ্টি। যেন উপত্যকার জীবন থেকে সরে পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে ধিক্কার দেওয়া নিচের মানুষদের।

কখনো মনে হয়েছে, একথা সত্য, ঘরে জিনিস জড়ো করলেই মনে সুখ বাড়ে না। হয়তো তৃপ্তি হয়, অহঙ্কার হয়, কিন্তু না চাওয়ার আত্ম-সন্তুষ্টিই যাদ সত্য হবে তবে মানুষের সভ্যতা, বিজ্ঞান, কৃষ্টি দিয়ে জীবনের মানকে উন্নততর করার চেষ্টাই তো মস্ত ভুল। সভ্যতার অস্তিত্ব কি তবে মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে? আর তা ছাড়া সবিতা তার মেয়েলী সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে ভেবেছে বিলেতের সংসারের দরকারী যান্ত্রিক সামগ্রী তো বিলাস নয়, সময় আর হাড়-ভাঙা খাটুনী বাঁচানোর উপায়মাত্র! ঘরে একটা ফ্রীজ থাকলে সাতদিন বাজারে দৌড়ে সময় নষ্ট করতে হয় না, একদিন রান্না করে তিনদিন চালানো যায়। তবে হ্যাঁ, সবিতা মানে এদেশের মেয়েরা যখন প্রতিবছর নূতন মডেলের জন্যে কান্না জুড়ে দেয় সেটা দাঁড়ায় নিছক ক্ষোভে, পাশের বাড়ির জোনস্-এর মানে (to keep up with jones's) নিজেকে রাখার কুৎসিত বিকারে।

সবিতা কোনদিনও স্বীকার করতে পারবে না তার গ্রামের জীবন অশিক্ষায়, দারিদ্র্যে, কুসংস্কারে, ছোট লোভে, ছোট দুঃখে, ছোট হিংসায়, ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষায় অধিকতর লোভনীয় বা সুখের ছিল। হ্যাঁ,

শান্তি হয়তো ছিল, কিন্তু সে শান্তি অ-বৃহতের শান্তি, অজ্ঞানতার শান্তি।

অন্যদিকে শচীন্দ্রকে সে দেখেছে সোনার পাহাড়ে বসেও ছটফট করে ছুটোছুটি করতে, বিয়ে করে বিচ্ছেদ হয়ে, বিয়ে করে, আবার বিয়ে বিচ্ছেদ করে অসংখ্য সুন্দরীর পুজোতেও সুখ কেবলই মুঠোর ভেতর জলের মতো গড়িয়ে গেছে।

সত্য কি এর মাঝখানে কোথাও আছে? আজ যদি দেবেন্দ্র বেঁচে থাকত সে জিজ্ঞাসা করতে পারত, তর্ক করতে পারত। দেবেন্দ্র যদি শুধু বেঁচে থাকত!

বড় মায়ায়, সবিতা হাসবার চেষ্টা করে ভাবে, ঘুণ ধরা সভ্যতা যেন প্রতিশোধ নিল দেবেন্দ্রর আকাঙ্ক্ষাহীন ঔদাসীন্যের। বীভৎস ক্যান্সার চোরের মতো কবে যে দেবেন্দ্রর পাকস্থলীতে বাসা বেঁধেছিল কেউ টের পায়নি। দেহ নিয়ে অভিযোগ করা দেবেন্দ্রর স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাই একেবারে শেষকালে যখন তাকে হাসপাতালে পাঠানো হল, তখন আর কোন উপায় ছিল না।

পঞ্চাশ সালে দেবেন্দ্র ফিরে এসেছিল লণ্ডনে। তখনও ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি পাওয়া শক্ত ছিল না। ছোটখাট চাকরিতেই সে খুশি, অফিসারের চেয়ার তখন খালি নেই।

দেবেন্দ্র বললে সবিতাকে একা বেরিয়ে বাজার করতে, মায়াকে নিয়ে ঘুরে আসতে। বলল, ইংরেজী বলতে হলেই ইংরেজী শিখবে। বিলেতে যখন এসেছ, এ দেশের মেয়েদের মতোই তৈরি কর নিজেকে।

সবিতা মনে জোর করে বেরোতে লাগল। ওকে সব চেয়ে আকর্ষণ করল মেয়েদের স্বচ্ছন্দ চলাফেরা, পুরুষের পাশাপাশি চাকরি করা। ওর মনে হল, ও ঠিক দেশেই এসেছে। সে যদি এখনও লেখাপড়া শিখতে পারত, লেখাপড়া জানত!

দেবেন্দ্র বলল, বেশ তো, বই কিনে দিচ্ছি, বাড়িতে পড়, জি. সি. ই. (General Certificate of Education) পাশ কর!

সবিতা ফাঁকে ফাঁকে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ঘরের সমস্ত কাজ করে, বাজার করে, মায়াকে সারাক্ষণ লক্ষ্য রেখে সে বড় একটা সময় পেত না। সে চেষ্টা করত সন্ধ্যার সময় দেবেন্দ্রর কাছে বই নিয়ে বসার। কিন্তু অতিথি নিত্য লেগেই ছিল। দু-তিনজন করে আসত, তারা গল্প করত। দেবেন্দ্র মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে হুঁ-না, বলত। চা-খাবার যোগাড় করে দেওয়ায় ব্যস্ত থাকতে হত সবিতাকে, তবে একেক দিন ওরা ড্রিঙ্কও করত। অনেক দিন সবিতার ভয় যায়নি। দেশে চিরকাল শুনে এসেছে মদ খায় চরিত্রহীন বদমায়েশ লোকেরা, কিন্তু সে দেখল, অতিথিরা মদ খেয়েও বেশ সুস্থভাবেই গল্প করেছে, এবং তাদের চরিত্রহীনতার লক্ষণ তারা কোনদিন প্রকাশ করেনি সবিতার কাছে।

দেবেন্দ্র বলত, সবিতা, এসে বস না আমাদের সঙ্গে।

সবিতার একটু লজ্জা করত প্রথম দিকে, এত পুরুষ মানুষদের মধ্যে একা বসে থাকতে। সে মায়ার অজুহাত দিয়ে সরে পড়ত।

কিন্তু দেবেন্দ্রর বড় ইচ্ছা সবিতা বসে, অংশ নেয়। দু-একদিন অল্পক্ষণ বসতেই সবিতার নেশা ধরে গেল, ছেলেদের মধ্যে গল্প আলোচনা সে বড় একটা শোনেনি।

অতিথিদের মধ্যে চৌধুরী আর ব্যানার্জী ইণ্ডিয়া হাউসের অফিসর ইংরেজ বিয়ে করেছে। চৌধুরীকে দেখলে মনে হবে কোলকাতার ব্যাঙ্কে বা ইনসিওরেন্স অফিসের কেরানী। সহজে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু নিকট বন্ধু-মহলে তর্কে খুব উৎসাহী। মনে হয় কারুর দিকে তাকায় না, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং গভীর। মাথায় টাক পড়ে এলেও, এখনও ছেলেমানুষী করতে ভালবাসে।

ব্যানার্জী চৌধুরীর একেবারে উল্টো, অথচ অভিন্ন বন্ধু। বেঁটে

কিন্তু স্থূল নয়। টেনিস খেলতে ভালবাসে। তারও চুল কমে আসতে থাকলেও যত্ন করে আঁচড়ানো। কথা বলতে, হৈ-হৈ করতে ভালবাসে। বোঝা যায় ঘরে সুন্দরী স্ত্রী এবং মেয়ে বড় হতে থাকলেও সুন্দরী নারীকে প্রশংসা করতে সে মোটেই অপ্রস্তুত নয়।

ঘোষ বর্মীয় দূতাবাসের অফিসর। রেঙ্গুনে জন্ম, কর্ম। দেহে সহজ আভিজাত্য থাকলেও নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পছন্দ করে না। দেখলেই মনে হয় কোন জাঁদরেল বৌ তার দেহ মন আর খাম-মাহিনার (wage-packet) মালিক। ত্বুবেলা খেয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করাই তার একমাত্র চিন্তা। যদিও বাঙালী সংস্কৃতি সংগঠনের সে একজন অন্যতম উদ্যোক্তা।

সুপুরুষ যদি কেউ থাকে তো সেন। মধ্যবয়সী হলেও তরুণীরা ত্বু-বার ফিরে না তাকিয়ে পারে না। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, দেশের কড়া বিলিতি সাহেব। কিন্তু ইলিশ মাছের ঝোল আর নরম মেঠো জলভরা পূর্ববঙ্গের কথা বলতে এখনও তার চোখ ছল ছল করে ওঠে। সেনকে দেখলে অবাক হবার কিছু নেই। যদিও শোনা যায়, সেনজায়া বহু বছর সেনের কোন খবর না পেয়ে স্বামীকে পুনরুদ্ধার করতে এসেছিল বিলেতে, এখন সুখে ঘরকন্না করছে।

ডাঃ চৌধুরীকে দেখলে মনে হয় আমাদের গ্রামের ক্ষুদে, ব্যস্তবাগীশ চিকিৎসক। বিয়ে করেনি। বলে থাকে, এ দেশের মেয়ে বিয়ে করার চেয়ে কুকুর-পোষা ভাল, অধিকতর বিশ্বস্ত। অতএব, বুলডগ, টেরিয়র, চৌধুরীর নিত্য সঙ্গী।

ডাক্তার সেন জার্মানীতে ডাক্তারী পাশ করে এবং জার্মান মেয়ে বিয়ে করে, হোটেল খুলে বসেছে। সে বড় একটা আসার সময় করে উঠতে পারত না আসরে যোগ দেবার।

ত্বু-একজন ছাত্রও মাঝে মাঝে আসত। দিলীপ ত্বুই ছেলে বৌ নিয়ে এসেছে লণ্ডনে এফ. আর. সি. এস. পাশ করার জন্য, দেশের প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে, সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে।

প্রশান্ত আইনের ছাত্র ; প্রৌঢ় ও সভায় বেমানান, বয়সের দিক থেকে। সে ছিল প্রতিবেশী।

সেনজায়া দেশে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সবিতাকে মাঝে মাঝে ডাকত। চৌধুরী এবং তার স্ত্রী সবিতার বিপদের দিনে যা করেছে, তার জন্য সে চিরকৃতজ্ঞ। সে এখনও মাঝে মাঝে দিলীপের বাড়িতে যায়। এফ. আর. সি. এস. পাশ করার আশা ছাড়তে পারেনি দিলীপ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তখনও উত্তেজিত করে বিলেতের ভারতীয় আসরকে। সবিতা অনেক সময়ে ভেবেছে ; এরা যদি দেশের জন্য এতই চিন্তা করে, তবে দেশে ফিরে যায়নি কেন ?

সেন বললে, পাইপ মুখ থেকে সরিয়ে, শিল্প-বিপ্লব ছাড়া দেশোন্নতির আর কোন পথ নেই। কিন্তু আমার মনে হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি-ব্যবস্থার উপর বড় বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। সেন ইংরেজদের মতো মৃদুস্বরে কথা বলে, উত্তেজিত হলেও গলা উঁচুতে ওঠে না।

চৌধুরী শুধু লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে লাস্কির ছাত্র নয়, সে বিপ্লবে বিশ্বাস করে। বাঙালীদের মতোই তর্ক করতে গিয়ে, রেগেমেগে লাল হয়ে যায়, অল্প অল্প তোতলাতে থাকে। চৌধুরী বললে, কাগজে পরিকল্পনা দিয়ে কোনদিন কোন দেশের উন্নতি হয়নি। চাপকান বদলে সাদা পাজামা পরা স্বাধীনতায় কিছু লোক লুটেপুটে বড়লোক হবে, আর নেহরুজী জনতাকে বলবেন, গান্ধী আদর্শে চ-চরকা কাট। এই তো হচ্ছে দেশের ব্যবস্থা।

ব্যানার্জী সোজা হয়ে বসে বললে, তার দৃষ্টি অনবরতই চারিদিকে ঘোরে, এ-ও তুমি অন্যায় বলছ চৌধুরী। এত বড় পরিবর্তনের পর দেশের যা অবস্থা, কিছু লোক তো সুযোগ নেবেই। সে তো সব দেশেই নেয়। কিন্তু নেহেরু আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে না বা করবে না একথা ধরে নেওয়া মহা অন্যায়। ব্যানার্জী একটা শব্দই দুবার করে বলে উত্তেজিত হলে।

দেবেন্দ্র তার নৈশঃব্দের ধ্যান ভেঙে আস্তে আস্তে বললে, কথা বোধহয় উঠেছিল শিল্প আর কৃষির প্রাধান্য নিয়ে। তাই নয় কি, সেন?

সেন হেসে বলল, সম্ভবত।

বেশ তাই না হয় ধরে নিলাম, চৌধুরী বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে বলল, জমিদারীর মূল ধরে উপড়ে না ফেললে কৃষি-ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কোথায়?

কেন কেন, ব্যানার্জী বললে, উচ্ছেদ তো হচ্ছে।

হ্যাঁ হচ্ছে! হ-হবে, চৌধুরীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, কিন্তু কুড়ি বছর ধরে কৃষকের কান মুলে সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে জমিদারের। যাদের বংশগত ঐতিহ্য হচ্ছে কৃষকদের রক্ত চুষে শহরে ফুর্তি করা।

ডাঃ চৌধুরী এতক্ষণ কুকুরকে আদর করছিল। মুখ না তুলেই বলল, আমাদের দেশের আসল সমস্যা হচ্ছে লোকসংখ্যা। লোক-সংখ্যা কমাতে না পারলে শিল্প বা কৃষি কোন বিপ্লবেই দেশের কিস্সু হবে না।

ব্যানার্জী ছ্যাবলামির সুযোগ পেলে ছাড়ে না। সে চোখ নাচিয়ে হেসে বললে, তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ। তোমার লোকসংখ্যা নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন?

ব্যানার্জী নিজের রসিকতায় নিজেই থাই চাপড়ে হেসে উঠল। সকলের হাসি একটু থামলে ডাঃ চৌধুরী গম্ভীরভাবে বলে উঠল, ব্যাচেলর হতে পারি, ব্রহ্মচারী কে বলেছে! দুশ্চিন্তা তো সে জন্যই আমার বেশি!

সবিতা লজ্জা পেল কুমারীর মতো। সে ভান করল সে আসরে নেই, সে শোনেনি। সত্যি কথা বলতে কি, সে ঘরের কোণে ছোট টুলে বসে উলের জামা বুনছিল। তার অস্তিত্ব বোধহয় সবাই ভুলেই গিয়েছে।

মূলত এরা প্রায় সকলেই শচীন্দ্রর বন্ধু। কিন্তু শচীন্দ্র আজ অনেক

উঁচুতে উঠে গেছে। তার সমাজ-পরিধিতে যোগ দেওয়া বা পাল্লা দেওয়া বাঁধা মাইনের ঘর-বদ্ধ-অফিসর বা ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব নয়।

শচীন্দ্র যদিও চেষ্টা করে শনি কি রবিবারে আসর গড়ে তুলতে দেবেন্দ্রর বাড়িতে। শচীন্দ্রর বিচিত্র জীবন যাত্রার বেগবতী তীব্র বিলাসের গুজবে, হিংসার সবুজ আলো জ্বলে ওঠে আসরের চোখে। সে যেখানেই বসুক, যেমন করেই বসুক, সে-ই আসরের কেন্দ্র, মধ্যমণি। অর্থ শুধু স্যুটের কাটে, দামী কাপড়ে ছাপ মেরে ক্ষান্ত থাকেনি, তার মুখে আপন ক্ষমতায় পৃথিবী জয় করার আত্মতৃপ্তি, যেন ধরে নিয়েছে তার মতামতের বিরুদ্ধে যাওয়া মূর্খতা।

মণীন্দ্র সপ্তাহে একদিন আসে। সবিতাকে বৌদি বলে ডাকে। আব্দার করে দেশের দেওরের মতোই। সবিতাও ওকে স্নেহ করে। আরেকটু বেশি ক'রে করে, কারণ ওর ধারণা রুথ আদর-আব্দারের শব্দার্থ টুকুও জানে না। রুথ প্রথমে একদিন দেবেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু কি বিষদৃষ্টি বিনিময় হল সবিতা আর রুথের মধ্যে তা ওরাই জানে। রুথ আর কখনো আসেনি। সবিতাও গিলফোর্ডে যাবার কথা তোলে না।

দেবেন্দ্র এক-আধবার গেছে রুথকে দেখতে। ফিরে এলে সবিতা বলেছে, কি করে তুমি কথা বল ওর সঙ্গে! আমার তো ওকে দেখলে বাঘের মতো ভয় করে। বেচারা মণিঠাকুরপো।

বেচারা কেন? আমার তো মনে হয় রুথ মেয়েটি বেশ ভাল। সবাই কি আর একরকমভাবে ভাল হয়?

ভাল হলেই ভাল। আমাকে কোনদিন যেতে বল না যেন।

বলব না। ভয় নেই তোমার।

সে যাই হোক সবিতার বাড়িতেই শচীন্দ্রর সঙ্গে মণীন্দ্রর ভাতৃ মিলন হয়েছিল।

শচীন্দ্র লোক ভালবাসে, কথা বলতে ভালবাসে. লোক যে তাকে

মান্য করে একথা জানতে ভালবাসে। সবিতার শচীন্দ্রকে ভালই লাগে এবং সে মান্যও করে। তাই সপ্তাহশেষের লোকসমাবেশের জন্য পঞ্চপদে রান্না করতে সে ক্লান্ত হয় না। তার রান্নার আস্বাদ আর মিষ্টি নম্র স্বভাবের জন্য সবিতাকে সবাই স্নেহ করে। সবিতা তাতে খুশি। জীবনে এত লোক এত ভাল তাকে কোনদিন বলেনি।

ব্যানার্জীর সুন্দরী স্ত্রী টোনী, বিপুলাকায়া চৌধুরীজায়া তার কক্‌নি ইংরেজীতে সবিতার প্রশংসা করে কূল পায় না।

সবিতা কি কোনদিন জানত তার দীর্ঘ নিকুষ-কালো ঈষৎ ঢেউ খেলানো চুলে এত রূপ লুকিয়ে ছিল। কে তাকে বলেছে, তার কালো কুৎসিত রং সোনালি বাদামের মতো উজ্জ্বল, মসৃণ! এরা নাকি গ্রীষ্ম-কালে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে পড়ে থাকে সূর্যের আলোর পিপাসায়, সবিতার মতো একটু বাদামী রং চুরি করার জন্যে। কোনদিন তো শোনেনি তার দেহে শাড়ি ঘিরে থাকলে এত লালিত্যপূর্ণ দেখায়!

সাধারণ মেয়ে সবিতা যেন আবিষ্কৃত হল রবিঠাকুরের মালতীর মতো। সবাই চলে গেলে সবিতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবছিল, সে নিজে যে এত সুন্দর দেখেনি কেন? দেশের লোকে আগে তার উল্টো কথা বলেছে বলে কি?

দেবেন্দ্র যে দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে সবিতা টের পায়নি। দেবেন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, অল্প হেসে, তুমি যে সুন্দর তাই যাচাই করছ বুঝি?

সবিতা বুকের আঁচল না তুলেই বললে, তোমার মুখে তো এই প্রথম শুনলাম।

না শুনলে কি তুমি জান না আমি কি ভাবি। দেবেন্দ্র সস্নেহে বললে।

আমি ভাবি, সবিতা দেবেন্দ্রর বুকের কাছে এসে বলল, নিজের অর্ধ-আঁচল তোলা সু-উন্নত বক্ষ প্রায় ছুঁয়ে, আমি ভাবি তোমার শরীর রক্ত-মাংসে তৈরি নয়। সে কি সত্য?

দেবেন্দ্র হাত তুলে কিছু বলতে গেল। তার কপালের একপাশের নীল শিরা লাফিয়ে দপদপ করে উঠল। সে সবিতাকে সরিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যাবে এমন সময় দেখল তিনবছরের মায়া তার কট-এর রেলিং দু-হাত দিয়ে ধরে নিবিষ্ট চোখে মা বাবার এ নাটকীয় খেলা দেখছে।

সবিতা প্রায় চীৎকার করে বলল, তুমি পঙ্গু, কাপুরুষ! আমার ঘরে আর কোনদিন এস না। চলে যাও এখান থেকে।

দেবেন্দ্র কঠিন তীব্রস্বরে গলা নামিয়ে বললে, মেয়ের সামনে নিজেকে সংযত কর। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি—

না না, সবিতা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল যেন মায়াকে এখন নিয়ে গেলে ওর সর্বনাশ হবে ভবিষ্যৎ সবিতার বুকে দাঁড়িয়ে বড় কঠিন হাসি হাসল।

দেবেন্দ্র মায়াকে কোলে তুলে সবিতার বুকে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মায়া মিষ্টি গলায় একটু অভিযোগ করে যেন বললে, মা বাবাকে তুমি বোকো না। দুষ্টুমি করলেও বোকো না।

সবিতা নিজের চোখের আড়ালে কেঁদে বললে, একটু হাসার চেষ্টা করে, কেন?

বাবা যে আমাদের কখনো বকে না।

সে কথা সত্যি। দেবেন্দ্রর রাগ আজ পর্যন্ত সবিতা দেখেনি। কিন্তু রেগে যেতে পারে, এই ভয়ে, সবিতা হয়তো স্বামীকে একটু ভয়ই করে। সে বললে, আচ্ছা আর বকব না, তুমি ঘুমোও।

মায়াকে সবিতা বুকে করে নিজের বিছানায় শুল। ঘুমিয়ে পড়ল মায়া। সবিতা নিজেকে অভিসম্পাত দিয়ে কটুকথা বলে কূল পেল না। লজ্জাহীনা সবিতার উচিত শাস্তি হয়েছে। ইংরেজ মেয়েরা মিথ্যেবাদী, সে সুন্দর নয়, এতটুকুও নয়। দেশের লোকে তাকে যা বলত, সেই সত্য, সে কালো, সে কুৎসিত, সে চির অনাদৃত।

মানুষের চিরবন্ধু ঘুম এল নেমে কোথা থেকে—মিলিয়ে গেল কোথায় সবিতার তিক্ত আত্মবিলাপ, আবেগ অতৃপ্ত বঞ্চিত দেহ মনের নিষ্ফল ক্রন্দন।

আট

সবিতার স্বামী-জিজ্ঞাসা

জীবনযাত্রার দাবি থেমে থাকে না। ভোর হয়, মায়া ওঠে, চুপি চুপি বাবার কাছে চলে যায়। দেবেন্দ্র মায়াকে খেতে দিয়ে নিজের প্রাতঃরাশ সেরে সকাল সাড়ে-আটটার কুয়াশাভরা-অন্ধকারে, অফিস-মুখো ছোটে ; বলে যায় মা-র ঘুম ভাঙিও না, তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো বাইরের ঘরে খেলা কর, কেমন ?

হ্যাঁ। মায়া কথা দেয় মাকে ওঠাবে না।

বিশ্রী কাঁচ ভাঙার শব্দে সবিতার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে সহসা বুঝতে পারল না ভোর হয়েছে কিনা, মোটা রঙিন পর্দা ভেদ করে ভোরের আলোর মুখ ভেংচানো কালো আধো-ছায়া সহজে ঘরে ঢোকে না।

মায়াকে হাত বাড়িয়ে দেখতে পেল সে নেই, সবিতা লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গেল শব্দ লক্ষ্য করে। রাত্রের পোশাক সে ছাড়েনি।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখতে পেল কাপ ডিশ ধোয়ার বেসিনের নিচে মায়া টুল উল্টে পড়ে আছে। সবিতা যেতেই মায়া হাত তুলে বলল, শান্তভাবে, মা-মণি, রক্ত লাল হয়ে গেল কেন ?

কাঁচের গ্লাসে মায়ার হাত কেটে গেছে।

তুমি এখানে কি করছ ? বাবা কোথায় ?

বাবা আপিসে চলে গেছে। আমি বাসন ধুচ্ছিলাম।

সবিতা মায়াকে কোলে নিয়ে দেখল অনেকটা কেটেছে, ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে। সে তার কাপড়ে হাত বেঁধে ছুটে গেল ডাক্তারকে ফোন করতে। কিন্তু তার ম্যাট্রিকের বিদ্যায়, উপরন্তু খাস ইংরেজের প্রশ্নে সে না পারল বুঝতে, না পারল বোঝাতে।

দুম করে ফোন রেখে, তার মনে পড়ল, সীমা নিশ্চয় ঘরে আছে, চাই কি ওর ডাক্তার স্বামীও হয়তো বাড়িতে আছে।

সীমার সঙ্গে তার বিশেষ আলাপ নেই, তবুও সে না গিয়ে পারল না। সীমা তখনও বিছানায়। দেশ থেকে-আনা আয়া ছেলেমেয়ের তদারক করছে। টাকার গর্বে সীমার মাটিতে পা পড়ুক আর নাই পড়ুক, সে কিন্তু শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বললে, ডাক্তারকে ফোন করে আসতে আসতে দুপুর হবে। তাছাড়া আমার মনে হয় ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

সবিতা মুখ শুকিয়ে কিছু বলতে যাবার আগেই সীমা বলল, চলুন, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। ফোন করে দিচ্ছি ট্যাক্সির জন্য, ততক্ষণে I'll be ready !

সবিতা ভেবেছিল দেবেন্দ্র ফিরে নিশ্চয় খুব রাগ করবে, মায়া ওর চোখের মণি। সে শুধু ওভারকোট ছাড়তে ছাড়তে বললে, ও, ছোট ছেলেমেয়েদের হয়েই থাকে। ডাক্তার বলেছে তো ভয়ের কিছু নেই, তবেই হল।

ওর রাগ না দেখে, সবিতা তার আত্মধিক্কারের সুযোগ নিল। সে রেগে বললে, আমাকে সকালে ডাকতে কি হয়েছিল। একদিন না হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম !

সবিতার নজরে পড়ল, মায়া বাবার কোলে চোখ বড় বড় করে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। সবিতা কথা দিয়েছে না সে আর বকবে না বাবাকে ?

দেবেন্দ্র যেন শোনেনি এভাবে বলল, খেতে পারলে হত এখন।

সবিতা লজ্জা পেল নিজের বদ মেজাজে, অফিস থেকে লোকটা

এসেছে ক্লান্ত হয়ে, কোথায় তাকে খেতে দেবে, না সে বকে চলেছে।

রান্না হয়ে গেছে হাত ধুয়ে এস।

দেবেন্দ্রর সংসারে ইংরেজদের মতোই রাত্রের খাওয়া অফিস-ফেরৎ সারা হয়। সবিতা এখনও বিশেষ বিদেশী রান্না শেখেনি, তাই দিশি মতেই রোজ রান্না হয়।

ওরা তিনজনে একসঙ্গে খেতে বসলে, সবিতা বিস্তারিতভাবে বলল কি ভাবে কি হয়েছে।

মায়াকে তুমি লক্ষ্মী মেয়ে হতে বলে গিয়েছ, সে ভাবলে, বাসন মেজে আমার উপকার করবে ! কি উপকারই করেছেন !

সবিতা ছদ্মরাগে ভুরু তুলে মায়াকে বললে, আর যদি তুমি কোন-দিন কাঁচের বাসন ধরেছ তো, দেখাব মজা !

বড় হলে ধরব। মায়া বললে গম্ভীরভাবে।

কথা বেশির ভাগই এক তরফা হয়। সবিতা মুখ গোমড়া করে খেতে পারে না।

মিসেস বোসকে যা ভেবেছিলাম তা কিন্তু নয়। সে না হলে যে আজ কি করতাম জানি না।

সবিতা সীমার উপকারী চরিত্রের বিবরণ দিয়ে বললে, মাত্র পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, আমি তো ভেবেছিলাম ওকে মধ্যবয়সী। বাপের বাড়ি আসলে খুব বড়লোক। তোমার কি মনে হয় ডাক্তার ওকে টাকার জন্য বিয়ে করেছে ?

কোন উত্তর এল না, সবিতা বললে, কি, কথা বলছ না যে ?

কার কথা বলছ ?

সবিতা হৈ-হৈ করে হেসে উঠল। সে সময়ে সময়ে মায়ার মতোই ছোট হয়ে যায়, মাথা ঝাঁকিয়ে অভিমান ভরে বলে, তুমি আমার কথা কিছু কানে নাও না। আমি শুধু পাগলের মতো বকে যাই।

বাঃ, দেবেন্দ্র একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে—তোমাকে আর মায়াকে

নিয়ে গেল হাসপাতালে ট্যাক্সী করে। কিছুতেই পয়সা নিতে চায়নি।

কে? কি নাম? সবিতার চোখে দুষ্টুমি ঝিকমিক করে উঠল।

দেবেন্দ্র মাথা চুলকে, চশমার ওপর দিয়ে মায়ার দিকে আশাভরে তাকায়। মায়া বাবার গলা ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কানে কানে কি বললে।

হ্যাঁ, নিশ্চয় মিসেস বোস তো।

সবিতা রাগ করে হেসে বলল, একে বলে dishonesty, মেয়েও তেমনি হয়েছে!

বেলের শব্দ হল। দেবেন্দ্র উঠতেই সবিতা বলল, এসে গেছে তোমার অনাথ-বাঙালী বন্ধু-সমিতি!

দেবেন্দ্র দরজা খুলে দেখতে পেলে এক অপরিচিত ভারতীয় দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রলোক বুঝল দেবেন্দ্র ওকে চিনতে পারেনি। সে বললে, আমি আপনাদের প্রতিবেশী ডাঃ বোস, আপনার মেয়ে কেমন আছে খবর নিতে এলাম।

ও ভাল আছে। খবর নেবার ধন্যবাদ। আসুন না ভেতরে চা খেয়ে যাবেন।

আরেকদিন হবে! আমাদের এখনও খাওয়া হয়নি। নমস্কার।

নমস্কার!

সেই থেকে গরীবের ছেড়ে, বড়লোকের জামাই ডাঃ বোস অনাথ-বাঙালী-বন্ধু-সমিতির অনিয়মিত সভ্য হল।

সেই থেকে সীমার সঙ্গেও বন্ধুত্ব হল সবিতার, মায়ার সঙ্গে সীমার কন্যাদের—বড়লোকের বাগানের দেয়াল ডিঙোনো বন্ধুত্ব, গরীবের প্রতি উদার হবার আত্ম-তৃপ্তির বন্ধুত্ব।

সবিতা সীমার সঙ্গে মাঝে মাঝে সপ্তাহের বাজার করতে বেরুত। সবিতার 'ফ্রিজ' ছিল না, সে জন্য দু-একদিন পরে-পরেই তাকে মাছ মাংস কিনে আনতে হত।

সীমা বাজার সেরে হাঁপাতে হাঁপাতে তার গোল মোটা শরীর সোফায় এলিয়ে বললে, বাব্বা, এ দেশে ভদ্রলোক থাকে! বাজার কর, রান্না কর! উঃ, আপনি যে কি করে সমস্ত সামলান আমার তা ধারণার বাইরে।

অর্থাৎ আয়াবিহীনা সবিতা কি করে চালায়? সবিতা কিন্তু সরল-মুখে বলে, আমি ভাই গরীব ঘরের মেয়ে। চিরকাল খেটে অভ্যেস। তবুও তো এ দেশে কাজ করে আনন্দ আছে, কয়লা ভেঙে উনুনের নোংরামি নেই, কাপড় কেচে হয়রান হতে হয় না।

আমার তো ভাই, সীমা বললে, ছদ্ম হতাশায়, ওসব অভ্যেস কোনদিন ছিল না, এখন ভাবি থাকলে বেঁচে যেতাম।

যদিও সবিতা ভালভাবেই জানে আয়াকে সীমা খাটিয়ে মারে। বড় জোর, রাত্রের রান্না, আর বাজার করা ছাড়া সীমা নড়েও বসে না।

সীমা যতই গোঙাক না কেন, সে লোকজন নিয়ে হৈ-হৈ করতে ভালবাসত।

সবিতা একদিন দুপুর বেলা ওপরে গিয়ে দেখে সীমা মুখ কালো করে বসে আছে, কান্নায় চোখ-মুখ ফোলা। ডাঃ বোস মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে বললে, আসুন, ক্ষীণস্বরে সে বসার অনুরোধও করলে।

সবিতা বুঝল যে বড় অসময়ে এসে গেছে। পালাবার পথ খুঁজে পায় না! মুখে প্রথম যা আসল, তাই বললে, মায়াকে খুঁজতে এসেছিলাম, ও নিশ্চয় ওপরে গেছে। এখন বসব না।

পরে জানা গেল ডাঃ বোস এবার নিয়ে পাঁচবার এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষায় ফেল করেছে। ডাঃ বোস এম. বি. বহু বছরের চেষ্টায় পাশ করেছে। দুষ্টু লোকেরা বলে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকেরা নিছক বিরক্ত হয়ে ওকে পাশ করিয়ে দিয়েছিল।

লোকে ওকে নিয়ে যত ঠাট্টাই করুক, সবিতার কিন্তু ডাঃ বোসের

জন্য কষ্ট হত। একটি ভাল মানুষের ছাপ আছে ওর মুখে, ওর বিরাট শরীরে আত্ম-বিশ্বাসের কোন চিহ্ন নেই। স্ত্রীর আক্রমণ, দোষারোপের হাত থেকে রক্ষা পেতে সে এত ব্যস্ত, যে চিহ্নহীন হতে পারলেই সে খুশি।

সেদিন দেবেন্দ্র অফিস থেকে সোজা গিয়েছিল দাদার সঙ্গে দেখা করতে। ডাঃ বোস জানত না। খাওয়া দাওয়ার পর যথারীতি সে এসেছিল আসরের খবর নিতে। শূন্য ঘর দেখে সে তখনই চলে যেতে ব্যস্ত। সবিতা বলল, এক কাপ চা খেয়ে যান না!

বোসকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হল না। সে বললে, আচ্ছা, বলছেন যখন।

অর্থাৎ, সবিতা বলল নিজেকে, স্ত্রীর হাত থেকে যতক্ষণ রক্ষা পাওয়া যায়।

সবিতা চা এনে গুছিয়ে গল্প করতে বসল। এটা-ওটা কথার পর বোস বললে, বড় বিপদে পড়েছি।

কি হল?

আয়া হাঙ্গার স্ট্রাইক করে বসে আছে, তাকে দেশে পাঠাতে হবে, এদিকে—

এই মরেছে! বিপদে যে বড়ই সাঙ্ঘাতিক তাতে সবিতার দ্বিমত হল না।

হ্যাঁ, ওকে না পাঠিয়ে আর উপায় নেই। সীমা ওর দিদির মেয়েকে আনবে বলছে, পড়তেও পাবে, ওর সঙ্গীও হবে।

অর্থাৎ দাসীও হবে, সবিতা মনে মনে শুধরে নিল।

কি পড়বে?

কে? মলি? ও দেশে সিনিয়ার কেমব্রীজ পড়ছিল, এখানে এসে জি. সি. ই. দিতে পারবে, বোস ওর বিরাট মুখে হেসে বলল, আর পাশ না করুক, ছেলে তো জোটাতে পারবে। মেয়েদের যেটা আসল কাজ!

মেয়েদের সম্বন্ধে ছেলেরা কি নিঃসন্দিগ্ধ মতামতই না দেয়, ভাবল সবিতা। অথচ, সে আরো না ভেবে পারলে না, আসল কাজ সমাধা হলেও, সবিতার জীবন-প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে কি? প্রশ্নটা কি, জিজ্ঞেস করলে, সবিতাও সদুত্তর দিতে পারবে না। শুধু এটুকুই হয়তো বলতে পারবে, বিবাহই মেয়েদের জীবনের একমাত্র উত্তর নয়।

অবশ্য পরবর্তী জীবনে সে কত দেখেছে অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের ব্যর্থতাবোধ থেকে কত অদ্ভুত কুৎসিত মনোবৃত্তিরই না উদ্ভব হয়।

সবিতা মনকে বড় করতে পারল না। সে রাগ করে ভাবলে, ছেলেদের আসল কাজ কি, শ্বশুর বাড়ির টাকায় পরীক্ষা পাশ করা? সে ভাল মানুষের মতো জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার আর কতদিন আছে?

আমার? সবিতার সহানুভূতিশীল বলে এতই সুনাম যে, প্রশ্নের মধ্যে কোন খোঁটা খুঁজে পেল না ডাঃ বোস। মনের দুঃখে বললে, আন্তরিকভাবে, জানি না, সবিতাদি! পরের পয়সায় পড়তে আসা, তদুপরি পরীক্ষায় পাশ করতে না পারা যে কি অভিশাপ, সে কাকে বলব বলুন।

সবিতা লজ্জা বোধ করল, নিজের খোঁটা দেবার চেষ্টায়। সে দুঃখিত হয়ে বললে, আর কি করবেন বলুন, আপনি তো চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

বলেই ভাবল সে ভুল করেছে, চেষ্টার অ-ত্রুটি ছাড়া, আরেকটি মাত্রই ত্রুটি থাকতে পারে বোসের—বুদ্ধির অপ্রাচুর্য, যেটা কোন মানুষই স্বীকার করতে রাজী হয় না।

বোস একবার ফাঁকাচোখে সবিতার দিক তাকিয়ে বললে, আর আমি নিজের জন্য টাকা নেব না, চাকরি নিয়েছি। যেন সে নিজেকেই সান্ত্বনা দিল চাকরি নিয়ে সে আত্ম-পৌরুষের প্রতি দায়িত্বপালন করেছে।

দরজায় কে রিং করল ; সবিতা উঠে দরজা খুলে দিতেই সীমা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। ঘরে স্বামীকে একা দেখে ওর মুখ সবুজ হয়ে উঠল, সে হিংসায় পুড়ে বললে, তোমার চা খাওয়া হলে দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করতে আসবে, আর আয়াকে তুমি কালকের প্লেনেই পাঠিয়ে দাও। সকালে উঠে ওর মুখ যেন দেখতে না হয়।

বোস তার লম্বা চওড়া দেহ লুকোতে না পেরে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললে, যাচ্ছি চল, চায়ের জন্য অনেক ধন্যবাদ দিদি। দিদি কথাটার ওপর একটু জোর দিয়ে বললে।

ওরা দুজনে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলে পরে সবিতা বুঝতে পারল সীমা তাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে, এরকম ব্যবহার করল কেন? তাকে যে কেউ সন্দেহ বা হিংসা করতে পারে, তা সবিতার ধারণার বাইরে।

এর পরে সীমার বোনঝি মলি আসার পরে সে দেখেছে হিংসা কি বিশ্রী, কি জ্বালাময়ই না হতে পারে, ক্যান্সারের মতোই মানুষের মনকে গ্রাস করে পচিয়ে ফেলে। দুর্গন্ধে আশে-পাশের জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে, যন্ত্রণায় নিজেই নিপীড়িত হয়।

সীমা কখনই একথা ভুলতে পারে না একমাত্র পিতৃ-মূলধনের জোরেই তার গুণহীন স্থূলতা বিয়ের বাজারে বিকিয়ে গেছে। তাই তার নিজের ওপর যেমন বিশ্বাস নেই, অপরের প্রতি, বিশেষ করে স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস তার প্রবলতর। সীমার দৃঢ় বিশ্বাস, মুঠো একটু আলগা করলেই, চোখ একটু সরালেই, তার দীর্ঘদেহী স্বামী নীল বা কৃষ্ণ নয়নার মোহে পথভ্রষ্ট হবে!

দেবেন্দ্রর প্রেমমূলক চরিত্র সম্বন্ধে সবিতার মনে এর আগে কোন-দিন কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ গ্রামদেশের আত্ম-মগ্ন মা-বাবার ছায়ায় ঢাকা জীবনে জটিলতা সে দেখেনি বিশেষ সে নিজেই অবাক হয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ তার মনে হল

কে জানে হয়তো এজন্যই দেবেন্দ্র তার থেকে দূরে সরে থাকে। সে বললে, আচ্ছা তুমি কোনদিন কোন মেয়েকে ভালবেসেছ বা বাস?

প্রশ্নের চমৎকারিত্বে প্রথম দেবেন্দ্রর মাথায় ঢুকল না কিছুই, সে বইটা চোখ থেকে সরিয়ে বললে, আমাকে কিছু বললে কি?

না জেনে সবিতার নিস্তার নেই। অন্য সময় হলে সে বলত, তোমাকে কেন, আমার কপালকে বলছি!

দেবেন্দ্র আরেকবার শুনে বইটা নামিয়ে রেখে বললে, তোমার সরল মাথার মধ্যে এসব কথা কে ঢোকাচ্ছে শুনি?

কেউ না! আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

দেবেন্দ্র বই মুখে তুলে বললে, প্রশ্নটা যে অবান্তর এবং অর্থহীন সে তুমি ভাল করেই জান।

সবিতা চুপ করে থাকল। দেবেন্দ্র একটু হেসে সবিতার চিবুক তুলে বললে, কি তুমি জান না?

সবিতা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। সে বলল তোমার কথা জানি না, কিন্তু তোমাকে যে কোন মেয়ে সাধ করে ভালবাসতে যাবে না সে আমি হলফ করে বলতে পারি। দেবেন্দ্র হাসিতে যোগ দিয়ে বললে, তুমি বড় অপ্রিয় সত্য বলতে পার সবিতা!

নয়

মলি! মারিয়া! কমলা! কণচিতা!

বড় সুন্দর মুখশ্রী মলির। সে মাসির মতো মোটা নয়, আবার রোগাও নয়; দোহারা দেহ কিন্তু রেখায় নিখুঁত নয়। হলে হয়তো প্রলয়ই বাধতো মুখশ্রী আর দেহের সামঞ্জস্যে।

মলি মামারবাড়িতে মানুষ; মা-বাবা মারা গেছেন ছেলেবেলায়।

মামারবাড়িতে আর যাই থাক, পড়াশুনোর উৎসাহ যে ছিল না, তা মলিকে দেখলেই বোঝা যায়।

ওর বিশাল চোখে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা থাকলেও প্রলয়ের বিদ্যুৎ প্রাধান্য পায় বেশি।

সীমা ওকে কড়া চোখে রাখার চেষ্টা করে, পড়াশুনা কর, 'ডেট' কোর না, ঘরের কাজে সাহায্য কর, কিন্তু মেসোর সঙ্গে বেশি হাসি নছল্ল কোর না।

মলি সুযোগ পেলেই পালিয়ে আসত সবিতার কাছে। আসরের সকলেই ওকে পছন্দ করত। ব্যানার্জী সুযোগ পেলেই ফ্লার্ট করত বয়সের সুযোগ নিয়ে। প্রশান্ত 'ডেট' করার চেষ্টা করতে লাগল। এমন কি দেবেন্দ্র পর্যন্ত সজাগ হয়ে উঠল মলির উপস্থিতিতে।

সবিতার মলিকে ভালই লাগত ওর মিষ্টি স্বভাবে, সুন্দর মুখের হাসিতে, আরো ভাল লাগল এই দেখে যে সামান্য ফ্লার্টে আপত্তি না থাকলেও আত্মসম্মান বজায় রাখতে মলি জানে। মলি তখনও স্বপ্ননায়কের জন্য অপেক্ষা করছে, যার-তার হাতে ধরা দিতে সে রাজী নয়।

মলি পাশ করল একটি সাবজেক্টে 'ও' লেভেল (ordinary level) জি. সি. ই.-তে. আবার পড়তে হবে। ইতিমধ্যে মলি প্রেমে পড়ে গেল এক দক্ষিণভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার-এর সঙ্গে।

সীমা এক সন্ধ্যায় সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, দুই মেয়েকে মলির জিম্মায় রেখে।

মলি সেই সকালে অনবরতই সবিতার আশে পাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। নোখে ফাইল ঘষতে ঘষতে মলি বলে উঠল, আমার যদি বয়ফ্রেণ্ড হয়, আপনি রাগ করবেন?

রাগ করব? কেন? সবিতা ঘুরে দাঁড়িয়ে মলির মুখ দেখে হেসে ফেলল, প্রেমে পড়েছ বুঝি?

হুঁ। মলি মুখ না তুলেই বলল। সুন্দর লজ্জা ওর চোখের অলস পাতায় নেমে এল।

ভাগ্যবানটি কে?

মলি উজ্জ্বল মুখে বলল, মাসি তো আজ থাকবে না, আমি ওকে বিকেলে আসতে বলেছি, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, কিন্তু আপনি মাসিকে কিছু বলবেন না, বলুন।

আমি শুনিনি তুমি কি বলেছ।

হ্যাঁ, আপনি শুনেছেন এবং ওর সঙ্গে আলাপ করছেন!

মলি সবিতাকে আর কোন কথার সুযোগ না দিয়েই নিজের ফ্ল্যাটে চলে গেল।

মায়াকে খেলতে পাঠিয়ে সবিতা বলল দেবেন্দ্রকে। দেবেন্দ্র বলল, বেশ তো, নিয়ে এস না এখানে, আলাপ করা যাবে।

সীমাকে বলা উচিত নয় কি আমাদের?

কেন? সে মলি বুঝবে। আর সীমাদেবী যদি মিথ্যানীতির গণ্ডি দিয়ে না বাঁধতো মলিকে, ওর প্রেম অনেক বেশি সুন্দর স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হতে পারত, লুকোচুরি আর মিথ্যার অসম্মানের মধ্যে যেতে হত না ওদের।

সীমা চলে যাবার ঘণ্টা খানেক পরেই মলি উপরে উঠে এল। বলল, চলুন সবিতাদি।

আমাদের এখানে নিয়ে এস না।

না, না। আপনাদের বাড়িতে অনেক লোক, কেউ-না-কেউ ঠিক মাসিকে লাগিয়ে দেবে। আমার জীবন ওষ্ঠাগত হবে।

একদিন-না-একদিন জানতে তো পারবেই। তুমি এক কাজ কর, ওকে রান্নাঘরে নিয়ে এস, চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, বলব আমার বন্ধু! That is, if you don't mind!

একটুও না। মলি হাসিতে যোগ দিয়ে বললে।

মলি ওর বন্ধুকে নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিল ইংরেজীতে, কৃষ্ণস্বামী, সবিতাদি।

হাউ ডু উ ডু! কৃষ্ণস্বামী হাত বাড়িয়ে নিখুঁত বিলিতি কায়দায় বললে।

ওকে দেখে সবিতার ভালই লাগল, কিন্তু মলির চেয়ে বয়সে অনেক বড়, প্রায় বত্রিশ কি তেত্রিশ হবে।

দেখে মনে হয় গাম্ভীর্য স্বভাবোচিত, কিন্তু রসিক। বললে ইংরেজীতে, আপনার গল্প মলি খুব করে। একটু হেসে বললে, আপনার আমাকে অনুমোদনের ওপর, সম্ভবত, মলির মনের শান্তি নির্ভর করছে।

মলি তার সুন্দর চুলে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, বাঃ, কক্ষনো নয়।

না সত্যি, সবিতা হেসে বললে, আমি মলির পছন্দের বিশেষ অপ্রশংসা করতে পারছি না!

মলির তরুণ স্নিগ্ধ মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কি করছেন এদেশে?

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং-এ ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছি।

ও পড়াশুনোয় খুব ভাল, জান সবিতাদি! মলির বিশাল কালো চোখের দীর্ঘ পক্ষ্মছায়ায় একটু দুঃখ ঘনিয়ে এল: আমার মতো নয়, good for nothing!

Now! Now! কৃষ্ণস্বামী বলে উঠল, no need to feel sorry for yourself! তুমি মন দিলেই ভাল করে পাশ করতে পারবে, সে তুমি ভাল করেই জান।

সবিতা সায় দিয়ে. বলল, নিশ্চয় পারবে। তোমরা বসে চা খাও গল্প কর, আমি দেখে আসি মায়া ঘুমোল কিনা। সবিতা ভাবল ওদের একটু সুযোগ দেওয়া উচিত—একটু নির্জন কথার, একটু নিভৃত স্পর্শের।

এই মলির সঙ্গেই আবার পাঁচ বছর পরে দেখা হয়েছিল সবিতার

মলির বাঙালী ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার স্বামী একবছরের ট্রেনিং নিতে এসেছিল বার্মিংহামে। গোবেচারা ভদ্র বাঙালী যেরকম দেখতে হয়। মলির চেয়ে বয়সে সেও অনেক বড়। মলির বর নির্বাচন দেশী মতেই হয়েছে। ওকে সুখীই মনে হল, হাসিখুশি, সুন্দর, তবে মেদবাহুল্যে সে সৌন্দর্য আর প্রলয় বাধায় না ; সেই চোখে আর স্বপ্ন গাঢ় হয়ে ওঠে না আগের মতো। মলি বোধহয় জীবনের সঙ্গে আপোষ করতে পেরেছে, স্বপ্ন-নায়ককে জীবনে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে

এই আশা ছাড়তে অনেকেই পারে না, যেমন পারেনি—কমলা।

কোয়েকার বন্ধু মিসেস জোনসের মারফতে, কমলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সবিতার। শেষকালে নিছক বিরক্ত হয়েই সবিতা কমলার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে।

ওর সঙ্গে যখন আলাপ হয় কমলার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ। একদা রূপের স্নিগ্ধ প্রদীপের আলো এখনও কমলার ক্ষীণ কটিতে, উজ্জ্বল বর্ণে ছড়িয়ে আছে। ওর কালো চোখে স্বপ্ন-জড়িমা, পাতলা লিপস্টিক-বিহীন, গোলাপী ঠোঁটে অপার্থিব হাসি।

সবিতা, গীতি আর কমলাতে বেশ সাহিত্যের আসর জমে উঠত একেকদিন। সেদিন কথা হচ্ছিল, টলস্টয়ের 'আনা কারেনীনা' নিয়ে।

কমলা তার নরম আকাশি-নীল সিল্কের শাড়ির আঁচল হাতের মুঠোয় জড়িয়ে বললে, আমি আনা হলে প্রথমত ওরকম স্বামীকে বিয়েই করতাম না, আর করলেও বহু আগে গৃহত্যাগ করতাম। সূক্ষ্ম অনুভূতিহীন মূর্খতার মধ্যে বেঁচে থাকার ট্রাজেডী দুর্বহ।

স্বভাব সুলভ বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে সবিতা বললে, সূক্ষ্ম অনুভূতিভরা রোমান্টিক জীবনও শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারল না, আনা। তাকে তো মরতেই হল।

তার কারণ পুরুষের জাতগত স্বার্থপরতা, ভ্রনস্কি যদি আনার আকুতি বুঝতে পারত—

আমার মনে হয়, গীতি বললে, সিগারেট ধরিয়ে, চশমা খুলে রেখে, ভ্রনস্কির স্বার্থপরতা বড় কথা নয়। প্রেম ছিল ওদের একমাত্র সম্বল। প্রেমের প্রথম জোয়ারে তুচ্ছ হতে পারে সমাজ, এমনকি সন্তানের সুখ, ভবিষ্যৎ, উচ্চাশা, বন্ধুবান্ধব! কিন্তু আমরা যে-যতই বলি না কেন, মানুষ হচ্ছে সামাজিক জীব, দুজনে মুখোমুখি বসে থাকা দুদিন চলে, তারপরে প্রেমের শিকড় যদি মাটিতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, শাখা প্রশাখায় নিমন্ত্রণ না রাখতে পারে, তবে ট্রাজেডী তো অবশ্যম্ভাবী!

সবিতা বললে, আজকের যুগে নিশ্চয় আনা ভ্রনস্কিকে নিয়ে সুখী হতে পারত।

এদেশে, কমলা বললে, ভারতবর্ষে নয়।

হ্যাঁ, সত্যি। সবিতা সায় দেয়।

আচ্ছা কমলা তুমি বিয়ে করনি কেন?

ভ্রনস্কির অপেক্ষায় বসে আছি। কমলা তার অপার্থিব হাসি দিয়ে বললে।

অর্থাৎ স্বার্থপর পুরুষের জন্য? গীতি টিপ্পনী কাটে!

না, আমার ভ্রনস্কি স্বার্থপর হবে না, কমলা স্বপ্ন-চোখে বললে, তার যে পেশাই হোক, তার মন হবে কবির মতো, হৃদয় হবে মহৎ—

কমলা কবে তুমি বুঝবে,—সবিতা হতাশ হয়ে বললে, নিখুঁত পুরুষ জীবনে খুঁজে পাওয়া যায় না। one has to accept the second best!

আমি পারব না, কমলা মাথা নেড়ে বললে, আমি আপোষ করব না কোন দ্বিতীয় পুরুষের সঙ্গে।

গীতি, তুমি পারবে? কমলা জিজ্ঞাসা করে।

গীতি হেসে বসে, অনবরতই প্রেমে পড়ছি, আর উঠছি।

কমলাও হেসে ফেলে, সে তো casual-affair—a re-juvinating pre-occupation, কিন্তু প্রেম—

গীতি প্রশ্ন এড়িয়ে মনস্তুষ্টির থিওরী টেনে আনল: হেসে বললে—

হালকা করার জন্য আপোষ করতে না চাওয়া অনেক ক্ষেত্রে কাপুরুষতা হতে পারে, জীবনের দায়িত্বকে স্বীকার করতে না পারার অক্ষমতা হয় তো—

কমলা কিন্তু আহত হল, সে বললে আস্তে আস্তে, হয়তো তাই সত্য, গীতি! পৃথিবীতে কিছু মানুষ পরাজিত হয়ে জন্মায়, স্বপ্ন তাদের কাছে জীবনের চেয়ে সত্য, ব্যর্থ স্বপ্ন বুকে নিয়েই তারা মরে।

আমি সেভাবে কিছু বলিনি। গীতি তাড়াতাড়ি বললে।

বানানো দুঃখের কান্না সবিতা বোঝে না, যেন জীবনে সত্য দুঃখের কোন অভাব আছে। সে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললে, চল এবার ফেরা যাক গীতি, অনেক রাত হয়েছে।

সবিতা লক্ষ্য করে দেখেছে কমলা যতক্ষণ অ-ব্যক্তিক কথা বলে, ওর তাকে ভালই লাগে, কিন্তু যখনই সে স্বপ্নজগতের শহীদ হয়ে মায়া-কান্নার বিলাস আরম্ভ করে, সবিতার হাই ওঠে।

কমলা গুজরাট থেকে আসছে। বাবা ব্যবসায়ী ছিল বোম্বেতে। কমলা অন্য বোনদের মতো নিজেকে কখনও মেরিন ড্রাইভের ভাসা ভাসা রোমান্সে হারিয়ে ফেলেনি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলার সমুদ্র আর আকাশের নিবিড় চুম্বন ওকে ইশারায় ডেকেছে, দূরে, কোথায়, কিভাবে সে মহা-মিলন তার জন্য অপেক্ষা করছে কমলাকে যেন যেতেই হবে তার পরিদর্শনে!

কমলা প্রথমে গেল আমেরিকায়, গৃহ অন্তর্সজ্জা শিখতে। শেখা হল, ফিরে এল দেশে। ভাল লাগল না বোম্বে, ভাল লাগল না আবদ্ধ আবহাওয়ার মেকী পাশ্চাত্যের জৌলুস। এরপরে ইউরোপের প্রতি দেশে সে কিছু শেখার নামে ঘুরেছে, সর্বোপরি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে খুঁজেছে তার পুরুষকে। ফিরে এসেছে লণ্ডনে। এখন আবার আমেরিকা যাবার জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, যেন সেখানেই আছে তার শেষ যৌবনের পৃথিবী সন্ধানী পুরস্কার!

ইতিমধ্যে বাবা মারা গেছেন। ভাইরা টাকা পাঠাতে নারাজ।

কমলা কখনো চাকরি পেয়েছে কখনো পায়নি। ক্ষুধার্ত এ্যানিমিক অহঙ্কারী কমলা বাসন মাজার চাকরি নিতে রাজী হয়নি। লণ্ডনের রাস্তায় হেঁটে বেড়িয়েছে চাকরির খোঁজে, ক্ষিধে পেলে বহু কষ্টে তিন পেনীর ক্যাডবারীর চকলেট কিনে খেয়েছে স্লট-মেসিন থেকে। তবু সে দেশে ফিরে যাবে না পরাজয় মেনে। আমেরিকান ভিসা তার চাই-ই!

গীতি বলত কমলা স্পিৎজোদেনিক। তার নতুন শেখা মনস্তত্ত্বের জ্ঞান নিয়ে।

কমলার কথা মনে হলেই কেন জানি মনে পড়ে সবিতার সেই পর্তুগীজ মেয়েটির কথা: মারিয়া। অথচ মাত্র দুদিনই ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যদিও হস্টেলের স্প্যানীশ মেড কণচিতার কাছে সে মারিয়ার বহু গল্প শুনেছে।

মারিয়া আর কণচিতা একই ইংরেজী ভাষা শিক্ষার স্কুলে যেত। তফাৎ ছিল মারিয়াকে কাজ করে পড়তে হত না, সে কেনসিংটনে সার্ভিস ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত। বড়লোকের মেয়ে, টাকার কোন অভাব ছিল না।

কণচিতা মারিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সবিতাকে, এক ইটালীয়ান কফি হাউসে।

মারিয়ার কালো চুল, কালো চোখ। কিন্তু ফরশা, ইংরেজ মেয়েদের মতো না হলেও, ফরশা।

কিছুক্ষণ আলাপ করার পরেই সবিতা টের পেল, মারিয়া তার পাশে বসে থাকলেও কফি হাউসে সে নেই। মারিয়াকে ভাল লেগেছিল সবিতার। সে ফিরে বলেছিল, কি ভাবছ মারিয়া?

মারিয়ার কালো চোখ উদাসীন, চঞ্চল, চোখের কোলে ক্লান্তি না দুশ্চিন্তার কালো ছায়া? সে একটু হেসে বললে, আমি কি ভাবি, কি ভাবব যদি নিজেই জানতাম! সে হঠাৎ ঝুঁকে বললে, সাবিটা,

চল না আমার সঙ্গে! আমি এক ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে সুইৎজারল্যাণ্ড যাচ্ছি স্কিয়িং করতে চার দিনের জন্য, be my guest!

সবিতা হেসে বলল, ও বাব্বা, আমি তোমাদের দুজনের মাঝে কি ভগ্নদূত হয়ে থাকব?

না, ছেলেটাকে আমার মোটেই ভাল লাগে না। বোকার মতো হ্যাঁ বলে ফেলে বিপদে পড়েছি। বেশির ভাগ ছেলেই এত বোকা হয় না! দুদিন মেশার পরেই, I get so bored!

সবিতা বিধবা পিসিমার মতো উপদেশ দিল, লিসবনে ফিরে যাও। বিয়ে করে ঘর সংসার কর।

মারিয়া হতাশভাবে হেসে সিগারেট নিবিয়ে, হাত উল্টে বললে, তুমি যদি জানতে আমাদের দেশ কিরকম! সেখানে মেয়েদের কোন স্থান নেই, সুযোগ নেই, নিজে স্বাধীনভাবে কিছু করতে গেছ কি, সবাই হা-হা করে উঠবে। প্রায় স্পেনের মতোই কিংবা তার চেয়েও খারাপ।

কণচিতা স্পেনের নিন্দা সহ্য করতে পারে না, সে কথা ঘোরাবার জন্য বললে, কেন, তোমার তো টাকার অভাব নেই। কণচিতাকে ঝি-গিরি করে লণ্ডনে ভাষা শিখতে হয়, সেজন্যে সে অর্থ সম্বন্ধে সচেতন।

মারিয়া আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে, মুখের সামনে থেকে ধোঁয়া হাত দিয়ে সরিয়ে বললে, বাবার টাকা আছে বলেই তো আমার আরো মুশকিল। বাবা চান, তাঁর পছন্দ করা শূন্য মস্তিষ্ক ধনী-সন্তানকে প্রেম করে বিয়ে করি। বিয়ে করার পর কি হবে? স্বামী মিসট্রেস রাখবে, মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়াবে। ডিভোর্স করার উপায় নেই, কারণ আমি ক্যাথলিক। আমাকে পার্টি দিতে হবে, যেতে হবে, ছেলে মেয়ে বছরে বছরে গভর্নেসের হাতে তুলে দিতে হবে, আর বাইরের লোকের কাছে মিষ্টি হাসি দিয়ে জানাতে হবে, আমি কি, সুখী, স্বামীর প্রেমে, ধনে। No, thank you! ধন্যবাদ, ও জীবন আমার জন্য নয়।

কি জীবন চাও তুমি মারিয়া ? সবিতা বলল, একটু ঔৎসুক্য নিয়ে

জানি না। লিসবন ছেড়েছিলাম খুঁজে নেবার জন্যে। ভেবেছিলাম খুঁজে পাব, কিন্তু আরো সব ওলট পালট হয়ে গেছে। আজ জুরিক, কাল প্যারিস, পরশু কোপেনহেগেন, আমি বড় ক্লান্ত সাবিটা !

মারিয়া নরম গদীতে হেলান দিয়ে উদাসস্বরে বললে, একেক সময় মনে হয়, জীবনের কোন অর্থ নেই, বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না, মুহূর্তের সুখভোগ সব কিছুর শূন্যতাকে আরো কুৎসিৎ, নগ্ন করে দেয়। মনে হয়, সময় নষ্ট। অথচ সময় কিসের জন্য, কি দিয়ে কিভাবে ভরে তোলা যায়, কেউ আমাকে বলতে পারে না।

মারিয়া থামল। অর্ধ পোড়া সিগারেট নিবিয়ে নতুন একটি ধরিয়ে সবিতার দিকে ঝুঁকে সে বললে, জান, সাবিটা, সারা জীবন কেবল পেয়ে এসেছি, চাওয়ার আগেই পেয়েছি সবচেয়ে ভাল দোকানের সবচেয়ে ভাল জিনিস !

কণচিতা ঈষৎ ক্লেশের হাসি হেসে বললে, আমরা পাই না বলে দুঃখ করি, তুমি পেয়ে দুঃখ করছ।

মারিয়া হতাশ হয়ে বললে, আমি দিতে জানি না। দেওয়ার পরে যে পাওয়া কি তা আমি জানি না।

কণচিতা আবার বললে, কেন মারিয়া, একথা বলছ, তুমি তো সব সময় আমাদের কত কিছু দাও।

না, না সে দেওয়া নয়, মারিয়া বিরক্ত হয়ে বললে, সিনেমার টিকিট ? কফির বিল ? ফরাসী ব্রা ? না, না কণচিতা, আমি সে দেওয়ার কথা বলছি না। মারিয়া ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেল।

মারিয়ার সমস্যা ছিল অর্থপ্রাচুর্য। কণচিতা হতাশাবাদের সূক্ষ্ম দর্শন বোঝে না। সে একদিন এসে সবিতাকে ফিস ফিস করে বললে, জান, মারিয়া, স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল।

সে কি, কেন ? সবিতা বোকার মতো বলে উঠল।

কে জানে। কণচিতা ঠোঁট উল্টে বললে, সপ্তাহে সপ্তাহে বয়ফ্রেণ্ড বদলে সপ্তাহ-শেষ কাটালে এই-ই হয়। ওর বাবা এসেছে ওকে নিয়ে যেতে।

ওঃ। সবিতা চুপ করে গেছে। কিন্তু ওর মনে হয়েছে বলে, বয়ফ্রেণ্ড বদলানো তার রোগের কারণ নয়, রোগের লক্ষণ বলে লাভ নেই। কণচিতার ক্ষুদ্র, অর্ধ শিক্ষিত ক্যাথলিক মন সে কথা বুঝবে না।

লিসবন থেকে মারিয়ার চিঠি পেয়ে সবিতা একটু অবাক হয়েছিল, মারিয়াও সে কথা লিখেছে, তুমি নিশ্চয় অবাক হবে একদিনের আলাপে আমার চিঠির অন্তরঙ্গতা দেখে ঃ

শেষ পর্যন্ত আমাকে লিসবনই ফিরে আসতে হল। অতএব গতানুগতিক জীবনের অভিশাপ বয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কি উপায় আছে বল? কে জানে, আমিও হয়তো অন্যান্য পর্তুগীজ মেয়েদের মতোই ছুদিন পরে ভুলে যাব, অন্য জীবন চেয়েছিলাম, অন্য কিছু— স্বাধীন, পরিচ্ছন্ন, অর্থময় জীবন!

ঠিকানা দিলাম না, কারণ পর্তুগালে তোমার আসা বারণ। (কি মূর্খ রাজনীতি!) আর আমিও তোমাকে আর কোন দিন বিরক্ত করব না। শুধু মনে রেখ, কফি হাউসে এক নিরাশ সন্ধ্যায় তোমাকে আমার বন্ধু বলে মনে হয়েছিল। বিদায়।

· ·

হোস্টেলে থাকাকালে এক পর্যায়ে কণচিতার সঙ্গে সবিতার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

কণচিতা, স্প্যানিশ মেয়ে বলতে যা ধারণা ছিল সবিতার, সেরকম নয়, খুব ফরশা, একটু রক্তহীন মনে হয় ঠোঁটে লিপস্টিক না দিলে, উজ্জ্বল লালাভ রং-এর চুল, নীল চোখ, হয়তো একটু বেশি লম্বা, কিন্তু মসৃণ সুডৌল দীর্ঘ নগ্ন পা ভালই লাগত দেখতে। এক কথায় কণচিতাকে সুন্দরী বলা চলে। স্প্যানিশ কৌমার্যের পবিত্র সারল্য অনেক বেশি আকর্ষণীয় হতে পারত যদি উচ্চ সমাজের নকলকরা

ছাপ ওর দেহের চলাফেরায়, মুখের ভাবে ভঙ্গীতে অসরল কাঠিন্য এনে না দিত।

যখন সবিতার সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ হয়, তখনও এ কাঠিন্য মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ত, স্বভাবের আপন রূপ প্রকাশ করে।

মধ্যবয়স্কা টোনীর ব্রেকফাস্ট টেবিলে একদিন আফশোশ হচ্ছিল। কণচিতা সেদিন কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে প্লেটে পরিজ তুলে দিচ্ছে। টোনী ওর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললে, মেয়েটা ওর জীবন নষ্ট করছে মিথ্যা আশা নিয়ে।

হয়তো ডাক্তার ফিরে আসবে। ক্যাথি বলল আশা-ভরা কণ্ঠে। ওর স্বামী ওকে ত্যাগ করেছে, অল্প বয়সের মেয়ের প্রেমে পড়ে। ও এখনও আশা করে স্বামীর মোহ ভেঙে গেলে ফিরে আসবে ওর কাছে। সেই দুরাশায় ডিভোর্স দেয়নি স্বামীকে।

ফিরেই যদি আসবে, স্পিনস্টার মেরী বলল শুষ্কগলায়, তবে বিয়ে করে নিয়ে গেল না কেন?

সবিতা তখন নতুন। কৌতূহল প্রকাশ করা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। সে চুপ করে শুনল আর কণচিতাকে দেখল।

সবিতার শরীর খারাপ করেছিল, সে অফিসে যায়নি। বেসমেণ্টে কাপড়কাচার ঘরে কাপড় শুকোতে গিয়ে দেখতে পেল কণচিতা ওর জামা ইস্তিরি করছে।

সবিতাই আলাপ করলে, আজ তোমার ক্লাশ নেই বুঝি?

না। ইস্টারের ছুটি। তুমি অফিসে যাওনি যে?

শরীরটা ভাল লাগল না, গেলাম না। সবিতা আলাপ করার জন্য জিজ্ঞাসা করল, কতদিন হয় এ দেশে আছ?

প্রায় দেড় বছর হল। প্রথম এডিনবারাতে ছিলাম। এখানে প্রায় এক বছর হয়ে গেল।

ভাল লাগে তোমার এদেশে?

একটুও না। কণচিতা উত্তেজিত হয়ে বলল, কোনরকমে পাশ করতে পারলে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে একেক সময়।

কেন তোমার বয়ফ্রেণ্ড নেই? সবিতা এমনভাবে জিজ্ঞাসা করল যেন তরুণ-তরুণীর সুখ, দুঃখ, আশা, সমস্যার একমাত্র অব্যর্থ উত্তর হচ্ছে—বয়ফ্রেণ্ড অথবা গার্লফ্রেণ্ড থাকা।

পাতলা কিন্তু সরস ঠোঁটে লজ্জা-খুশি-গর্বের হাসি হেসে সে বললে, ছিল—আছে; কিন্তু পাকিস্তানে আছে।

How interesting! কলেজে-পড়া ইংরেজ-মেয়েদের মতো সবিতা বলে উঠল, তোমার পাকিস্তানী বয়ফ্রেণ্ড?

হ্যাঁ, ডাক্তার। এডিনবারাতে আলাপ হয়েছিল। তোমার কাজ হলে আমার ঘরে চল না, ফটো দেখাব।

বেশ। প্রেমের গল্প শুনতে কোন্ মেয়ে কবে নারাজ হয়েছে? সবিতা বলল, তোমার ইস্তিরি করা শেষ হয়েছে?

হ্যাঁ। চল।

বেসমেন্টের এক কোণায় বাগানের মুখোমুখী কণচিতার ছোট ঘর। ফিটফাট বিছানার পাশে ছোট টেবিলের ওপর ছোট্ট রেডিও দু-একটা ছোট কাঠের পুতুল, কুকুর সাজানো। দেয়ালে স্পেনের ক্যালেণ্ডার থেকে ছবি কেটে লাগানো, পিকাসোর গুর্নিকা কোন ম্যাগাজীন থেকে কেটে দেয়ালে লাগানো।

সবিতা ঘরে ঢুকে বলল, বাঃ বেশ তো তোমার ঘর।

কণচিতা খুশি হয়ে বলল, পিকাসোর নাম শুনেছ? স্প্যানিশ আসলে, বিখ্যাত আর্টিস্ট।

শুনেছি। সবিতা একটু হেসে বলল।

কণচিতা বলল, চেয়ার এগিয়ে দিয়ে, বস।

সবিতা বলল, তোমার ইংরেজদের ভাল লাগে না বুঝি?

না। কণচিতা রাগ করে গাল ফুলিয়ে মুখ ভঙ্গী করে বললে

আমাদের দেশের লোকেরা এদের মতো গুম্ করে বসে থাকে না।

সবিতা হো হো করে হেসে উঠল। ওর মুখভঙ্গী দেখে, বলল, একবার আলাপ হয়ে গেলে কিন্তু এরা ভাল বন্ধু হয়।

একবার! কণচিতা ওর সূক্ষ্ম ভুরু তুলে বললে, এদের মনের বরফ ভাঙাতে সারা জীবনের ধৈর্য দরকার। আমার নেই।

এখানে তো তিন চারজন জার্মান মেয়ে কাজ করে তোমার সঙ্গে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নেই?

ওদের ভাল লাগে না আমার। রোজ ভারতীয় ছেলে-বন্ধু পাল্টাচ্ছে! তাদের সঙ্গে কি করে, কি না করে তার কোন ঠিক নেই। কণচিতা পিউরিটনিক ঈর্ষ্যায় বললে।

অর্থাৎ কণচিতা কড়া ক্যাথলিক, ছেলে-বন্ধু হলেই তার সঙ্গে বিছানায় যাওয়া সে অনুমোদন করে না। সবিতার ধারণা ছিল, কন্টিনেন্টাল মেয়েরা দেশ ছাড়লে ধর্মের নীতির বাঁধনকেও দেশে রেখে আসে।

সবিতা বললে, কই তোমার বন্ধুর ছবি দেখাও।

কণচিতা বের করল বন্ধুর ছবি, আলমারির ভেতর থেকে ছোট্ট কাশ্মিরী বাক্সে রাখা বন্ধুর ছবি।

সবিতা হাতে নিয়ে বলল, বাঃ বেশ তো দেখতে তোমার বন্ধু!

হুঁ। এখন করাচীর এক হাসপাতালে কাজ করছে।

কবে গেছে?

কালকে ছ-মাস হবে। কণচিতা চোখ নড়িয়ে বললে। জার্মান মেয়েরা বলে, আমি কেন অন্য ছেলেদের সঙ্গে বেরোই না। ওরা বোঝে না ডাক্তার আমাকে বিশ্বাস করে, আমি তাকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসতে পারব না। ও বলেছে ফিরে আসবে আমার কাছে।

কবে?

বছরখানেকের মধ্যেই। দেখ ঠিক ফিরে আসবে। আমাকে

নিয়মিত চিঠি দেয়। কণচিতা নিজেকে বিশ্বাস করাবার জন্যেই যেন জোর দিয়ে বললে।

তারপর তিন বছর চলে গেছে। ডাক্তার ফিরে আসেনি। ব্যর্থ অপেক্ষার হতাশায় কঠিন-থেকে-কঠিনতর হয়ে উঠেছে কণচিতার সুন্দর মুখ, স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে কপালের ভাঁজ। এখন সেই মুখ একবার দেখেই ভাবতে হয়, ওকে আর সুন্দর দেখায় না কেন?

সবিতা মাঝে মাঝে ওর ঘরে যেত, নয় কণচিতা সবিতার ঘরে এসে গল্প করত। স্পেনের, পাকিস্তানের গল্প, ওর বন্ধুর, আশা-নিরাশার গল্প।

স্পেনের কোনরকম নিন্দা ওর মুখে সবিতা শোনেনি।

কণচিতা প্রথম প্রথম নেচেও উঠত, রেডিও সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে, বলে উঠত, স্পেনে আমরা শুধু নাচতাম। গানে, আনন্দে, মদিরার রক্তিমাভায় ভরা স্পেন। ইংরেজরা কি আনন্দ করতে জানে?

কণচিতার সঙ্গে আলাপ হবার পর সবিতা স্পেন সম্বন্ধে বই পড়েছে —দারিদ্র্যের কথা, ফ্রাঙ্কো আর ক্যাথলিক চার্চের টুঁটি-টেপা রাজত্বের কথা। ভারতবর্ষের মতোই কিংবা তার চেয়েও বেশি স্পেনে ঘুষ আর দুর্নীতির ব্যাপক প্রচার। এক আমেরিকান লেখকের বই পড়ে সবিতা না হেসে পারেনি। সে আফশোশ করে লিখছে, স্প্যানিশ মেয়েদের necking বা petting-এ কোন আপত্তি নেই, এমন কি নগ্ন অবস্থায় তারা শয্যায় যেতেও রাজী; কিন্তু শেষ মুহূর্তে কৌমার্য ভাঙতে তাদের মহা আপত্তি। লেখক যেন শেষ পর্যন্ত রাগ করেই মন্তব্য করেছে, এই জন্য স্প্যানিশ ছেলেরা পতিতা মেয়েদের কাছে না যেয়ে পারে না। কারণ তিরিশ-বত্রিশ বছরের আগে তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় না— এবং সে জন্য বিয়ে করা তাদের পক্ষে আর্থিক দিক থেকে অসম্ভব। ফল হচ্ছে ব্যর্থতা, তারুণ্যের অপচয়। কিন্তু ইঙ্গিতেও এসব কথা

তুললে কণচিতার মুখ রাগে অপমানে লাল হয়ে গেছে। সবিতা আর কিছু বলে না।

কণচিতা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তার বন্ধুর শিখিয়ে যাওয়া পাকিস্তানের কথা, খুব সুন্দর দেশ পাকিস্তান, না?

শুনেছি তো সুন্দর। তবে ভারতবর্ষের মতোই গরীব দেশ।

কণচিতা তার ছেলে বন্ধুর দেশের গরীবানা হদিশ করতে পারে না। স্পেনও গরীব দেশ। পাকিস্তানও কি সে রকম?

ডাক্তার বড়লোকের ছেলে, ওর ভাইঝি এসেছিল ইউরোপে বেড়াতে। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। খুব সুন্দর দেখতে। আমাকে বোধহয় একটু হিংসে করত।

কেন?

ওর চাচা সব বিষয়ে আমার ওপর নির্ভর করে, আমার কথা শুনে চলে তাই বোধ হয়।

তোমাকে খুব ভালবাসত, না?

হুঁ। একবার লণ্ডনে, সন্ধ্যা বেলায় বসে আছি, ও এসে আমাকে সিনেমায় নিয়ে যাবে। ও এল না। সেদিন খুব রাগ হল। পরের দিন ভোরবেলা ছুটতে ছুটতে গেলাম ওর ঘরে, কি জানি কি হয়েছে।

ঘরে ঢুকে দেখি ভীষণ জ্বরে বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। ডাক্তার ডেকে আনলাম। বললে, এক্ষুনি হাসপাতালে সরাতে হবে। আমি প্রতিদিন বিকেল বেলায় ওকে দেখতে যেতাম, ক্লাস না করে, মুখপুড়ী ওয়ার্ডেন থেকে ছুটি নিয়ে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এল ঘরে। আমি ছুটে ছুটে গিয়ে রান্না করে খাইয়ে আসতাম।

ও একদিন আমার হাত ধরে বলেছিল, তুমি যা করলে, কোন পরমাত্মীয়ও এমন করে না। কিন্তু কি বলছি, তুমিই তো আমার পরমাত্মীয়!

কণচিতার চোখ ছলছল করে উঠল বলতে বলতে।

সবিতা একটু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে বললে, তোমার বন্ধু সত্য

কথাই বলেছিল। কিন্তু একবার দেশে ফিরে গেলে, সমাজ, আত্মীয় স্বজনের হাজার দাবীতে ইচ্ছে থাকলেও মানুষের মন বদলে যেতে পারে, বদলেও যায়।

কণচিতা তীব্রস্বরে বলে উঠল, কিন্তু ও আমাকে কথা দিয়েছে! আমাকে কত ছেলে ডাকে, আমি তো যাই না। কই, আমার মন তো বদলায়নি!

সবিতা মনে মনে ওকে সংশোধন করে দিল, ডাকত আগে। এখন আর ডাকে না। কথা ঘোরাবার জন্য বললে, তুমি ইংরেজী শিখে কি করবে?

এ্যয়ার-হোস্টেস হব।

সবিতা আবার নিজের মনে মন্তব্য না করে পারল না, তোমার যা বদ-মেজাজ তাতে কি এয়ার হোস্টেস হওয়া চলবে?

এটা পাশ করলে, ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসী শিখব। কত দেশ বিদেশ দেখতে পাব। পাকিস্তানেও যাব, চাই কি, কণচিতা হেসে বলল, পাকিস্তানের শত্রুদেশ ভারতবর্ষেও ঢুঁ মেরে আসতে পারি!

ভালই তো। দেখতে পাবে, শত্রুদেশের লোকেরা খুব ভিন্ন নয়।

যতই দিন যেতে লাগল, কণচিতা রুক্ষ অভদ্র ব্যবহার করতে লাগল হোস্টেলবাসীদের প্রতি। ওর ধারণা ও মেডের কাজ করে বলেই লোকে ওকে হেলা করে। মোটামুটি শিক্ষিত ইংরেজদের আর যাই দোষ থাক, বাইরের ভদ্রতায় ওরা পালিশ-করা জুতোর মতো চকচক্ করে। সুতরাং এটা বিশ্বাস করা যায় না, হোস্টেলে কেউ ওর সঙ্গে প্রকাশ্যে খারাপ ব্যবহার করেছে।

কণচিতা প্রায়ই সবিতার কাছে এসে গাঁইগুঁই করত, আমার বাবাও এদের মতো সিভিল-সার্ভেন্ট। ইংরেজী শেখার জন্য আমি ঝি-গিরি করছি। আমার বয়ফ্রেণ্ড ডাক্তার, এদের মতো অফিসে যাওয়া কেরানী নয়। কি ভাবে আমাকে এরা? হ্যাঁ?

সবিতার প্রথম প্রথম হাসিই পেত ছাব্বিশ বছরের মেয়ের ছেলে-মানুষী দেখে। কিন্তু শেষের দিকে ও বিরক্ত হয়ে উঠল, এ যেন আকাশে থুথু ছিটোনো!

কণচিতা আর হোস্টেলের জার্মান মেডদের দেখে, সবিতার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, পেশার প্রভাব মানুষ সহজে এড়াতে পারে না। ভারতীয় ছেলেরা যখন নিজেদের মনে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কন্টিনেন্টাল মেয়েরা তো ভদ্র ঘরেরই, শুধু ইংরেজী শেখার জন্যই 'মেড' হয়েছে। সেজন্য এদের বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে মেড-মনোবৃত্তির বিরুদ্ধ-ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। স্বামীকে স্কার্টের তলায় রেখে, হম্বি-তম্বি করাকেই মনে করে গৃহিণীর উচিত কর্তব্য।

কণচিতাকে সবিতার কোন দিন ছোট মনে হয়নি, ওর বন্ধুত্ব সে স্নেহভরেই গ্রহণ করেছিল। সবিতার ডিগ্রি না থাকলেও, জ্ঞানের পরিধি অনেক বেশি প্রসারিত। সবিতা সে জন্য তার সঙ্গে সাহিত্য, দর্শন, সমাজ-ব্যবস্থার, দেশ-বিদেশের আলোচনা করতে পারত না, তাই বলে কণচিতাকে তো সে কোনদিন হেয় মনে করেনি।

সবিতা খুবই আহত হল, যখন তার প্রশ্নের উত্তরে কণচিতা মুখ বেঁকিয়ে খবরের কাগজ মুখে তুলে নিল। সেই থেকে কণচিতা সবিতাকে এড়িয়ে, উপেক্ষা করে চলত। ও নাকি বুড়ী এলিজাবেথকে বলেছে, সবিতাকে উল্লেখ করে, কালোরা এদেশে এসে ভাবে ওরা আমাদের অর্থাৎ ইউরোপীয়ানদের সমপর্যায়ে উঠে গেছে!

অবশ্য কণচিতা এ কথা বলেছে, না, এলিজাবেথ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পতনের আক্রোশে নিজের মনের ঝাল ঝেড়েছে, সে সম্বন্ধে সবিতার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সবিতা আজো জানে না, সে কি অপরাধ করেছে। সে পূরবকে দুঃখ করে একদিন সে কথা বলেছিল।

পূরব বলল, মুখ টিপে হেসে, ও আপনাকে হিংসে করে।

হিংসে? আমাকে? Don't be ridiculous!

উহুঁ, আমার তাই মনে হয়। ও আমাকে ভেবেছে আপনার বয়ফ্রেণ্ড।

কি বাজে কথা বলেন!

ওর ব্যর্থ সুন্দর যৌবন কারুর সৌভাগ্যকেই এখন আর সহ্য করতে পারে না।

সৌ-ভাগ্য! সবিতা বিদ্রূপে ভ্রূ তুলে বললে।

মাফ চাইছি। পূরব ছদ্ম গাম্ভীর্যে বললে।

ওর কাছে তাই মনে হয়েছে। আপনি আমাকে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, অথচ আমি ওর সঙ্গে 'ডেট' করার কোন রকম চেষ্টা না করে, আপনাকেই কাকুতি মিনতি করলাম কবে দেখা করবেন বলে।

ওঃ, কাকুতি! অর্থাৎ রূপসী তরুণীকে উপেক্ষা করে বয়স্কা বিধবার প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্ব ওর ভাল লাগেনি।

সবিতা মাথা নেড়ে বললে, স্বাভাবিক। তা ওর সঙ্গে 'ডেট' করলেন না কেন?

কি লাভ? চার সপ্তাহ পরে মাথা চুলকে ভাবতে হবে, কি কথা বলব।

ঃব। সবিতা রাগ করে বলল। আপনারাই আবার সমাজতন্ত্রের কথা বলেন!

উহুঁ, সে কথা নয়। কে কার মেয়ে, কি তার পেশা, সে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, যতক্ষণ তার সঙ্গে আমার সাংস্কৃতিক অ-সাম্য না হচ্ছে।

সে অ-সাম্য তো আপনার সঙ্গে আমারও আছে।

না, নেই। আপনি হয়তো কিনস্-এর থিওরি পড়েননি। কিন্তু আপনার মনের প্রসার অনেক বেশি। সবচেয়ে বড় কথা আপনার জীবন-ঔৎসুক্য আছে, এবং আপনি তার সদ্ব্যবহার করেন। যা আমাদের দেশের সাধারণ বি.এ. এম.এ. পাশ ছেলে-মেয়েদেরও নেই।

আমার প্রশংসা রাখুন তো!

সত্যি কথা বললাম। পূরব কথা ঘুরিয়ে বলল, আমার একেক সময় অবাক লাগে, যখন দেখি, ভারতীয় বন্ধুরা কন্টিনেন্টাল বা অর্ধ-শিক্ষিত ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বান্ধবীর সঙ্গে কি কথা বলিস রে?

সে হেলাভরে হেসে উত্তর দিল, you don't mean to say, you go with girls for intellectual exercise, do you?

পূরব কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, এর পরে আর কি বলবেন, বলুন। অবশ্য আমি বন্ধুদের খুব দোষও দিতে পারি না। একাকীত্ব বিদেশে থাকার এমন অভিশাপ যে, সঙ্গতৃষ্ণা ছেলেদের মাথা খারাপ করে দেয়। তা ছাড়া নূতনত্বের আকর্ষণ কার বা নেই?

আমার মনে হয়, এবার সবিতা বললে, ভারতীয় ছেলেরা এদেশে এসে মেয়েদের অশ্রদ্ধা করতে শেখে।

বাইরে কিন্তু সম্মান করতে শেখে খুব, চেয়ার এগিয়ে দেওয়া, মেয়ে ঘরে ঢুকলে উঠে দাঁড়ানো, কোট পরিয়ে দেওয়া; অথচ মনের ভেতরে জেনে রাখে মেয়েরা হচ্ছে শুধু ফুর্তি করার ফেলা বাগান। শুধু সুযোগ করে নেওয়া, সুযোগের অপেক্ষায় থাকা।

সবিতা হেসে বলল, এই ছেলেরাই শুনেছি, দেশে ফিরে অল্প বয়সের কুমারী মেয়ে খোঁজে বিয়ের জন্য, যার কৌমার্যের সুযোগ কেউ কোনদিন নেয়নি।

ঠিকই শুনেছেন। ধনী, কালচারড্ ফ্যামিলির মেয়ে ছাড়া তাদের মন ওঠে না।

গীতি একদিন বলেছিল সবিতাকে দুঃখ করে, জানেন বিয়ে না করে থাকা বড় মুশকিল। ছেলেরা ভাবে অবিবাহিত মেয়েরা হচ্ছে বেওয়ারিশ মাল, যে কেউ এসে তার অধিকার দাবী করতে পারে। ভুলে যায়, মাল যদি হয়েই থাকে মেয়েরা, সঠিক দাবীদারের কাছে ছাড়া আর কারুর কোন অধিকার নেই তাতে।

পূরব বলত, প্রেমে যদি দেহ-মন-আত্মার আন্তরিক শ্রদ্ধা না থাকে, সে প্রেম মোহ, দেহের ক্ষুধা ছাড়া আর কিছু নয়। বেশির ভাগ ভারতীয় ছেলে যখন বিদেশিনী বিয়ে করে, ভুলে যায়, দেহের ক্ষুধা ক্ষণআনন্দের, জীবন-সঙ্গিনীর একমাত্র মূলধন নয়। তাই আমি কণচিতার ডাক্তার বন্ধুকে খুব দোষ দিই না। কথা দিয়ে, আশা দিয়ে সে অন্যায় করেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে, কণচিতা আর ডাক্তারের জীবনে মিল কোথায়, বলুন? দেশের বিরাট ব্যবধানের কথা না হয়ে ছেড়েই দিলাম।

কণচিতা অচেতন মনে ডাক্তারের আশা ছেড়ে দিয়েও সচেতন মনে প্রতীক্ষার পরাজয় মেনে নিতে পারেনি।

সবিতা যখন শুনল কণচিতা ফ্রেঞ্চ রিভায়ারাতে এক পরিবারের দুই মেয়ের তত্ত্বাবধানের চাকরি নিয়ে দুদিন পরে চলে যাচ্ছে: সে স্থির থাকতে পারল না। শত হলেও কণচিতা তার হতাশা নিয়ে, ধর্মের গোঁড়ামি নিয়ে, ব্যর্থতা নিয়ে, বড় একা।

সবিতা কণচিতার ঘরে টোকা দিয়ে বললে, আসতে পারি?

কণচিতা দরজা খুলে দিল উদাসীনভাবে। এস! অনুৎসাহে বললে।

তুমি চলে যাচ্ছ শুনে দেখা করতে এলাম।

ধন্যবাদ। ঠাণ্ডা গলায়।

সবিতা আবার বললে, আমি যদি কোন অন্যায় করে থাকি রাগ নিয়ে যেও না। বিশ্বাস কর, আমি চাই তুমি জীবনে অন্য সবার মতো সুখী হও, আনন্দ নিয়ে থাক। জীবনে আবার বিশ্বাস ফিরে পাও।

কণচিতা স্যুটকেসে কাপড় গুছিয়ে রাখছিল। সে হঠাৎ বাক্স হাত দিয়ে সরিয়ে, চেয়ারে বসে, দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল।

বাক্স উল্টে কাপড় চোপড় ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। পায়ের কাছে উল্টে পড়ল ডাক্তারের ছবি, সই করা, 'চিরকাল তোমার'।

সবিতা একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। উচ্ছাসের বাঁধ ভাঙা জোয়ার দেখবে বলে সে আশা করে আসেনি। সে কি করবে ভেবে না পেয়ে ছবিটা তুলতে যেতেই কণচিতা ওর হাত থেকে ছবি কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের এক কোণায়। ফেলে দিয়েই সে প্রায় হাহাকার করে কেঁদে উঠল নিজের কোলে মুখ গুঁজে।

সবিতা ভাবল, কাঁদুক মেয়েটা। কাঁদুক! বেচারার বুকটা একটু হাল্কা হোক! তিন বছরের কান্না জমা আছে ওর সুন্দর যৌবন-গর্বিত ব্যর্থ বুকে।

কণচিতা কাঁদতে থাকল। সবিতা ওর লাল সিল্কের মতো মসৃণ চুলে আলতোভাবে একবার হাত বুলিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কণচিতার সঙ্গে আর সবিতার কোনদিন দেখা হয়নি। অফিস থেকে ফিরে শুনল চলে গেছে সে ফ্রান্সে।

এখনও কণচিতাকে মনে করলেই ওর মনে পড়ে সেই বিচলিত বুক-ফাটা কান্নার কথা। সে ডাক্তারকে প্রাণ থেকে ক্ষমা করতে পারে না। সব বুঝেও পারে না।

আজ সেই ইটালীয়ান কফি হাউসে বসে সবিতার মনে পড়ল কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে একসঙ্গে মলি, মারিয়া, কমলা আর কণচিতার ব্যথিত জল-ভরা বেদনার কথা। ওর চোখে পড়ল দেয়ালের উল্টো দিকে নৈর্ব্যক্তিক ছবির ওপর। যা কেবল এতদিন মনে হয়েছে শিল্পীরই বোধগম্য। সবিতার মনে হল সে যেন ওই হিজিবিজির মধ্যে বর্তমান ব্যর্থতার রূপ দেখতে পেয়েছে, তীব্র রং-এর এলোমেলো ছটার মধ্যে ওই চারটি মেয়ের বিশৃঙ্খল জীবন পথ খুঁজে পাওয়ার অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছে—

দশ

সবিতার শোক

কি এত আকাশ পাতাল ভাবছ তুমি সবিতা ? দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করল।

কুমারস্বামী মলিকে বিয়ে করতে চায়, মলি বলছে ওর মাসিকে বলার জন্য।

তুমি কি বলেছ ?

আমি বলেছি ভেবে দেখব। সবিতা ভয়ে ভয়ে বলল।

অর্থাৎ তুমি পরের ব্যাপারে নাক গলাতে রাজী হয়েছ ?

আমার বলা উচিত হবে না, না ?

আমার মতে নিশ্চয় না। তুমি কেন গায়ে পড়ে সর্দারী করতে যাবে ? তুমি জান না ওদের মধ্যে কতটা গভীরতা আছে। মাঝখান থেকে তুমিই অপদস্থ হবে। আর তাছাড়া, ওদের জীবনের সঙ্কট মুহূর্তে নিজেদেরই দায়িত্ব নিতে হবে।

তুমি ঠিকই বলেছ। সবিতা গম্ভীরভাবে বলল।

কি, দেবেন্দ্র ঠাট্টা করে বলল, ঘটকালির সুযোগটা মাঠে মারা গেল, না ?

আহা, যাও।

অতএব সবিতা মলিকে বলল, না ভাই, আমার মনে হয় কুমার কিংবা তুমি নিজে সীমাকে বল। আমার বলা ভাল দেখাবে না।

মলি আর অনুরোধ করল না। সে বললে, আমিই বলব, কি করবে, খেয়ে তো আর ফেলবে না।

কিভাবে মলি কি বলেছে সীমাকে সবিতা জানে না, কিন্তু দুদিন

মলির কোন পাত্তা নেই। কুমারস্বামী সবিতাকে ফোন করে বলল, আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি কি আজ?

নিশ্চয়, আসুন।

কুমারস্বামীর গম্ভীর মুখ, থমথমে, বেশবাস আগের মতোই ফিটফাট, আচার-আচরণে ভদ্রতার কোন ত্রুটি নেই।

সবিতা ওর মুখ দেখে বলল, লাঞ্চ খেয়েছেন কি?

ও কুমারস্বামী হাত ঝাপটে বলল, খাব খন এক সময়ে।

সবিতা বলল, চলুন এক সঙ্গে খাওয়া যাক। আমি একলা খেতে পারি না।

ও আপত্তি করল না। সবিতাই খেতে খেতে বলল, মলির দুদিন পাত্তা নেই। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে কি?

কুমার ওর গভীর চোখ তুলে বললে, না, কাল আমার সঙ্গে ওর দেখা করার কথা ছিল, আসেনি। আমি ফোন করেছিলাম, বোধহয় ওর মাসিই হবে, বড় বিশ্রী ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে। কুমার যেন লজ্জিত হল কোন ভদ্রমহিলার প্রতি দোষারোপ করাতে, সে গলা নামিয়ে বললে, মলি নাকি বলেছে, আমার সঙ্গে সে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। ওর গম্ভীর কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, আমি বিশ্বাস করি না। I must see her before I leave this country.

আপনি চলে যাচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ, বাঙ্গালোরে চাকরি পেয়েছি। সাতদিনের মধ্যে যোগ দিতে হবে কাজে।

বাঃ তুমি তো খুব লাকি বলতে হবে, চাকরি নিয়ে যাচ্ছ দেশে।

হ্যাঁ, জীবনে প্রথম নিজেকে আমি ভেবেছিলাম ভাগ্যবান, মলিকে পেয়ে, পাশ করে। কিন্তু সব ভুল।

কুমার কাঁটাচামচ প্লেটে রেখে, প্লেট সরিয়ে বলল, দেখুন আমার বড় গরীব ঘরে জন্ম, বাবা কংগ্রেস-সেবক ছিলেন, অর্থোপার্জনের দিকে কোনদিন নজর দেননি। মা অনেক কষ্ট করে আমাকে মানুষ

করেছেন। বাবার সঙ্গে আমার রাজনীতির মতে বনে না, বনলে হয় তো একটা স্কলারশিপ যোগাড় করতে পারতাম।

আমাকে চাকরি করে, বিকেলে পড়ে, পরীক্ষা পাশ করতে হয়েছে। আমি জানি মলির মতো আমি বড়লোক নই, কোনদিন হবার সাধও নেই, তবু ওর কোন কষ্ট আমি হতে দিতাম না। কুমারস্বামী থেমে হঠাৎ বলে উঠল, মলি যদি শুধু বেরিয়ে আসতে পারত, একটু সাহস করে।

কুমার যেন হঠাৎ মন ঠিক করে দাঁড়িয়ে উঠল, বলল, ওর মাসি আমাকে যতই অপমান করুক, আমি মলির মুখে কথা না শুনে যাব না। ভেবেছিলাম আপনাকে বলব, but I must face it myself!

লাঞ্চের জন্য অনেক ধন্যবাদ!

সবিতাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে বেরিয়ে গেল।

সবিতার বুক দুরদুর করতে লাগল, যেন সে নিজেই সীমার আক্রোশ আর ঘৃণার মুখে পড়েছে।

কুমারস্বামীর সঙ্গে সবিতার আর কোনদিন দেখা হয়নি, কিন্তু এদেশে অগুনতি ছেলের মধ্যে যে-কয়টি মুষ্টিমেয় ভারতীয় ছেলেকে সে শ্রদ্ধাভরে মনে রেখেছে, কুমারস্বামী তার মধ্যে অন্যতম।

মলি শেষ পর্যন্ত পারল না গতানুগতিক জীবনের বেড়া ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে, বিশ্বাস করতে পারল না যে অন্যপ্রদেশীয় ছেলে তাকে জীবনে সুখ, নিশ্চয়তা দিতে পারে।

মলি সবিতার বুকে পরে কি কাঁদেনি, ওর দুঃখ হয়েছে, সহানুভূতি হয়নি। মলি কেঁদে কেঁদে, ওর অপূর্ব্ব বিশাল চোখে জল ভরে বলেছে, মাসির জন্যই ওর জীবন নষ্ট হল। পরকে দোষ দিয়ে আত্মদুর্বলতা, মনস্থির করতে না পারার অক্ষমতা ঢাকা কত সহজ, সবিতার মনে হয়েছে। সে দৃঢ়স্বরে, দীর্ঘ কৃষ্ণ-পক্ষ জুড়ে বলেছে, সে

আর কোনদিন বিয়ে করবে না। জীবনে কুমারস্বামী শুধু একবারই আসে।

সীমা সাতদিনের নোটিশ দিয়ে ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্য পাড়ায় চলে গেল। লোক মুখে একবছর পরে সবিতা খবর পেয়েছিল, ডাঃ বোস পাশ করতে পেরেছে, মলি আরেকটা বিষয়ে 'ও' লেভেল-এ জি. সি. ই. পাশ করেছে। সীমা ভরসা করে মলিকে বিলেতে রেখে যেতে পারেনি, সঙ্গে নিয়ে গেছে দেশে।

লণ্ডনে ফ্ল্যাট খালি থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে লোক এসে গেল। কালারড্ বা রঙীন লোক ছাড়া এ বাড়িতে আর কে আসবে? বর্ণ-বৈষম্য ইংলণ্ডে আমেরিকার মতো প্রকাশ্য বা এত তীব্র নয়। এ দেশের বৈষম্য শীতল ভদ্রতার ভেতরে ঢাকা, চাপা দেওয়া থাকে, অশিক্ষিতের মুখ থেকে হয়তো কিয়দংশ উছলে পড়ে আচমকা।

ঘর, ফ্ল্যাট বা বাড়ি খুঁজতে গেলেই বর্ণ বৈষম্যের বিষের ফণা ফোঁস করে ওঠে, কেউ ভদ্রতার মুখোস খুলে সোজাসুজি বলে, আমি কালারড্ টেনেন্ট চাই না। দুঃখিত। কোন দুঃখ প্রকাশ না করেই বলে।

যারা একটু ভদ্র, রঙিন লোকেরা বাড়ি দেখতে এলে তার দেহের বর্ণ দেখে বলে ওঠে, এই যা, এক্ষুনি ভাড়া হয়ে গেল, তুমি যদি এক মিনিট আগেও আসতে! হয়তো রাস্তায় দেখতে পাবে নতুন ভাড়াটে যাচ্ছে। বড়ই দুঃখিত।

রাস্তায় তো কত লোকই দেখা যায়! পরের দিন কাগজে দেখা গেল সেই বাড়ি-খালিরই বিজ্ঞাপন আবার বেরিয়েছে। ভাড়াটে চাই।

অতএব যে বাড়িতে একবার রঙিন লোক ঢুকেছে, সে বাড়িতে শ্বেতচর্মের আবির্ভাব, বিশেষ করে ইংরেজদের উপস্থিত মোটামুটি অসাধারণ ঘটনা।

অতএব সবিতাদের ফিন্সবারী পার্কের বাড়িতে আবার তিনজন ভারতীয় ছাত্রীই এল। তারা তিনজনেই ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশনে এম. এড. অর্থাৎ মাস্টার অফ এডুকেশন করতে এসেছে।

ওদের সঙ্গে থেকে এবং ওদের বন্ধুদের দু-বছর দেখে দেশের শিক্ষয়িত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা তার চিরকালের মতো ঘুচে গেছে।

ওরা এলে পরে সবিতা ঠিক করল এবার আর সে জড়িয়ে পড়বে না, যথেষ্ট হয়েছে, দূরে দূরে থাকবে, ইংরেজদের মতোই ঘাড় বাঁকানো মিষ্টি হাসির চেষ্টা করে গুডমরনিং আর গুডনাইট বলে প্রতিবেশীর দায়িত্ব সারবে।

দেবেন্দ্র বলল, ভালই হল, তোমার আরো তিনজন বন্ধু হল।

বাব্বা, সবিতা আতঙ্কে হাত নেড়ে বলল, ওরা কত শিক্ষিত, আমি ওদের সঙ্গে কি কথা বলব?

কথা বলার অনেক কিছু পাবে, দেবেন্দ্র স্বল্প হেসে বললে, দেখতে পাবে অধিকাংশ সময়েই ডিগ্রির শিক্ষা সুতোয় মাঞ্জা দেওয়ার মতো, ভেতরে খুব বেশি বদলায় না।

দেবেন্দ্র সত্যদ্রষ্টা, সবিতা পরে স্বীকার না করে পারেনি।

সবিতা অল্প কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করেছে, দেবেন্দ্র যেন একটু বদলেছে, একটু মানবিক হয়ে উঠেছে, আগের চেয়ে বেশি কথা বলে, সবিতা কি করে না করে, কি চায় না চায় তার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, চেষ্টা করে তাকে খুশি করতে এমন কি পড়াতেও বসে, মায়াকে শেখায় ক, খ আর বলে বড় হয়ে যে দেশে ইচ্ছা থাক, কিন্তু ভুল না তুমি বাঙালী সর্বোপরি তুমি ভারতীয়।

মায়া যেন খুব বুঝেছে, গম্ভীরভাবে কথা দেয়, আমি বারটীয়, আমি ভুলব না।

তুমি কি মা?

আমিও বারটীয়। সবিতা হেসে বলে।

দেবেন্দ্র সবিতাকেও পড়ায় মাঝে মাঝে। বন্ধুরা চলে গেলে সে পড়ায় এ্যারিস্টটল, প্লেটো, হিন্দুদর্শন, একসঙ্গে পড়ে পৃথিবীর

ইতিহাস। বলে, আগে তুমি এইচ. জি. ওয়েলসের বইটা শেষ কর তারপর আরো বিশদভাবে যাবে।

সবিতা যেখানে বুঝতে পারে না জিজ্ঞাসা করে, নইলে ডিকশনারী দেখে। সে পড়ে আর ভাবে, ভাবে আর পড়ে, আর প্রশ্নে-প্রশ্নে দেবেন্দ্রকে বিরক্ত করে তোলে। দেবেন্দ্র কোনদিন বিরক্তি প্রকাশ করে না, হেসে বলে, তোমার মতো সব ছাত্রী হলে মাস্টাররা তো পাগল হয়ে যাবে!

বেশ। সবিতা রাগ করে বলে, আর একটা যদি কথা বলেছি। পাঁচ মিনিট পরেই আবার প্রশ্ন, আচ্ছা জাতিভেদ আর শ্রেণীভেদ-এর তফাৎ কি গো? ইংলণ্ডে ফিউডাল আমলে তো প্রায় আমাদের দেশের মতোই অবস্থা ছিল, হ্যাঁ?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বিশেষ তফাৎ নেই কিন্তু তফাৎ প্রচুর। দেবেন্দ্র সবিতার পাঁচ মিনিট আগেকার প্রতিজ্ঞা মনে করিয়ে দেয় না, বলে, caste system বা জাতিভেদ অনমনীয়, জন্মগত, এবং পেশাগত, একটি বৃহৎগোষ্ঠী হয়তো উচ্চতর জাতে নিজেকে নিয়ে আসতে পারে বংশানুক্রমিক চেষ্টার ফলে। কিন্তু শ্রেণীভেদে একটি ব্যক্তি তার নিজের গুণেই বল বা সুযোগ ব্যবহার করেই বল, নিজেকে উচ্চতর শ্রেণীসমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তারপরে জাতিভেদে ছোঁয়াছুঁয়ি, জাতির বাইরে বিবাহ একেবারে বারণ।

হিন্দুরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করে, তাই না? সবিতা বলল।

হ্যাঁ, জাতিভেদের দর্শন গড়ে উঠেছে জন্মান্তরবাদের ওপর নির্ভর করে। আগের জন্মের পাপে বা গুণে জন্মের জাতিভেদ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে। অতএব এ জন্মে ভাগ্যকে স্বীকার করে নিজ নিজ কর্তব্য করে যাও বিনাবাক্যে, চিত্রগুপ্ত সব হিসাব রাখছেন, দেবেন্দ্র হেসে বলল, ভগবান পরের জন্মে নিশ্চয় তোমার প্রতি সদাশয় হবেন!

সবিতা চিন্তা করে কূল না পেয়ে বলল, তুমি বিশ্বাস কর?

কিসে?

জন্মান্তর বাদে ?

না সবিতা, দেবেন্দ্র সবিতার দিকে পূর্ণদৃষ্টি রেখে বলল, আমার ধারণা জন্মান্তরবাদ দেশের সমাজ-ব্যবস্থা অটুট রাখার একটি অস্ত্র।

অটুট রেখেছে তো।

মূল্য বিচারে অটুট থাকাটাই কি বড় কথা ? তাছাড়া রাখতে পারছে কি ? দেবেন্দ্র চশমা খুলে হাতে নিয়ে বলল, হিন্দুসমাজের মস্ত গুণ ছিল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া, সমাজের এমনই প্রসার ছিল, যে বহু আক্রমণ সে সহ্য করতে পেরেছে, গ্রহণ করতে পেরেছে নতুন ভাব, নতুন চিন্তা, নতুন রক্তের মিশ্রণ।

কিন্তু এখন, দেবেন্দ্র মুখ ফিরিয়ে নিল জানলার দিকে, যেন মোটা পর্দা ভেদ করে দেখছে সে ভারতের নীল ঘন তারা-ভরা আকাশ, এখন এই বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, শিল্প-বিপ্লব আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে উল্টে-পাল্টে দিচ্ছে আর দেবেও।

অর্থাৎ সবিতা ব্যগ্র হয়ে বলল, জাতিভেদ থেকে শ্রেণীভেদে আমাদের পদোন্নতি হবে ! এমন ঠিক ভালটা হল ?

প্রকৃতিগত ভাবে ভাল হয়েছে, দেবেন্দ্র সবিতার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কিন্তু লক্ষ্য না করে যেন উত্তর খুঁজে পাবার চেষ্টা করতে লাগল, বলল, সোভিয়েট রাশিয়ার জন্মই তো শ্রেণীভেদ দূর করার জন্য, অথচ যতদূর জানা যায়, ওখানেও এক ধরনের শ্রেণীভেদ গড়ে উঠছে ; ইউরোপ, আমেরিকার মতো হয়তো অত উগ্র নয়, তবু তো গড়ে উঠছে। দেবেন্দ্র একটু থেমে সবিতার হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে যেন নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, ধীরে ধীরে, তবু আমার বিশ্বাস পৃথিবী কোন একদিন মানুষকে কেবল মানুষ বলেই সম্মান দিতে শিখবে, রুপোর মূল্য যদি থাকেও সে শুধু প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্যই থাকবে।

দেবেন্দ্র একটু ঝুঁকে এল, সবিতার মুখ আলগোছে দুই হাতে তুলে

বললে, মানুষ এক অপূর্ব, আশ্চর্য, সুন্দরতম সৃষ্টি সে কথা আমরা কত সহজে না ভুলে যাই।

সবিতা ওর মাথা নামিয়ে রাখল দেবেন্দ্রর কোলে। দেবেন্দ্র আস্তে আস্তে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।

সবিতা কি তখন জানত সুখের মতোই শান্তিও চপলগামী।

সবিতার দেশের জন্য বড় একটা মন কেমন করত না। মনে পড়ত অবশ্য মা-বাবা ভাই-বোনের কথা। দেশে তার বন্ধু ছিল না, এখানেও নেই। থাকলে খুশি হত, কিন্তু নেই। তার কোলকাতার বাসাতেও দেবেন্দ্রর বন্ধু বান্ধব, ছাত্ররা আসত, আত্মীয়স্বজন আসত, কিন্তু লণ্ডনের মতো ভীড় ছিল না। অথচ সবিতা চিন্তা করে দেখেছে এখানে লোক-সমাগম হলেও, কেমন যেন ভাসা-ভাসা, ছাড়া-ছাড়া এক সম্পর্ক, যেন আত্মার আত্মীয়তা নেই। কেউ তাকে বৌদি বা দিদি ডেকে জাঁকিয়ে বসে আবদার করে না, দাবী জানায় না। শুধু এক কাপ চা-ই যেন এদের প্রাপ্য। আর শনি বা রবিবারে লোক ডেকে আনলে কেউ ফুল নিয়ে আসে, কেউ বা আনে মায়ার জন্য চকলেট, ভদ্রভাবে বসে, শখ করে কেউ-বা হাত দিয়ে খায়, হৈ-হৈ করে গল্প করে, যাবার সময়ে কখনো বলতে ভুলে যায় না, আপনার অপূর্ব আতিথেয়তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

সবিতা অপ্রস্তুত হয়ে হাসি-হাসি, বোকা-বোকা মুখে চুপ করে ধন্যবাদ গ্রহণ করে। মুখ দিয়ে তখনও বেরোয় না, please, don't mention অথবা you are welcome অথবা pleasure is mine!

সবাই চলে গেলে ঘরের মধ্যে এক বিশৃঙ্খল শূন্যতা ঝুলতে থাকে, মনে হয় কেউ কিছু দেখে যায়নি, নিয়েও যায়নি সবিতার থেকে; অদ্ভুত ব্যক্তিকেন্দ্রিক অথচ নৈর্ব্যক্তিক এক ভাব বিরাজ করে।

প্রথম প্রথম হয়তো ভিন্ন নতুনত্বের জন্য ভালই লাগতো অতিথি-সেবা, এখন বড় ক্লান্ত লাগে।

সে একদিন অনেক দ্বিধা করে বলেই ফেলল দেবেন্দ্রকে, আমি আর পারি না বাসন মেজে, রান্না করে।

তোমাকে তো অনেকেই বাসন মাজতে সাহায্য করতে চায়। তুমি দাও না কেন?

দূর, তাও কি হয়? সবিতার দেশী মনোভাব তখনও প্রবল। পুরুষরা বাসন মাজবে! আর তাছাড়া যে কোন অতিথি যাই করুক, বাসন মাজতে যাবে কি? সবিতা বলল।

দাদাকে বল না দু-এক সপ্তাহ বাদ দিতে।

দেবেন্দ্র ক্লান্ত স্বরে বলল, দেখ দাদা দেশের জীবন বড় একটা পাননি। আদর করে লোক ডেকে দেশের মতো খাওয়ানো, গল্প করা, তোমাকে দিয়েই দাদা তার সাধ মেটাচ্ছেন।

দাদা দেশী মেয়ে বিয়ে করলেন না কেন? সবিতা একটু উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল। দেবেন্দ্র সহজে দাদার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোন কথা বলে না, যদিও সবিতার নারীসুলভ ঔৎসুক্য অপার।

দেবেন্দ্র একটু হেসে বলল, তোমার কি মনে হয় কোন দেশী মেয়ে দাদার জীবনধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারত?

সবিতা একটু ভেবে স্বীকার করল, না তা পারত না হয়তো।

দেবেন্দ্র ক্লান্তিতে চোখ বুজে বললে, আর কয়দিন একটু কষ্ট কর, দাদা যদি সুখ পায়, আর পাঁচজনে একটু আনন্দ পায়, তোমার কষ্ট সার্থক হবে।

কয়দিন বললে কেন? সবিতা ধরে বসল।

ঘুমুতে যাও, অনেক রাত হয়েছে।

না, তুমি কয়দিন বললে কেন? আমি লক্ষ্য করছি, তুমি আজকাল কিছু খেতে চাও না। সব সময় তোমাকে ক্লান্ত দেখায়। কি

হয়েছে তোমার বল। নইলে আমি সারা রাত বসে থাকব আজ। সবিতা দৃঢ়স্বরে বললে।

দেবেন্দ্র চোখ বুজে আস্তে আস্তে বললে, সবিতা, তুমি দরকার হলে চাকরি করতে পারবে ?

আমাকে চাকরি দেবে কে ?

দেয় যদি কেউ ?

দিলে তো আমি এক্ষুনি নিই।

কষ্ট সহ্য করতে পারবে ?

সে কষ্টে না পড়লে কি করে বলব ?

সবিতার গলা যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেল, সে খসখসে গলায় বললে, কেন এসব কথা বলছ ? কি হয়েছে তোমার ?

আমাকে হয়তো অল্প-দিনের জন্য হাসপাতালে যেতে হতে পারে।

সবিতা ভয় পেয়ে উঠে বসে বলল, সেকি ? কেন ? কোন্ ভারতীয়র হাসপাতালে ভীতি নেই ?

ডাঃ বলছে আমার একটা চেক-আপ করা দরকার। ভয়ের কিছু নেই।

ভয়ের কিছু নেই শুনে সবিতার ভয় হল।

সে বলল, তাই তুমি ডাক্তারের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলছিলে ? কবে যেতে হবে ?

দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই।

তুমি আমাকে কোনদিন কিছু বলনি। আমাকে তুমি আপন ভাবতেই পারলে না কোন দিক থেকে, শুধু শুধু বিয়েই করেছিলে সাতপাক ঘুরে।

সবিতার চোখ জ্বালা করতে লাগল।

দেবেন্দ্র বললে, কি ছেলেমানুষী করছ ? তুমি অকারণ চিন্তা করবে বলেই বলিনি। আর তোমাকে যদি আপন না ভাবতাম, তবে কষ্ট করতে বলতাম কি আমার জন্যে ? দাদার কাছে সাহায্য

চাইতাম। দাদা আমাদের জন্য অনেক করেছেন, আর আমি তার কাছে হাত পাততে চাই না, সবিতা।

সবিতা শুকনো মুখে বললে, হাসপাতালে তোমাকে কয়দিন থাকতে হবে যে সাহায্যের কথা ভাবছ?

যদি আমার কিছু হয়।

সবিতা ব্যাকুল হয়ে বললে, তুমি অমন কথা বল না। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। সবিতা চেষ্টা করেও পারল না, ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। দেবেন্দ্র লণ্ডনে এসে এই প্রথম সবিতাকে বুকে টেনে নিয়ে ওর কপালে নিজের মুখ নামিয়ে আনল। আস্তে আস্তে সবিতার দুঃখময় আতঙ্ক ভরা দেহে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল।

ওর মনে হতে লাগল সমস্ত দেহ দিয়ে সে যদি দেবেন্দ্রকে একান্ত নিকটে পায়, শুধু আজকের মতো হলেও, এই দুঃস্বপ্ন ভরা মুহূর্ত, শঙ্কায় ঢাকা নিশ্ছিদ্র ভবিষ্যত মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। সার্থক সঙ্গমের পরিপূর্ণতায় ধন্য হয়ে থাকবে তার মাটির জীবন। দেহ মনের একাকীত্বের ভয় নিয়ে সে এমন সচেতনভাবে আগে কোনদিন কামনা করেনি দেবেন্দ্রের ভালবাসা, সযৌন আলিঙ্গন।

আদর করতে থাকা বিড়ালের মতোই সে নিজেকে গুটিয়ে, ঘন হয়ে আত্মনিবেদন করল দেবেন্দ্রর বুকে।

দেবেন্দ্র সহজ জ্ঞানে, অ-সচেতন ভাবেই নিজেকে আস্তে আস্তে মুক্ত করে নিয়ে বললে, আমি বড় ক্লান্ত বোধ করছি সবিতা। ঘুমোতে যাচ্ছি, কেমন?

যাও। অর্ধ-ব্যক্ত স্বরে বললে সবিতা। দেবেন্দ্র চলে গেলে সে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে নিজের মনেই বলে উঠল, ছিঃ, স্বামী অসুস্থ কোথায় তাকে সেবাযত্ন করবে, না—

সেদিন থেকে নিজের দেহাত্মার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সবিতা আর প্রশ্রয় দেয়নি। এর পরে সারা জীবন সেই দিনকার একাগ্র ব্যাকুল

ইচ্ছার কামনা, তার সজ্ঞান মনের আড়ালে জ্বলে জ্বলে তাকে দুর্বল, পঙ্গু, বিশৃঙ্খল, সমাজে-অচল করে দিয়েছে।

সপ্তাহখানেক পরেই দেবেন্দ্র হাসপাতালে গেল। তার যা উপার্জন তাতে বিশেষ জমানোর সুযোগ ছিল না, তবু কয়েক সপ্তাহ চালাতে পারবে একটু কষ্ট করে, সবিতা বুঝতে পারল। দু-সপ্তাহ হাসপাতালে থাকার পরেই শচীন্দ্র চেক্ লিখে দিল সবিতাকে।

সে বললে মুখ নিচু করে, টাকা আছে দাদা, লাগলে পরে চেয়ে নেবখন।

শচীন্দ্র তার মোটা ফরাসী চশমার ফাঁক দিয়ে এক মুহূর্ত সবিতাকে দেখে বলল, আচ্ছা। দরকার হলে চাইতে কোন সঙ্কোচ বোধ কর না, আমি সবসময় ব্যস্ত থাকি হয়তো ভুলে যাব।

আচ্ছা দাদা। সবিতা কৃতজ্ঞ হয়ে বললে। সবিতার নিজের দাদারা কোনদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেনি, কি তার চাই, কি তার দরকার, কিছু দেওয়া তো দূরের কথা! তার অস্তিত্ব কেই-বা লক্ষ্য করত, এক মা বাবার বুকের ভার হয়ে থাকা ছাড়া?

এসব কথা এখন কেন মনে পড়ে, পরকে দোষারোপ দিয়ে কি লাভ?

সবিতা জোর করে সোজা হয়ে, যেন নিজের চোখের জলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বললে, দাদা, আমাকে একটু হাসপাতালে পৌঁছে দেবেন আজ?

নিশ্চয়ই, তুমি তৈরি হয়ে নাও। মায়াকে আমার ওখানে নিয়ে যাচ্ছি, পরে শোফার পৌঁছে দেবেখন।

সবিতা হাসপাতালে গিয়ে দেখল—ব্যানার্জী, চৌধুরী, ইণ্ডিয়া হাউসের দুই কর্ণধার বসে আছে। সবিতা যেতেই ওরা বেরিয়ে গেল, বলল, আমরা অপেক্ষা করছি বাইরে। আপনি যান।

সবিতা যেন আজ প্রথম লক্ষ্য করল, দেবেন্দ্র কতই না রোগা হয়ে গেছে।

মায়া কার কাছে আছে ?

দাদা নিয়ে গেছে, পৌঁছে দেবে বলেছে। রোজ জিজ্ঞেস করে, বাবা কবে আসবে! কবে আসবে গো ? তিন সপ্তাহ তো হল।

কেন, তোমার একা একা খারাপ লাগে ?

তা-তো লাগেই। ডাক্তার কি বলল, কেউ আমাকে কিছু বলে না। না বললেই যে আবোল তাবোল আরো বেশি চিন্তা হয় সেটা কেউ বোঝে না।

দেবেন্দ্র আস্তে আস্তে বলল, আমাকে হাসপাতালে কিছুদিন থাকতে হবে সবিতা। চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, সে বলছে তোমাকে হয়তো একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে পারে। তুমি কি বল ?

ভালই তো। তোমার কি হয়েছে বললে না-তো ?

ক্যান্সার হয়েছে পেটে। দেবেন্দ্র সোজা তাকিয়ে স্বাভাবিকভাবে বলল, যেন নিত্যদিনকার খবর আদান-প্রদান হচ্ছে।

সবিতা প্রথমে বুঝতে না পেরে প্রায় বলতে যাচ্ছিল, কি বললে ?

ঘণ্টা বেজে উঠল যাবার। সবিতা যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়াল। দেবেন্দ্র শুধু সবিতার হাতে একটু চাপ দিল—ভাষাহীন সান্ত্বনা।

সবিতা বলল, রাত্রে ঘুম হচ্ছে তো ?

হ্যাঁ। তুমি এবারে যাও, নার্স আসছে।

সবিতা যেন স্বপ্নচালিত। ব্যানার্জী বলল, এই যে চলুন। আপনাকে পৌঁছে দেব বলে অপেক্ষা করে আছি।

সবিতা চমকে উঠল। বলল, না, না, আমি একাই যেতে পারব।

ব্যানার্জী বলল, এই অধমের গাড়ি থাকতে আপনি কখনো একা যেতে পারেন ?

চৌধুরী আর সবিতা গাড়ির পেছনে বসল। চৌধুরী কথা আরম্ভ করল গলা পরিষ্কার করে, বরাট আপনাকে চাকরির কথা বলেছে কী ?

হ্যাঁ।

এ্যাকটনের ইণ্ডিয়া অফিসের একাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টে একটা চাকরি খালি আছে। আমি কথা বলেছি ডি. সুজার সঙ্গে। কাল যদি সম্ভব হয়, দেখা করতে গেলে ভাল হয়।

যাব। কোথায় কেমন করে যাব বলে দিন।

চৌধুরী বলে দিল। বলল, মাইনে বিশেষ দেবে না এখন, সাত পাউণ্ড খানেক। বলল এমন ভাবে যেন কম মাইনে দেওয়া তারই অপরাধ।

সবিতা এতক্ষণে একটু হাসল, চাকরি যে পাচ্ছি, এই যথেষ্ট।

চৌধুরী বা ব্যানার্জী আর কোন কথা বলার চেষ্টা করল না। নামিয়ে দেবার সময় শুধু বলল, চিন্তা করবেন না, ভাল হয়ে উঠবে।

ডি. সুজা, এদেশে বসবাস করছে পনেরো বছর হল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আমল থেকে।

কাজে এবং কথায় চটপটে।

সবিতাকে দেখেই বলল, বেশ আপনি পরের সোমবার থেকে কাজ আরম্ভ করুন। সাড়ে-নটা থেকে সাড়ে-পাঁচটা। কোন অসুবিধা নেই তো?

সবিতা অসুবিধার কথা বলতে গিয়ে মন বদলে বলল, না, কোন অসুবিধা নেই।

সবিতা বিরাট বিল্ডিং-এর করিডর দিয়ে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। লিফ্‌টের জন্য কোথায় টিপতে, কোথায় টিপবে, ওর ভরসা হল না।

ওর মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল, বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভালই লাগল।

বলে, অসুবিধা আছে নাকি? সুবিধাটা কোথায়?

সবিতা চিন্তা করে কূল পেল না, ফিন্সবারী পার্ক থেকে এ্যাকটনে

আসতে প্রায় ঘণ্টাখানেকের ওপরে লাগবে, মায়াকে রাখবে কোথায়, দেবেন্দ্রকে হাসপাতালে দেখতে যাবে কি করে? কখন?

ওর ভয় করছিল ডি. সুজার সঙ্গে দেখা করতে আসার আগে। ওর ধারণা ছিল, ওকে দেখেই ডি. সুজা বলে বসবে, ম্যাট্রিক পাশ করা গ্রাম্যমেয়ে চাকরি চায় ইণ্ডিয়া হাউসে? স্পর্ধা তো কম নয়!

তার যে কোন মূল্য আছে বাইরের ক্রুর পৃথিবীতে, সে যে কারুর দরকারে আসতে পারে, প্রয়োজন হলে সেও যে দেবেন্দ্রর চিন্তার কিছুটা ভার নিজে বইতে পারে এ কথা ভেবে সে আনন্দ বোধ না করে পারল না।

হঠাৎ একটা কথা মনে করে সবিতার মুখ অপমানে লাল হয়ে উঠল, ডি. সুজা নিশ্চয় ওকে দয়া করে চাকরি দিচ্ছে চৌধুরীর বন্ধুর স্ত্রী বলে।

কিন্তু অপমান বোধ করা, স্বামীর এই আকস্মিক রোগে শোকাবহ হবার বিলাস—সে তো সবিতার জন্য নয়।

তার একটি মাত্রই চিন্তা হল মায়াকে নিয়ে কি করবে? এতদিন পাশের ঘরের অর্থনীতির ছাত্র প্রদীপ মায়াকে দেখাশোনা করছিল সন্ধ্যাবেলায়।

সেদিন দেবেন্দ্রকে দেখতে গেলে সেই কথা তুলল, মায়াকে নিয়ে কি করা যায় সেই হল চিন্তা। ডে-নার্সারীতে রেখে যাওয়া ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখি না। তোমার অবশ্য খুবই কষ্ট হবে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা রোজ।

সে হবে'খন, তুমি ভেব না তো। সবিতা স্বামীকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করল, নিজে কিছুই পেল না।

সেই ছ'মাস সবিতা কিভাবে কাটাল, কিভাবে কাটাতে পেরেছিল সবিতা আজো ভেবে পায় না। তার চিন্তা করবার কোন ক্ষমতা ছিল না, সময় তো ছিলই না।

ভোর ছ'টার সময় ওঠা সেই বিশ্রী শীতে, মায়াকে উঠিয়ে খাইয়ে জামা-কাপড় পরিয়ে নিয়ে যাওয়া ডে-নার্সারীতে, অফিসের কাজ শেষ হলে সোজা দেবেন্দ্রকে দেখতে যাওয়া, তারপরে আবার মায়াকে নিয়ে ফিরতে ফিরতে প্রায় আটটা বেজে যেত। কোনরকমে ওকে খাইয়ে ঘুম পাড়ানো। দারুণ খিধেয় আর ক্লান্তিতে নিজের জন্য এক কাপ চা তৈরি করে খাবার মতোও তার ক্ষমতা থাকত না একেক দিন। কতক্ষণে বিছানায় শুয়ে ঘুমের বিশ্রামে সে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারবে সেই ছিল তার একমাত্র চিন্তা।

সবিতা ভেঙে পড়ল না, কিন্তু মায়া পড়ল।

রুথ একদিন হাসপাতালে দেখতে এসেছিল দেবেন্দ্রকে। সে ওর সামনেই সবিতাকে বললে, মায়াকে আমার কাছে দাও। মেয়েটা তো মরে যাবে টানাহ্যাঁচড়াতে।

সবিতা কথা বলতে পারল না। মাথা নাড়ল শুধু।

রুথ শক্ত করে বললে, Try to be reasonable! তোমার নিজের শরীরও ভেঙে যাচ্ছে, মায়া একেবারে বিছানায় পড়লে কোন্ দিকে কে সামলাবে?

সবিতার করুণ আবেদনের দৃষ্টি নিয়ে দেবেন্দ্রর দিকে তাকাল, যেন সে না বললেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

দেবেন্দ্র বাংলায় বলল, ওকে আপাতত দিলেই পারতে। তোমার কত কষ্ট হচ্ছে, মায়ারও শরীর ভেঙে পড়ছে।

একটা অপারেশন-এর পর দেবেন্দ্র আজকাল কথা বলতে চায় না, ওর দেহের ত্বক শুকিয়ে কুঁকড়ে আস্তে আস্তে যেন হলুদ হয়ে আসছে।

সবিতা মুখ নিচু করে জল-ভেজা গলায় বললে, আচ্ছা, তাই দেব ঠিকই বলেছ আমি স্বার্থপরের মতো কাজ করছি।

দেবেন্দ্রর চোখ বুজে এল।

সেদিন রাত্রি বেলায় সবিতা ফিরে রুথকে ফোন করে বলল, মায়াকে নিতে যেতে।

রুথ বলল, রাজ ভাষায়, তুমি মায়াকে একেবারে দিচ্ছ তো ?

রক্ত টং করে উঠে গেল সবিতার মাথায়, সে শান্ত স্বরে বলল, ও প্রশ্নই ওঠে না।

আচ্ছা ! আচ্ছা ! রুথ অধৈর্য হয়ে বললে। আমি এখনই গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সবিতা বলে উঠল, না না আজকে নয় এই রোববারে, পরশু দিন।

Alright have it your way ! রুথ টেলিফোন ছেড়ে দিল।

সবিতা মায়াকে নিয়ে বসল, তোমার বাবার বড্ড অসুখ করেছে জান তো ?

হুঁ, বাবা কবে আসবে মা ?

সেরে গেলেই আসবে। সবিতা ওর বন্ধ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, তুমি রুথ আন্টির কাছে গিয়ে কয়দিন থাক কেমন, বাবা যতদিন না ঘরে ফিরে আসে, আচ্ছা ?

আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।

শুধু কয়দিনের জন্য। সবিতা ভাবল বিরক্তিভরে, 'কয়দিন' কথাটা যেন পচে গেছে। রুথ আন্টি তোমাকে সার্কাসে নিয়ে যাবে, খেলনা দেবে।

আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না কোথাও। মায়া শান্তস্বরে ঘোষণা করে। রুথ আন্টিকে আমার ভয় লাগে।

নাও অবুঝের মতো কথা বলে না, ভয় কেন করবে ? সবিতাকে বোঝাচ্ছে কে ? সে কান্না চেপে বললে, বুঝতে পার না তোমার মা মণির কত কষ্ট হচ্ছে ! তোমাকে ঠিকমতো দেখা শোনা করতে পারি না আমি, আর সেজন্য তোমার খালি খালি অসুখ করছে। সবিতা মায়াকে বুকে চেপে বলল, তুমি আমার লক্ষ্মী সোনা বুকের ধন, তুমি তো সব বোঝ, বোঝ না ?

হু উ উ—

তবে ?

মায়া চলে গেল। সবিতার শেষ পর্যন্ত ভরসা ছিল, মায়া যাবার সময়ে এমন চীৎকার জুড়ে দেবে যে কেউ ওকে ছুঁতে সাহস পাবে না। কিন্তু মায়া ওর বাবার মতোই শিশু বয়স থেকে বুঝতে শিখেছে, অকারণে প্রতিবাদ করতে শেখেনি।

সবিতার মনে হল, ওর জীবনের শেষ সম্বল কেউ যেন কেড়ে নিয়ে গেছে। বসে বসে কাঁদার সময় কোথায়? অফিসে ছুটতে হল, ভোর না হতেই।

লণ্ডনে কি চাকুরেদের ভোর হয়? না-কি দিনের আলো তারা কখনো দেখতে পায়, বিরল বৃষ্টিহীন লাঞ্চ আওয়ার ছাড়া? বাড়ি থেকে যখন সকালে বেরোও, তখন আকাশের মুখ গোমড়া, অন্ধকার অফিসে সারাদিন ইলেকট্রিক আলোতে বসে কাজ কর, অফিস শেষ হলে বেরিয়ে এসে দেখ রাত নেমে এসেছে।

সবিতার একেক দিন মনে হত ওকে যেন কেউ সূর্যহীন বিরাট কারাগারে ছুটিয়ে মারছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। কোথায় টাকীর সূর্য-চঞ্চল নীলাকাশ, গাছের পত্রমর্মর, ইচ্ছামতী নদীর কলধ্বনি, মা তুমি কোথায়? সবিতা ছটফট করে ইচ্ছামতীর কথাই ভাবত বাসে বসে, টিউবে বসে। চারিদিকে বিচিত্র, শুভ্র শ্বেত মুখের ভাব-হীন গাম্ভীর্য, খবরের কাগজের আড়ালে ব্যক্তিহীন কালো কালো অক্ষরের হিজিবিজি দোলা, সবিতার ইচ্ছা করত, চীৎকার করে ওঠে, মিনতি করে বলে, একটা কথা বল, হাস, কাঁদ। সুড়ঙ্গপথে টিউব যেন সবিতার কাকুতির টুঁটি চেপে পৃথিবী-বিদারী শব্দে ঝম ঝম করে ছুটে চলত।

সুপ্রভাত মিঃ ডি. সুজা।

সুপ্রভাত মিসেস বরাট।

এই ফাইলটা আজ চাই কি?

হ্যাঁ। চারটার মধ্যে হলে ভাল হয়।

আরম্ভ হয়ে গেল দিনের কাজ। কোন চীৎকার, কোন বিকার, এই চার পাশের কঠিন দেয়ালের ভেতরে, আলোর নিচে সম্ভব নয়। মন শান্ত করে কাজ কর, চিন্তা করার সময় নেই, কাজ কর, মিসেস বরাট, কাজ কর। তোমার উল্টো দিকের টেবিলে মিসেস আয়ার হেসে বলছে, সুপ্রভাত, মিসেস বরাট। তুমিও হাসি ফেরত দিয়ে বল, সুপ্রভাত। নইলে তোমাকে অভদ্র ভাববে।

সুপ্রভাত! সবিতা হাসবার চেষ্টা করে বলল।

তোমার যাই হোক না কেন, কোন ক্রুটি হবার যো নেই, কেউ তোমাকে ক্ষমা কর্.ব না।

মায়াকে রুথ পাবলিক স্কুল বোর্ডিং-এ (পাবলিক স্কুল—prestige tution institution; অর্থাৎ জনসাধারণের বিদ্যা প্রতিষ্ঠান নয়!) পাঠিয়েছে।

সবিতা খুশি হবে, না রাগ করবে ভেবে পেল না।

সবিতা সজ্ঞান মনে কখনই ভাবতে চায় না যে দেবেন্দ্রর জীবনের কোন আশা নাই। সে ভেবে পেল না, তারা দুজনে যদি চাকরিও করে, মায়াকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠাবাব মতো তাদের অবস্থা কোনদিনই হবে না। সোজা কথা দাঁড়াচ্ছে, মায়াকে পাবলিক স্কুলে রাখতে হলে মণীন্দ্র সর্বোপরী রুথ-এর ওপর তাদের নির্ভর করতে হবে। সবিতা জোর করে বলল, আমি বেঁচে থাকতে মায়াকে যদি রুথ-এর হাতে দিয়ে দিই, মায়া আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না।

সবিতা সাধারণত সংসারের সমস্যার কথা দেবেন্দ্রকে বলে না। কিন্তু সে চুপ করে থাকতে না পেরে দ্বিধাভরে বলল, মায়াকে পাবলিক স্কুলে গিয়েছে।

দেবেন্দ্র আজকাল কোন বাদানুবাদের মধ্যে যেতে চায় না। বহুক্ষণ পরে চোখ অর্ধেক খুলে সে বললে, ভাল করে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে, করতে দাও। দেবেন্দ্র একটু চুপ করে থেকে আবার

বললে, আমার আর বেশিদিন নেই। শুধু দুঃখ থেকে গেল, তোমার কোন ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না।

ও কথা বোলো না। সবিতা শান্ত হবার চেষ্টা করে বললে, ডাক্তার তো বলেছে তোমার অপারেশনের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

দেবেন্দ্র কোন উত্তর দিল না।

দ্বিতীয় অপারেশনের দিন সবিতা দেরি করে অফিসে গিয়েছিল, দেবেন্দ্রকে দেখে আসার জন্য। দেবেন্দ্র শুধু বলল, তুমি সুখী হবার চেষ্টা করো সবিতা, যেভাবে তোমার মন চায়। মায়া—

দেবেন্দ্র কথা শেষ করেনি, করতে পারেনি কিংবা করতে চায়নি।

দেবেন্দ্রকে অপারেটিং থিয়েটারে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সবিতা ভেঙে পড়েছিল।

লোকসমক্ষে সেই প্রথম এবং সেই শেষ তার ভেঙে পড়া।

সিস্টার ওকে নিজের অফিসে নিয়ে গেল। কফি এনে বললে, খাও, ভাল বোধ করবে।

রোমান ক্যাথলিক আইরিশ সিস্টার, নিচু গলায় বললে, Don't give up hope! Pray to God, I shall pray for you, my dear!

সিস্টারের কথাগুলো যেন শান্তির মতো, সান্ত্বনার মতো দূর থেকে ভেসে এল সবিতার বিশৃঙ্খল মনে। সে চোখ মুছে বললে, আমাকে এবার যেতে হবে। কি ভাবে তোমাকে ধন্যবাদ দেব, জানি না সিস্টার।

Please, don't mention! ক্যাথলিক সিস্টার সবিতার দুই হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে বললে।

সবিতা বেরিয়ে এসে দেখল শচীন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে, বললে, বাড়ি যাচ্ছ?

না, অফিসে যাব ভাবছিলাম।

তুমি জান সবিতা, তোমার টাকার জন্য চাকরি করার কোন প্রয়োজন নেই।

সবিতা সে কথা এড়িয়ে বললে, আমি অফিস থেকে খবর নেব। আবার বিকেলে আসব। আপনি খেয়ে নিন গে।

শচীন্দ্র যেন একটু আহত হল, বললে বেশ তোমাদের যা খুশী কর। পরে দেখা হবে।

অফিস-ফেরত সবিতা দেখতে এল। তখনও দেবেন্দ্রর পুরোপুরি জ্ঞান হয়নি।

সবিতা চুপ করে বসে থাকল বিছানার পাশে। নার্স এসে বলল, এবার তোমার যাবার সময় হয়েছে।

দেবেন্দ্র তখনও ঘুমুচ্ছে। সবিতা বাড়ি ফিরে ফোন করল হাসপাতালে ঃ দেবেন্দ্রর জ্ঞান ফিরে এসেছিল মুহূর্তের জন্য, সে এখন ঘুমুচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই।

সবিতা বহুদিন পরে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুল, কোন দুঃস্বপ্ন ওর ঘুমকে ভয়াবহ করে তুলল না।

ফোন বেজে চলেছে। সবিতা ধড়মড় করে উঠল, সত্যিই ফোন বাজছে ; ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বেজেছে, রিসিভার তোলার আগেই সে বুঝতে পারল কি শুনবে, পুরুষের গলা···Passed away··· দূরে দূরে ভেসে গেল পুরুষ কণ্ঠ। সবিতা ফোনের রিসিভার হাতে করেই পাশের চেয়ারে বসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

শেষ হয়ে গেল সবিতার জীবনের এক অপরিপূর্ণ অধ্যায়।

সবিতাকে ঘুমে পেয়েছে। যতটুকু সময় সে জেগে থাকে মানুষের কথা, প্রশ্ন ওর মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যায়, মাথায় ঢোকে না। ঘুম আর অর্ধঘুমের স্থিতাবস্থায় দিনগুলো মহা ভারী, অর্থহীন ভাবে গড়িয়ে চলে। কেউ যদি ওকে সামনে বসে খাওয়ায় ও খায়, নইলে খায় না। মানুষ এলে ওর বিরক্ত লাগে ; কাউকে ভাল লাগে না।

তাদের অযাচিত দয়ায়, করুণায় ওর গা বমি বমি করে ওঠে। সে ইংরেজীতে বলে, leave me alone, please—

ঘরের ভারী পর্দা দিনের বেলাতেও ঢেকে রাখে জানলা; শুধু অন্ধকার বিস্মৃতি, ঘুমের অচেতন ক্লান্তি যেন সবিতার জীবনে একমাত্র কাম্য। সমাজের দাবী, সংসারের দায়িত্ব স্বীকার করতে সবিতা আর রাজী নয়।

দেশের চিঠি এলে আ-খোলা পড়ে থাকে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে প্রতিবেশী ফিরে যায়।

এক রবিবার শচীন্দ্র মায়াকে নিয়ে এল বোর্ডিং স্কুল থেকে। এই দু-এক মাসেই মায়া কত বদলে গেছে। বাংলায় কথা বলে না, দৌড়ে মা-র বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল না, মুখে আঙুল দিয়ে চোখের কোণ থেকে লক্ষ্য করতে লাগল সবিতাকে।

সবিতা যেন ওর স্থবিরতার সঙ্গে যুদ্ধ করে বহু কষ্টে বলতে পারল, মায়া, আমার কাছে আয়

মায়া এক চুল নড়ল না ওর জায়গা থেকে।

আয়—সবিতা ওর ক্ষীণ লোহার মতো ভারী শরীর নিয়ে ওঠার চেষ্টা করল। মায়া চীৎকার করে ওঠে।

প্রদীপ ছুটে এল পাশের ঘর থেকে। সবিতার চোখ থেকে দুই ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। মায়া মাকে ভুলে গেছে। নিয়ে যান আপনার ঘরে।

শচীন্দ্র ফিরে এসে দেখল সবিতা কার্পেটের ওপর এলোমেলো বেশে ঘুমিয়ে আছে। শচীন্দ্রর শব্দ পেয়ে প্রদীপ এসে বলল, মায়া আমার ঘরে। ওর বোধহয় জ্বর হয়েছে। আবোল-তাবোল বকছে।

শচীন্দ্র মায়াকে নিয়ে যাবার আগে ডাঃ চৌধুরীকে ফোন করে আনলে। ডাঃ চৌধুরী জানাল, সবিতার নার্ভাস ব্রেক্-ডাউন হয়েছে।

এগার

জীবন? হাস্যকর!

নার্ভাস ব্রেক-ডাউন! যেন শেষের ছ-মাস সবিতা ম্যারাথন রেসে দৌড়েছে, ওর দেহের সমস্ত স্নায়ু টানা তারের মতো থর থর করে কাঁপছিল, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যয়ানি। কারণ দৌড়ে তাকে পৌঁছুতেই হবে, দেবেন্দ্রর মৃত্যুতে তার শেষ টান পড়ল, সবিতা হুমড়ি খেয়ে পড়ল, উঠতে চাইল না দৌড় শেষের ক্লান্তিতে। ক্লান্তিতেই যেন মুক্তি, না-কথনেই যেন শান্তি।

বিরাটাকায়া চৌধুরী-জায়া এডি বলল, আমি দেখব সাবিটাকে। দেখি ভাল হয় কি-না? চৌধুরী-জায়া একরকম গায়ের জোরেই সবিতাকে নিয়ে এল নিজের বাড়িতে।

শচীন্দ্র অবশ্য ওর খাওয়া-পরার টাকা দিল।

চৌধুরী অল্পদিন হল গোল্ডারস্-গ্রীনে বাড়ি কিনেছে। সাজিয়েছে যত্ন করে। চৌধুরীর ছেলে ব্যরন পোস্ট অফিসে ইঞ্জিনীয়ার; ভায়ের মেয়ে অনীতা চৌধুরীর কাছে থেকে পড়ে। আরো দুজন বাসিন্দা আছে এ বাড়িতে, ব্রেজিলের রুমা, ওর বাবা চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ব্রেজিলে গিয়েছিল প্রথম মহা-যুদ্ধের সময়। আরেকটি ছেলে সমীর, দেশের চা-বাগান-মালিকের ধনী সন্তান, এখানে টি-টেস্টিং-এর ট্রেনিং নিতে এসেছে।

এই বিচিত্র পরিবেশে সবিতা একটি সুন্দর ঘরে, বেড-সিটারে তার মৌন বাসা বাঁধল।

ওর ঘর দিয়ে দেখা যায় বাগান, বার্চ গাছে দেখা-যায়-না এমন ছোট্ট ছোট্ট সবুজ পাতা ধরেছে, হাতে-কাটা ছোট্ট পুকুরের লাল নীল মাছ কিলবিল করে।

সকাল দশটা হলেই এডির ঘরে টোকা দিয়ে ব্রেক-ফাস্ট নিয়ে আসে, পর্দা সরিয়ে দেয়, গ্যাসের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বলে, সুপ্রভাত সাবিটা। জানলা দিয়ে একবার দেখ কি সুন্দর দিন করেছে। এবারের বসন্ত ভালই যাবে মনে হচ্ছে।

সবিতা চোখ পিটপিট করে তাকায়। আলো ওর চোখে লাগে। কিন্তু এডির সঙ্গে পারার যো নেই। সে উচ্চকণ্ঠে হেসে ককনী-ইংরেজীতে বলবে, We could dye for a little sun আর তুমি বলছ পর্দা টেনে দেব। যথেষ্ট ঘুম হয়েছে। খেয়ে নাও, আমার সারা রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে।

সবিতা খায় না, কাঁটা-চামচ দিয়ে খোঁটে? ফলের রস, কর্নফ্লেক্স, দুধ, বেকন, ডিম আর টমেটো ভাজা, টোস্ট মাখন আর মার্মালেড। পট ভর্তি চা। সব পড়ে থাকে ট্রেতে।

এডি পনেরো মিনিট পরে হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এসে বলে, Mother of Heaven! তুমি খাওনি! আমি এত কষ্ট করে তৈরি করে দিলাম।

কালকে খাব। সবিতা অপরাধীর মতো বলে।

মনে থাকে যেন কলকাতা থেকে পাঠানো মোটা সোনার হারে পাক দিয়ে এডি চোখ ঘুরিয়ে শাসনের স্বরে বলে, কালকে বললে চলবে না, কাল খাব।

সন্ধ্যা হলেই সাড়া জেগে ওঠে বাড়িতে। অনীতা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই ইংরেজী বাংলায় মিশিয়ে গান ধরে, নইলে রেকর্ড-প্লেয়ারে গান দেয়। রুমা ফিরে পাল্লা দিয়ে স্প্যানিশ আর শ্লাভ ভাষায় চেঁচাতে থাকে।

এডি ব্যস্ত থাকে রাত্রের খাবার তৈরি করতে। ব্যরন ফিরে এলেই খাওয়া আরম্ভ হয়। এডি সবিতার খাবার নিয়ে আসে, মাশরুমের সুপ, রোলস, স্টেক, আলু রোস্ট করা, কড়াইশুঁটি সেদ্ধ। তারপরে আমরঙা পীচ আর ক্রীম। রাত সাড়ে-দশটার সময় অনীতা

গরম জলের ব্যাগ নিয়ে আসে বিছানা গরমের জন্য, আর এক কাপ ওভালটীন। অনীতা মিষ্টি হেসে বলে, চিান ঠিক হয়েছে তো দিদি?

হ্যাঁ। ধন্যবাদ।

সমস্ত বাড়ির চঞ্চল জীবন, বাইরে বসন্ত সমাগমে প্রকৃতির ব্যস্ত আয়োজন সবিতাকে ডাক পাঠাল তার বন্ধ ঘরে, সে ডাকে সাড়া দেবার চেষ্টা করল।

একদিন সকালে এডি রান্নাঘরে সবিতার জন্য ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে, সবিতা পেছন থেকে এসে দ্বিধাভরে বলল, ভাবলাম এখানেই আমি খাব।

এডি মুখে বিস্ময় প্রকাশ করল না, হেসে বলল, বাঁচালে সাবিটা, আমার মতো মোটা মানুষ কি ওপর-নিচ এত দৌড়তে পারে, তুমিই বল?

এডি খুব হাসল। এডির মস্ত গুণ হাসিতে তার কার্পণ্য নেই।

এর পরে দেড়মাস ছিল সবিতা চৌধুরীর বাড়িতে, যেন সে সারাজীবনই এদের সঙ্গে আছে। এ বাড়ির চালচলন তার মজাই লাগত দেখতে, ওর সমস্ত জীবনের আকর্ষণ যেন পরিণত হলো এদের লক্ষ্য করা, কথা শোনা, এদের সঙ্গে হাসায়।

বেনা চৌধুরী রোজ অফিস-ফেরত দু-তিন রকমের মাছ, শাক বাজার করে নিয়ে আসে। নিয়ে এসে নিজেই রাত্রের খাওয়া রান্না করত বাঙালী কায়দায়, হলুদ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে, সর্ষের গুঁড়ো জলে মিশিয়ে! অনীতার আর এডির বিলিতি খাওয়া হয়ে গেলেও তারা দু-এক গ্রাস খেতে কখনো আপত্তি করত না।

খাবার পরে, চৌধুরী অনীতাকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে পড়াতে বসত লাউঞ্জে। রুমাও একেকদিন বই নিয়ে বসত।

এডি আর ব্যরন। মা আর ছেলে, সন্ধ্যার সময় খাওয়া শেষ করেই কিংবা খাবার প্লেট নিয়ে ব্যরনের ঘরে টেলিভিসন দেখতে বসত। সবিতা ব্যরনকে কোন দিন সন্ধ্যার সময় বেরোতে দেখেনি।

সবিতার টেলিভিসন দেখতে ভাল লাগে না; সে মায়ার জন্য কোন বোনা নয় বই নিয়ে বসত লাউঞ্জে, কোনটাই প্রায় এগোত না। কি যেন হয়েছে সবিতার, সে মন বসাতে পারে না।

রুমা আর অনীতার পড়া শেষ হলেই ওরা টেলিভিসন দেখতে দৌড়ত। চৌধুরী গল্প করত সবিতার সঙ্গে।

প্রথম প্রথম চৌধুরীই ভাঙত নিস্তব্ধতা, হয়তো বললে, দেশে যাবার কথা ভাবছেন নাকি, মিসেস বরাট?

দেশ? সবিতা ভ্রূ-কুঞ্চিত করে ভাবে, কই তার দেশে ফেরার কথা তো একবারও মনে পড়েনি। মনে পড়ল দেশের অনেক চিঠি এখনও আ-খোলা পড়ে আছে। খুলে পড়তে হবে। সে পাল্টা প্রশ্ন করল, কিছু বলার জন্যেই, বললে, আপনার তো বহুদিন হয়ে গেল, আর দেশে ফেরেননি, ফিরবেন না?

চৌধুরী ফাঁকা চুলের মাথায় হাত বুলিয়ে কয়লার ফায়ার প্লেসের দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ, প্রায় তিরিশ বছর তো হলো এদেশে আছি। চৌধুরীর ভাষায় এখনও ঢাকাই বাঙালের প্রবল টান।

গিয়েছিলাম দেশে তিন বছর আগে। বেড়াতে গিয়েছিলাম।

চৌধুরী তার দেশে বেড়াতে যাওয়ার গল্প বলতে বড় ভালবাসে। ছোট ছেলের মতো হাসিতে চৌধুরীর কুঞ্চিত কালো মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সস্নেহে বলে, প্লেন থেকে নেমে চারদিকে তাকিয়ে প্রথম মনে হলো, এ দেশের লোকেরা কি কালো!

চৌধুরী নিঃশব্দে হাসল। যেন আমি সাহেবের দেশে থেকে কতই ফরশা হয়ে গিয়েছি।

সবিতাও হাসল একটু।

চৌধুরী আবার বলতে শুরু করে, আমি কলকাতার রাস্তায়

রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। ট্রামে বাসে চড়তাম না সহজে। এত ভাল লাগত, মানুষের ভীড়, চ্যাঁচামেচি। ঝগড়া!

ভাল লাগার স্মৃতিতে চৌধুরীর চোখ ছোট হয়ে এল। ফায়ার প্লেসে খানিকটা কয়লা সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললে, একদিন চৌরঙ্গীতে হাঁটছিলাম, একটা সাত আট বছরের বাচ্চা ছেলে আমার জুতো আঁকড়ে বললে, বাবু, ভাল জুতো পালিশ।

বললাম, কত নিবি?

বাচ্চা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, দুই আনা বাবু। আয়নার মতো করে দেব।

বললাম, আচ্ছা দে।

বাচ্চার উৎসাহ যদি দেখতেন! চৌধুরী সোৎসাহে বলতে লাগল, ওই রোগা হাতে, ছেঁড়া জামা পরে, গান করতে লাগল, ইছুক দানা না কি দানা, ভুলে গিয়েছি, আর বুরুশ চালাতে লাগল।

বললাম, কিরে তোর মা বাবা নেই?

সে গান থামিয়ে যেন গানের সুরেই বললে, ওঃ সব মরে ভূত হয়ে গেছে বাবু।

আমি বললাম, থাকিস কোথায়?

এখানে-ওখানে, সবখানে, রাস্তায়—কোথায় আবার থাকব?

নাও বাবু দেখ, এবার তোমার নিজের মুখ দেখে নেন।

আমি ওকে প্রথমে দু-আনা দিলাম, তারপরে একটাকার নোট বের করে বললাম. নে।

ছোকরা এক সেকেণ্ড ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার পরেই ছোঁ মেরে নোটটা, আর জুতো পালিশের বাক্স নিয়ে ছুট, ছুট, হাঃ হা—

সবিতা তাকিয়ে দেখল চৌধুরীর চোখে জল ছল-ছল করছে।

অনীতা চা নিয়ে এসে বলল, ওর কাকাকে, বাপু দশটা বেজে গেছে।

অর্থাৎ চৌধুরীর শুতে যাবার সময় হয়েছে।

চৌধুরী তার গরম জলের ব্যাগ ভর্তি করে শুতে চলল তিন তলায়।

এডি শুতে যাবে এগারোটার সময় টেলি বন্ধ হলে। সে হেসে বলে সবিতাকে, বাপু আমাকে ছাড়া শুতে পারে না। কোথাও আমার যাবার কথা হলেই ওর মাথায় বাজ পড়ে। নানান রকমের ছুতো! Really he is comical! আমার শরীরটা মোটা হলেও গদীর মতো নরম আর গরম, শীতের দেশ কিনা—! যেন শীতের দেশ বলেই এডির গরম শরীরের অপরিহার্যতা! এডি হাসে, বলে, তুমিও শুতে যাও। গুডনাইট। গুডনাইট! সবিতা দেখল এডি থপ্-থপ্ করে উপরে উঠছে। মনে হল দেবেন্দ্রর কথা, না ওর দেহের তপ্ত আরাম দারুণ শীতেও সবিতা লণ্ডনে কোনদিন পায়নি! সে নাকি এখন বিধবা হয়েছে!

সবিতার এখন এমন হয়েছে যে ঘুম আসে না। সারারাত সে ছটফট করে বিছানায় আর ঘুম আসলেই দুঃস্বপ্ন দেখে। ডাঃ চৌধুরী একদিন এসে ওকে স্লিপিং ট্যাবলেট দিয়ে গেল।

দিন আর রাত্রির ভাগ ছিল সবিতার ভাল। দিনের বেলায় সে গল্প শুনত এডির কাছে, রাত্রি বেলায় চৌধুরীর কাছে। সবিতা দেখতে পেল স্বামী-স্ত্রীর জীবন এক নদীর দুই শাখার মতো। বেনা চৌধুরীকে বাড়িতে সবাই বাপু ডাকে। বাপু আর এডিকে আলাদা করে কোনদিন গল্প করতে দেখেনি সবিতা। কাছাকাছি বসা তো দূরের কথা!

দুজন যেন দুটো জগতে বাস করে।

এডি বলে সবিতাকে, কালকের রান্না করা ঠাণ্ডা মাংস চিবোতে-চিবোতে, এডি সব সময়েই কিছু-না-কিছু খাচ্ছে, সবিতা ওকে খুব কম সময়েই দেখেছে সকলের সঙ্গে বসে পুরো খাওয়া শেষ করতে, ও খায় আর বলে, ডাক্তার বলেছে ওজন কমাতে হবে। এডি বড় চামচ দিয়ে

বাপুর রান্না করা ডাল চাখতে চাখতে বললে, আরে বাঁচব কদিন, জীবন তো একটাই, না ছুটো? এডি চোখ গোল গোল করে জিজ্ঞাসা করে। বলে, না খেয়ে শুকিয়ে মরতে যাব কেন? I am not a fool!

এডি হাসে। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসে। নিজেকে ব্যঙ্গ করে নিজেই হাসে।

বহুকাল পরে এডির গল্প শুনে গীতি বলেছিল, বেশ খুশি হয়েই, তার মনস্তত্ত্বের থিওরী কাজে লাগাতে পেরেছে ভেবে, এই অবিরাম খাওয়ার কারণ হচ্ছে compensation বা ক্ষতিপূরণ। গীতি সোৎসাহে ব্যাখ্যা করল, সমাজ-বিচ্ছিন্ন এডির কোন মানসিক সঙ্গী ছিল না। নিজের দেশে সে বিদেশিনী, এদিকে স্বামীর মন-প্রাণ কলকাতায় পড়ে আছে—

এডি হাসি থামিয়ে একেকদিন গম্ভীর হয়ে বলত, বাপু দেশে ফিরতে চায় রিটায়ার করে। আচ্ছা বল দেখি, আমি এ বুড়োবয়সে এখন কি করে নতুন জীবন আরম্ভ করি বিদেশে। I must say this is asking too much! এডি বকে যায় একটা-না-একটা কিছু চিবোতে চিবোতে, বিয়ের পরে প্রথম নিয়ে গেলে এক কথা ছিল। কিন্তু এখন? এডি ভ্রূ কপালে নাচিয়ে বলে, No, thank you very much!

সবিতা হয়তো বলে, গেলে হয়তো ভাল লেগে যেতে পারে।

গোল চোখ আরো গোল করে এডি বলে, তুমি কি ভাবছ আমি না গিয়েই বলছি।

ওঃ, তুমি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে গিয়েছিলে বুঝি?

না, না। বাপুর দাদা এসে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল দু-মাসের জন্য।

এডি ওর গোলগাল হাত নেড়ে বলল, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। ওরা আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছে, আদর যত্ন, আর সে

কি খাওয়া। এডির চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল, বোধ করি বিগত রান্নার সুস্বাদের কথা মনে করেই।

গরমে প্রাণ যায়, কোন স্বাধীনতা নেই, এক পা নড়লেই ঝি-চাকর ছুটে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। বাইরে বেরোতে হলে দাদার অনুমতি নিতে হবে, গাড়ি নিয়ে যাবে, নিয়ে আসবে। চব্বিশ ঘণ্টা লোক ঘিরে আছে বাড়িতে, আমি কিভাবে বসি, কিভাবে খাই, পারলে বোধহয় বাথরুমেও ঢুকে দেখে আসত, আমার গায়ের রং কেমন? এডি হো-হো করে হেসে উঠল। ওর বিরাট থল থলে বুক আর পেট এক সঙ্গে ফ্রক-এর ভাঁজে ভাঁজে দুলে উঠল।

They were comical!

এডি বলে, আমি ব্রা পরতে পারি না। দম আটকে আসে। কি করব?

এডি বলে, তোমাদের দেশের বড়লোকের মেয়েরা বেঁচে থাকে কি করে বল তো? সারাদিন কোন কাজ নেই। আমি তো অথর্ব হয়ে যাব, তিন মাস ওরকম শুয়ে-বসে থাকলে। না বাপু, আমার লণ্ডনই ভাল।

সবিতা থাকাকালে কোনদিন দেখেনি চৌধুরীর বাড়িতে কোন ইংরেজ বন্ধু-বান্ধব আসতে। এডির ভাইবোন আছে, কিন্তু বিবাহ আর মৃত্যুর ঘটনা ছাড়া তাদের সঙ্গে বড় একটা যোগাযোগ, দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

অতএব এডি বাঙালি সমাজে বাস করে। যদি অবশ্য বলা যায় একে সমাজ। আসার মধ্যে ব্যানার্জী, তার স্ত্রী টোনী আর তার অপরূপ কন্যা মালা—প্রতি রবিবারে দুপুর বেলায় এসে খায়! সারা দুপুর চৌধুরী আর ব্যানার্জী মিলে দেশি রান্না করে সন্ধেবেলায় ডাইনিং টেবিলে বসে হাত দিয়ে মেখে খেয়ে কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটার সময় বাড়ি চলে যায়। এর কোন নড়চড় হয় না কোনদিন।

সেন আর তার স্ত্রী নাকি মাঝে মাঝে আসত। সবিতা শুনতে

পেল সেন-এর স্ট্রোক হয়েছে; স্ত্রী সেনকে নিয়ে দেশে ফিরে গেছে শেষ জীবন কাটাতে।

আর দু-একটি ছেলে এধার-ওধার থেকে কখনো-সখনো উড়ে আসে কিছুক্ষণের জন্য, বিশেষ করে খাবার একটু আগে। সবিতা লক্ষ্য করল এডি এদের বিশেষ পছন্দ করে না, বলল একদিন সবিতাকে, দেখ আমার বিয়ের পর থেকে যত বাঙালি ছাত্র আমার বাড়িতে এসেছে, আমি তাদের যত্ন করে খাইয়েছি। কিন্তু ওদের সব সময় মতলব হচ্ছে টাকা ধার করা; রেকর্ড আর বই ধার করা! আর একবার ধার দিলে কিছু ফিরে আসেনি। একটা ফোন করে পর্যন্ত আসবে না। যেন আমি রান্না তৈরি করে হোটেল খুলে বসে আছি! I am fed up! এত করে বাইরে গিয়ে একটা তোমার নামে ভাল কথা বলবে তা? বলবে না। A bunch of ungrateful so-called perpetual students।

এডি তার বক্তব্য শেষ করে প্লেটে মাংস তুলে চাখতে শুরু করে। হাঁক দেয়, অনীতা, চা নিয়ে যাও ওদের।

সবিতা স্বীকার না করে পারে না, সে হলেও পারত না এত করতে, তিনতলা বাড়ির পা থেকে মাথা পর্যন্ত চকচকে রাখা, এত-গুলো লোকের তদারক করে আবার অতিথি-সেবা, আর এডির মতো শরীর—না, ধন্যবাদ, আমার দ্বারা হবে না।

এডির রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। সে অনীতাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সবিতাকে বলে, দেখ একবার মেয়ের কাণ্ড, কি রকম আঁট জামা পড়েছে, বুক দুটো বেশ দেখাচ্ছে, দেখ।

অনীতা এডির বচনে অভ্যস্ত, তবু সে লজ্জা পেয়ে মুখ ভেঙিয়ে বলে, তুমি আমার গায়ে হাত দিও না, আন্টি!

এডি হাসতে হাসতে মন্তব্য করে, নীটা বড় হতে চায়। খুব শখ।

অনীতা চলে গেলে এডি শুরু করে, নীটা যখন আমাদের এখানে প্রথম এল কলকাতা থেকে পোকার মতো টিকটিক করছে, নাক দিয়ে

সর্বদা সর্দি গড়িয়ে পড়ছে, এক মাথা চুল, শক্ত করে দুটো বিনুনী বাধা, ফ্রক হাঁটুর নিচে প্রায় পা পর্যন্ত ঝুলছে ভিক্টোরীয়ান আমলের মেয়েদের মতো। Comical!

এডি হাসল অনীতার পুরনো চেহারার কথা মনে করে।

এখন সেই নীটাকে কে চিনতে পারবে? ওর বাবা মা-ই পারেনি, এক বছর আগে এসেছিল। সে আরেক কাহিনী আরেকদিন তোমাকে আমার বলতেই হবে।

সবিতার যেন ভিন্ন কোন অস্তিত্ব নেই, অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, শুধু এর কাহিনী থেকে ওর কাহিনীতে তার দোদুল্যমান গতায়াত।

বসে বসে শুনল সে একদিন অনীতার কাহিনী।

অনীতার বাবা যুদ্ধের বাজারে টাকা করেছে, যুদ্ধের পরে নিউ আলিপুরে বিরাট বাড়ি তুলেছে। কিন্তু হলে হবে কি, তার একমাত্র কন্যা বড় রুগ্ন, দুদিন স্কুলে যায় তো তিনদিন বিছানায় পড়ে থাকে। শোনা আছে ইংলণ্ডের স্বাস্থ্য ভাল; বায়ু পরিবর্তন ও আধুনিক শিক্ষায় মেয়ে যদি মানুষ হয়।

অনীতার এখন ষোল বছর বয়স, বয়সের হিসেবে নিচু ক্লাসে পড়ে, দেহ এখনও ক্ষীণ কিন্তু স্বাস্থ্যে আর জীবন-প্রাচুর্যে সে চঞ্চল। উপরন্তু কিশোরী অনীতার দেহে-মনে বিচিত্র যৌবন তার পূজার উপাচারে আস্তে আস্তে সাজিয়ে তুলছে।

অনীতার বাবা মা এসেছিল এক বছর আগে মেয়েকে দেখতে, ভাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে। মেয়ে মা বাবার কাছে যেতে চায় না। মা কেঁদে বলে, একি, নির্লজ্জ পোশাক, একি চুল বাঁধা!

অনীতা ছুটে উপরে চলে গেল নিজের ঘরে। শ্যামবাজারে বনেদী বাড়ির মেয়েদের মতো চুলে তেল দিয়ে টেনে টেনে সে এক বিরাট খোঁপা করলে পেছনে, বেনারসী শাড়ি পরল, ভারী ভারী গয়না চাপাল, মায়ের আনা আলতা পড়ল পায়ে, মোটা করে কাজল পরল চোখে,

ঘণ্টা দুয়েক পরে নেবে এল বাগানে (তখন গ্রীষ্মকাল ছিল)। ওকে দেখে আমরা হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। এডি বলল, If you would have seen her, she was highly comical!

অনীতার মা বাবা ওকে লণ্ডনে রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষা দিচ্ছে, আর আশা করে বসে আছে মেয়ে বাংলাদেশের পুরনো কাঠামোতে অচল থাকবে। তা কি হয়? মেয়ে এখন বড় হচ্ছে, বলে তার বন্ধুরা বয়ফ্রেণ্ড আনে, নাচে যায়, পার্টিতে যায়, আমি কেন যেতে পারব না? বাপুও তেমন নিজে মেমসাহেব বিবাহ করেছে, মুখে মার্কসের বিপ্লব ছাড়া কথা নেই—কিন্তু মনটা একেবারে সনাতন। আমি মাঝে-মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে পাঠিয়ে দিই, বলি যা। অল্প বয়স, আনন্দ তো একটু করবেই।

সবিতা দু-তিন বছর পরে এক শেষ-সন্ধ্যায় বিখ্যাত বা কুখ্যাত সোহো পাড়ায় ম্যাকাবার (কফিন আর কঙ্কাল সাজানো কফি হাউস) থেকে গীতির সঙ্গে বেরিয়েই মুখোমুখি পড়ল তিনটে টেডি গার্লের সামনে; সবিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, দুটি শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে একটি বাদামী রং দেখে। টাইট নীল জীন পরা, ঢোলা লাল জামা ছাপিয়ে উদ্ধত স্তনের আমন্ত্রণ।

Hallo!

Hallo!

কেমন আছেন দিদি?

সবিতার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল—অনীতা, যুদ্ধের বাজারে বড়লোক হওয়া বাবা, মেমসাহেব বিয়ে করা কাকার সনাতনী মূর্খ-শাসন বারণের উদ্ধত তাচ্ছিল্যে-ভরা প্রতিবাদ, অনীতা, ভিক্টোরীয়ান জামা পরা, নাকে সর্দি গড়ানো অনীতা!

সবিতার যতদূর মনে পড়ে সে খুশিই হয়েছিল ওকে দেখে, শুধু আশা করেছিল ওর প্রতিবাদ যেন চিরস্থায়ী হয়, উচ্ছৃঙ্খলতায় ফুরিয়ে না যায়।

কিন্তু কাহিনী এখনও শেষ হয়নি।

চৌধুরীর জন্য কষ্ট হতো অনীতার। এই ভদ্রলোক কর্মজীবনের শেষে এক একান্ত আবিষ্কার করেছেন, দেশে ফিরে যাওয়াতেই তার মুক্তি, জীবনের পরিপূর্ণতা যেন দেশের মাটিতেই অপেক্ষা করছে—

প্লেন যখন কোলকাতার কাছে আসতে লাগল, কাঁচের জানলা দিয়ে নিচে দেখলাম যেন এঁকে-রাখা নদীর দীর্ঘ রেখা, মাঠ, কুঁড়ে ঘর —অদ্ভুত চঞ্চল হয়ে উঠলাম আমি। চোখে আমার জল এসে গেল, এই বৃদ্ধ বয়সে, কিন্তু লজ্জা হলো না, মনে হলো প্লেন থেকে প্রথম নেমেই একটু মাটি তুলে নেব। আমার দেশের মাটি! স্নেহে আর মায়ায় ভরা আমার দেশের মাটি! মনে পড়ল মায়ের কথা—

চৌধুরী গলা পরিষ্কার করে ফায়ার প্লেসের দিকে চোখ রেখে বলে যেতে থাকল, যেন কাউকে বলা নয়, স্বগতোক্তি, একটু শব্দ কোথাও হলেই ভেঙে যাবে মুগ্ধ স্মৃতির মায়া রচনা। ফায়ার প্লেসের অগ্নি-শিখা মন্ত্র-মুগ্ধের মতো কথার তালে তালে আলো ছায়ায় নিঃশব্দে নৃত্য করে চলেছে। এমনকি সবিতার মতো দেশদ্রোহীর পাষাণ হৃদয়েও দেশের মাটির জন্য কোনো এক অন্তরালে দু-এক ফোঁটা কান্না ফুটে উঠত শিশির বিন্দুর মতো।

—মা বড় ব্যথা পেয়েছিলেন আমার বিয়ে করায়। ভেবেছিলাম পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবো। যাবার জন্য তৈরি হলাম। যুদ্ধ শুরু হল। মা মারা গেলেন দু-এক বছর পরে। ক্ষমা চাওয়া আর হলো না।

আমার ইচ্ছে করে দেশে ফিরে গিয়ে কোন নদীর ধারে এক গ্রামে শেষ জীবন কাটিয়ে দিই। মাছ ধরে, বাগান করে, চাষ করে। বেনা চৌধুরী একটু থামল। মানুষের তো কতই সাধ আর ইচ্ছা, তার কতটুকুই বা জীবনে পূরণ হয়?

নৃত্য-ক্লান্ত আগুন নিবে এসেছে, আরো ইন্ধন চায়, ওর ক্ষুধার শেষ নাই।

পরবর্তী জীবনে কোন ভারতীয় ছেলে। বিদেশিনী বিয়ে করতে গেলেই ওর মনে পড়েছে সেন আর চৌধুরীর কথা।

নিজেকে দিয়ে সবিতা পরে বুঝেছে এদেশে ভারতীয়রা বাস করে যেন আগাছার মতো। এদেশের সমাজে তাদের কোন স্থান নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, পুনঃ পরিজ্ঞান নেই, এক ছন্ন-ছাড়া, সঙ্কীর্ণ, গৃহাভিমুখীন দিনগত পাপক্ষয়। বিশেষ করে যারা বিদেশিনী বিয়ে করেছে, তাদের তো কথাই নেই, তাদের না-আছে এ-দেশ না-আছে নিজের দেশ। সকলেই এড়িয়ে চলে।

প্রতিভা একদিন ফোন করে সে কি কান্না! কি ব্যাপার? সেন দেশে ফিরতে চাইছে!

সবিতা তার স্খলিত ভাবাবেগকে সজাগ করার চেষ্টা করে বলতে গেল, দেশ দেশ করে লোকে এত মরে কেন? ক্যাসানোভা সেন-এর বুকে যে দেশের জন্য এত মমতা লুকিয়ে ছিল তা কে জানত। স্ট্রোক হলে, মুখে ভাষা ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রথম দাবী হলো, আমাকে দেশে নিয়ে চল।

প্রতিভা কেঁদে বললে, কি করব বলতো এডি?

এডি মুখ থেকে কাঁচা গাজর সরিয়ে নিয়ে বললে, অবস্থা যদি সেরকম হয়ে থাকে, নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? সেন-জায়া, প্রতিভার দেশে ফেরার খুব ইচ্ছা ছিল না, কারণ তার ধারণা দেশের চিকিৎসকদের অর্থ আদায়ের দিকেই ঝোঁক, রোগ সারানোর জন্য তারা চিন্তা করে না। কিন্তু স্বামীর সাধ, বলা যায় না হয়তো শেষ সাধই হবে, প্রতিভা বিলিতি ডাক্তার সমেত ডাঃ চৌধুরীর পরামর্শ নিয়ে বি. ডি. এইচ.-এর ওষুধ প্যাক করে, কোলকাতায় রিজেন্টস পার্কের একটি ছোট সুন্দর বাগান দেওয়া বাড়িতে সেনকে নিয়ে তুললে।

সূর্যের আলোতে, সবুজ ঘাসের ওপর হুইল চেয়ারে বসে সেন-এর সে কি ছোট ছেলের মতো আনন্দ। যেন সার্থক হয়েছে তার অথর্ব, অক্ষম জীবন।

দেশের মাটির দোষেই হোক কিংবা বিদেশী ডাক্তারের তত্ত্বাবধানের অভাবেই হোক, একমাস পরেই সেন-এর শরীর যেন আরো ভেঙে পড়তে লাগল।

প্রতিভা স্বামীর ভাই বোনদের অমতে প্লেনে করে স্বামীকে নিয়ে এল লণ্ডনে। তার সাতদিন পরেই সেন আরেকটি স্ট্রোকে ধরাধাম ত্যাগ করলে, দেশের মাটিতে মরার শেষ সাধ তার অপূর্ণই থেকে গেল।

চৌধুরী বলত সেনের কথা, ও গিয়ে ভালই করেছে। শেষ জীবনে অন্তত দেশ দেখে মরতে পাবে তো ?

চেকোস্লভাকিয়ান পিতার কন্যা ব্রেজেলিয়ান রুমা চৌধুরীর রাজনীতির মতে একমত হলেও, সে সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমকে তাচ্ছিল্যের নজরে বলত, বুর্জোয়া-vice !

রুমাকে সবিতার ভালই লাগত, ওর প্রাণ-প্রাচুর্য, জ্ঞান, ঔৎসুক্য, বিভিন্ন ভাষা-জ্ঞান, নৈর্ব্যক্তিক শিল্পী—রুমাকে সে প্রশংসা না করে পারত না।

রুমা নিজেকে বোহেমিয়ান বলত, লোকে তাকে তাই বললে সে খুশি হতো। চুল আঁচড়ানো, লিপস্টিক দেওয়া, জামা-কাপড়ের চাকচিক্য তার কাছে বুর্জোয়া পাপ। প্যারিস থেকে যখন ওর সাংবাদিক বয়-ফ্রেণ্ড এল বেড়াতে, রুমা বুর্জোয়া পাপে নিজেকে সামান্য প্রশ্রয় দিল, অবাক হয়ে সবিতা দেখল রুমা যে শুধু খারাপ দেখতে নয় তা নয়, সে বেশ ভালই দেখতে।

মানসিক রোগ, বি. বি. সি. আর আই. টি. ভি. টেলিভিশন প্রোগ্রামকে সে বলত, ডিকাডেন্ট, মৃত্যুমুখী বুর্জোয়া সভ্যতার নিদান।

সবিতার ইচ্ছা করত বলে, বুর্জোয়া সভ্যতা যদি এতই খারাপ হবে, তবে লণ্ডনে পড়তে আসা কেন? সবিতার কানে এসেছে, রুমা অনিতাকে বলছে, স্বামী মরেছে নিশ্চয় দুঃখের কথা। তাই বলে, মায়ের কর্তব্য, বেঁচে থাকার দায়িত্ব অস্বীকার করে ঘরে নিজেকে বন্ধ করে রাখতে হবে কেন? ওসব হচ্ছে ন্যাকামী, escapism!

শুনে সবিতার রক্ত মাথায় উঠলেও সে স্বীকার না করে পারেনি, রুমা হয়তো সত্যি কথাই বলছে, কিন্তু সবিতার ব্যথা এবং অসহায়তার পরিমাপ করার মতো মানবিক দুঃখ অনুভবের সহনশীলতা সমাজ বিপ্লবীদের কেন থাকে না? পরে চিন্তা করে সবিতা সিদ্ধান্তে এসেছে, থাকে না বলেই, স্তালিন আমলের পাশবিক নির্মমতা সমাজ-কল্যাণ আর আদর্শের নামে সোভিয়েট রাশিয়ায় সম্ভব হতে পেরেছে।

বাকী থাকল চা-বাগানের সমীর। তাকে বড় একটা বাড়িতে দেখা যায় না। ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোয়, রাত্রে ফেরে এগারোটা-বারোটার সময়। শনি-রবিবারেও সে ব্যস্ত বলে ব্রিটিশ কাউন্সিল, মজলিস, বন্ধু-বান্ধব তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

যতটুকু সময় সে বাড়িতে থাকে বেসুরে গলায় গান গেয়ে, জোরে হেসে, সকলের সঙ্গে দুচার কথা বলে, সে সকলকেই সন্তুষ্ট রাখে। চৌধুরী বলে, বড় ভাল ছেলে। এডি চোখ টিপে হেসে বলে, এত মাঞ্জা মেরে বাইরে বেরুনো হচ্ছে, আমাকে বলতে এস না, মজলিসের কচকচানি শুনতে যাচ্ছ!

সমীর হা-হা করে হাসে একটু বেশি জোরে, যাতে বিশ্বাস করে সেভাবেই বলার চেষ্টা করে, আর সে জন্য সবিতা বিশ্বাস করে না, বলে, হ্যাঁ, বাঃ, দুটোর সময় অমিয় বোসের সঙ্গে ওয়াটারলুতে দেখা করছি সেখান থেকে যাচ্ছি এ্যাডাম স্ট্রীটে মজলিসে।

এক রবিবারে, সমীর ফিরে এসে বলল, গলা নামিয়ে, দিদি, একটু সেণ্ট আছে?

আছে বোধহয় দেখছি।

এই স্কার্ফটা কিনেছি, কিরকম হয়েছে দেখুন তো?

বাঃ বেশ সুন্দর। সবিতার যদিও মনে হল রং-চড়ানো স্কার্ফে রং-এর সমন্বয় হয়নি। সে মুখ টিপে বললে, বান্ধবী বুঝি?

হ্যাঁ, সমীর গলা নামিয়ে বললে, জার্মান বান্ধবী। এদের বলবেন না, জানেন তো এরা একটু সেকেলে মতো, দেশের বাড়িতে জানিয়ে দেবে। সমীর একগাল হেসে বলল, মেয়েটি খুব ভাল, দিদি, আপনার সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দেব বাইরে।

আচ্ছা! সবিতা সমীরকে দেখে সস্নেহে না হেসে পারল না, মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত ঝক-ঝক করছে, মুখে পাউডারের উড়ো উড়ো ছাপ। ওর ইচ্ছা হলো বলে, তোমার ফরশা হবার দরকার নেই। তোমার রং বাদামী বলেই বান্ধবী তোমাকে ভালবাসে!

সমীর বেসুরো গলায় গান গাইতে গাইতে প্রস্থান করল, little do you know, how much how much I love! স্কার্ফ পকেটে পুরে।

কয়েক মাস বাদে সমীরের সঙ্গে সবিতার ইণ্ডিয়া-হাউসে দেখা হয়েছিল, নেহেরুর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল সে ছবির পাল্লায় পড়ে। ভীড়ে তারা 'হলে' ঢুকতে পারল না, পাশের ঘরে মাইকের ব্যবস্থা আছে, সেখানেও প্রচুর লোক জমায়েত হয়েছে।

সমীর কোথা থেকে পেছনে এসে বললে, দিদি আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

সবিতা হাসল, সে জানে কি কথা। সমীর ওকে অপেক্ষাকৃত ভীড়-কম জায়গায় নিয়ে রুমাল দিয়ে কপাল মুছে বললে, দিদি, I am in love! ঘোষণা করে সমীর একটু চুপ করল, যেন এই অভূতপূর্ব ঘটনার গুরুত্ব বোঝার সময় দেবার জন্যে! সমস্ত মুখে আলোর আভা

এনে বললে, আমার জীবনে যে এ ঘটনা ঘটবে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। লণ্ডনে এসে ব্রিটিশ-কাউন্সিলে, নাচের ক্লাসে তো কত মেয়ের সঙ্গেই মিশলাম, দুদিন পরে বাসী হয়ে গেছে। কিন্তু গিসলা অদ্ভুত মেয়ে, এত শান্ত, এত understanding, আমি একটু রেগে জোরে কথা বললেই, ও বলবে, আমি কালা নই, আস্তে-আস্তে কথা বল শমী। সমীর চুপ করল, ভাবাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল যেন।

সমীরের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল, সে চিন্তিত আন্তরিকতায় বললে, আমি কি করব বলুন তো দিদি? আমাকে চার সপ্তাহের মধ্যে দেশে ফিরে যেতে হবে, লিপ্টনে চাকরি পেয়েছি।

সমীর খুশি হয়ে উঠে বলল, দিদি বলুন কি করব? সমীর আবার গম্ভীর! বাড়ির অবস্থা তো জানেন?

সবিতা বলল, তুমি কি গিসলাকে কোন কথা দিয়েছ? Have you committed yourselt?

না। কথা দিই নি ঠিক। সমীর ইতস্তত করে বলল।

যদি কথা না দিয়ে থাক, তবে সবিতা বলল, যদিও সে জানে সমীর তার উপদেশ চায় না, শুধু আশ্বাস চায়, সে যা করছে ঠিকই করছে।

সবিতা বলে, তবে দেশে ফিরে যাও আপাতত। তোমাদের প্রেম যদি সত্য হয়, কিছুদিন ব্যবধানে থাকলেই বুঝতে পারবে তখন বিয়ে করতে তো কোন বাধা নেই। আর বাধা থাকলেও তাকে পেরিয়ে যাওয়ার মতো প্রেম না থাকলে বিয়ে করার তো প্রশ্নই ওঠে না। কি বল? দিদির মতো বক্তৃতা দিলাম, না? সবিতা নিজের মনে বলল, আমি যেন প্রেমের ব্যাপারে কত বড় জ্ঞানী! বেশ বিজ্ঞ হতে শিখেছি!

সমীর না হেসে গম্ভীরভাবে বললে, আপনি ঠিকই বলেছেন দিদি, তাই করব। আমি চলে গেলে কিন্তু গিসলাকে আপনার ওখানে আসতে বলব, কেমন?

বেশ তো।

নেহেরু এসে গেছেন। সবাই চেষ্টা করছে হলে যেতে, নয় হলের ওপরে ঘেরা খোলা বারান্দায় দাঁড়াতে।

ছবি বলল, বাবা, তুমি নেহেরুর বক্তৃতা শুনতে এসেছ না ডেইলী-মিররের রিপোর্টার হয়ে এসেছ, যত গুজব আর স্ক্যাণ্ডাল সংগ্রহ করতে!

সবিতা বলল, থাম বক্তৃতা শোন।

বক্তৃতার শেষে ছাত্র-ভীড়ের মুখে হতাশা নেমে এল, যা আশা করে এসেছিল তা শুনতে পেল না বলে, দুঃখময় তাচ্ছিল্যের হাসি এল কারুর ঠোঁটে। কি আশা করে এসেছিল ছাত্র-মহল?

সেই পুরনো কথা! কেউ টিপ্পনী কাটছে, দেশে ফিরে আত্মত্যাগ কর। দেশে ফিরে কম মাইনের চাকরির জন্য প্রস্তুত হও। দেশে চাকরি দিলে বা পেলে কি আর এখানে জাবর কাটি না স্কার্টের পেছনে দৌড়োয়। আত্মত্যাগ! ফুঃ, খালিপেটে আত্মত্যাগ!

সবিতা আর ছবি বেরিয়ে একটু দাঁড়াল রাস্তায়, নেহেরুর যাওয়া দেখবে বলে। নেহেরু দরজায় একটু দাঁড়ালেন। একজন বলল, ইংরেজীতে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন রে?

বোনের জন্য। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

বোন আবার কোথায় গেল?

বাংলায় উত্তর এল চটপট, নাক-পাউডার করতে গেছে।

ছবি শুনে হেসে বলল, আমাদের বাঙালি ছেলেপুলে মানুষ হলো না।। মহা ফাজিল!

গিসলা এসেছিল দেখা করতে একদিন সবিতার সঙ্গে। সত্যিই শান্ত, নম্র মেয়েটি। বলল, সে বাংলা শিখছে। সমীর ওকে দেশের ছবি পাঠিয়েছে, দেখাল সবিতাকে। একটি মুগ্ধ পূজারত হৃদয় সমীরের

মধ্যে ভারতবর্ষের বিগত ঐতিহ্য আর ঐশ্বর্যকে নিরীক্ষণ করছে। দারিদ্র্য এবং ভিন্নতর ক্রূর সত্য যদি কিছু থেকেই থাকে গিসলার অর্ধ-শিক্ষিত রোমান্টিক মনে তার অস্তিত্ব অত্যন্ত ঝাপশা, অ-প্রকট। গিসলা লাইব্রেরিতে গিয়ে ভারতবর্ষের ওপর বই নিয়ে এসে পড়ছে। বলল, আমি তো ক্লাসে যাওয়া ছাড়া বেরুই না। এক বুড়ো ইংরেজকে দেখা শোনা করে সে। বলল, তুমি আমাকে শাড়ি-পরা শিখিয়ে দাও।

দিল শিখিয়ে সবিতা। গিসলা খুব খুশি, বললে, সমীর আমাকে শাড়ি পাঠাচ্ছে।

গিসলা বলল, আমি ভাবছি এই শীতে ইণ্ডিয়ায় বেড়াতে যাব।

বাঃ! ভাল কথা তো।

গিসলা চলে গেলে সবিতা ভাবল, ব্যবধানে প্রেম মনে হচ্ছে জমেই উঠছে।

ছ-মাস পরে নিমন্ত্রণের কার্ড এল। লিপ্টন কোম্পানীর ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সবিতাকে গিসলা সমীরের শুভ-বিবাহের সম্বর্ধনায়।

সবিতা আনন্দিত হলো। একটু অবাক হলো, কারণ সে আশা করেনি সমীর পিতৃ-ধন আর সমাজ-অনুশাসন উপেক্ষা করে বিয়ে করতে পারবে। ওকে তার দুর্বলচরিত্র বলেই মনে হয়েছিল। গিসলার সাহসেরও প্রশংসা সে না করে পারল না।

এরপরে সবিতার সঙ্গে যখন এডির সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে তার বিরাট দেহ দুলিয়ে ভ্রূ কপালে তুলে হেসে মন্তব্য করল, Would you believe it? Wasn't he comical? না সে মজলিসে যাচ্ছে!

এডির কাছে সব কিছুই হাস্যকর, কমিক্যাল!

ব্যানার্জীর স্ত্রী টৌনীর সঙ্গে গল্প হতো, যখন একঘরে টি. ভি. আরেক ঘরে রাজনীতির তর্কের আসর বসেছে।

টৌনীর স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যের দিকে নজর আছে, মধ্যবয়সেও দেহের

বাঁধন নষ্ট হয়নি। সে তার একমাত্র কন্যা মালার গল্প বলে, গল্প বলে নিজের।

মালাকে যেন সৃষ্টিকর্তা নিজে হাতে বহু যত্ন আর আদর করে গড়েছেন। সবিতার চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না। সৌন্দর্য যে উপহার, সুন্দর ফুলের মতো বিকাশেই মানুষের মনস্তুষ্টি, সবিতা ওকে দেখে বিশ্বাস না করে পারে না।

ওর মনে মায়ার মিষ্টি গম্ভীর মুখ ভেসে ওঠে—মায়াও একদিন বড় হতে থাকবে, আর ফুলের মতো পাপড়ি মেলে ধরবে।

এই মালাকেই সে দেড় বছর পরে দেখেছে, পনেরো বছরের মেয়ে হাইহিল পরে, চুল ছেঁটে, ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়ে, চোখে মাসাকারা, চোখের পাতায় সবুজ আভা যেন সৃষ্টিকর্তার যত্নের মূর্তিমান ব্যঙ্গ। পনেরো বছরের মেয়ে যদি পঁচিশ বছরের মতো সফিস্টিকেটড লেডি সেজে বিচরণ করতে চায় তবে তা সত্যিই দুঃখজনকভাবে কমিক্যাল।

টোনী বলে, মালার খুব ব্যালে-নৃত্যের দিকে ঝোঁক ছিল। এগারো বছর বয়সে, এলেভেন-ক্লাশে স্কলারশিপ দেবার কথা হচ্ছিল রয়েল একাডেমীতে ব্যালের জন্যে!

কিন্তু আমরা চিন্তা করে দেখলাম, লেখাপড়া না হলে ওর কিছু হবে না, আমার মেয়ে শূন্য-মস্তিষ্ক নর্তকী হবে, সে আমি সইতে পারব না। এখন ওর বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক হয়েছে, বলছে, ডাক্তারী পড়বে। আমেরিকায় যাবার জন্য পাগল।

টোনী বলে নিজের কথা, We were the happiest couple in London. প্রতিভা কোথা থেকে এল, বিষিয়ে দিল আমার স্বামীর মন।

বিয়ের পরে বহু বাঙালী ছাত্র আমাদের বাড়ি আসত। আমি তাদের আদর-যত্ন করতাম ওর দেশের লোক বলেই, ভাবতাম ও খুশি হবে। ও খুশি হতো। প্রতিভা তো দেশে কোনদিন ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা দেখেনি, কোন মেয়ে যে অন্যায় না করেও ছেলেদের সঙ্গে

স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে, তা ওর ধারণার বাইরে। I realise she is a frustrated woman! জানই তো প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ও আবার স্বামীকে ফিরে পেয়েছে! সে যাই হোক, আমার পেছনে কেন বাপু?

আমাদের পাড়ায় একটি ছাত্র থাকত, সে আমাকে বাংলায় বৌদি বলে ডাকত, একদিন ফোন করে বলল, ওর বড্ড জ্বর হয়েছে। আমি দয়া করে দেখতে আসব কি? আমিও গেলাম কিছু ফল কিনে নিয়ে। দেখলাম সত্যিই খুব জ্বর হয়েছে, ডাক্তার এসে বলল, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। আমি ওকে সন্ধ্যেবেলা খাইয়ে বেরোতেই পড়বি তো পড় বাঘের মুখে। প্রতিভা বলল, কোথায় এখানে? বললাম ওকে, কেন এসেছি।

তখন বুঝতে পারিনি সে আমাকে বিশ্বাস করেনি।

বাড়ি ফিরে দেখি ব্যানার্জী তখনও ফিরে আসেনি। আমি ভাবলাম ভালই হয়েছে, রান্না করার সময় পাওয়া যাবে।

রান্না করছি শব্দ পেলাম ও এসেছে, ডেকে বললাম, ডারলিং আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই খাবার তৈরি হয়ে যাবে। আমি—

কথা শেষ করতে পারলাম না। বললে বিশ্বাস করবে না, ব্যানার্জী কোন কথা না বলে রান্নাঘরে ঢুকেই আমার কথা না শুনে আমার গালে কষে এক চড়।

সে বহু বছর আগেকার স্মৃতি মনে করে টোনীর মুখ লাল হয়ে উঠল। দুঃখের ছায়ায় মুখ কালো করে বলল, সেইদিন থেকে আর কোন ছাত্র আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ পায়নি। এত বয়স হয়েছে তবু ও আমাকে এখনও বিশ্বাস করে না। এসেই আগেই খবর করবে, কোথাও বেরিয়েছিলাম কি না, বেরোলে কোথায় গিয়েছিলাম। ফোন করে দশবার খবর নেবে, বাড়িতে আছি কিনা!

অন্য সবদিকে ও এত ভাল, শুধু ওই একটা দোষের জন্য, প্রতিভাকে আমি কোনদিনও ক্ষমা করতে পারব না। Although, I bear no ill wishes against her!

এ বাড়িতে আসি, আর দু-এক সময়ে সিনেমা দেখতে যাই, এই হচ্ছে আমাদের জীবন ! সমাজ !

অবশ্য বলতে পার এডির অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। ও এত পার্টিতে যেতে, হৈ হৈ করতে ভালবাসত, বাপু ওকে কোথাও নিয়ে যায় না। টি. ভি. ছাড়া গতি কী ?

সবিতা হয়তো কখনো জিজ্ঞাসা করত, তোমার ভারতে যেতে ইচ্ছে করে না, টোনী ?

টোনী বলত, মেয়ে ছাড়া আমার জীবনে একমাত্র উচ্চাশা হচ্ছে ভারতবর্ষ বেরিয়ে আসা। এদিকে থেকে ব্যানার্জী খুব চাপা, কিন্তু আমি জানি ও অন্তত একবার দেশ দেখে আসতে চায়।

এর কয়েক বছর পরে সবিতা ইণ্ডিয়া হাউসের সামনে দিয়ে কি কাজে যাচ্ছিল, ব্যানার্জী হৈ হৈ করে থামাল, জানেন মিসেস বরাট আমি দেশে যাচ্ছি।

সত্যি, ফিরে যাচ্ছেন ?

না, না, বেড়াতে যাচ্ছি টোনীকে নিয়ে। এতদিন ধরে টাকা জমিয়েছি, ছুটি জমিয়েছি। মেয়ে বড় হয়েছে, ওকে হস্টেলে রেখে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে আসব। ব্যানার্জীর চোখে-মুখে-দেহে তারুণ্যের উৎসাহ আর উদ্দীপনা।

সবিতা অবাক হয়ে দেখল আর খুশি হয়ে বলল, খুব খুশি হলাম শুনে। দেশে ভাই বোনের সঙ্গে দেখা হবে এতদিন পরে।

ব্যানার্জী হাত উল্টে হাসি মুখেই বললে, না আমার কেউ কোন দিন নেই। মা বাবা সেই ছোটবেলায় মারা গেছে। এক দূর সম্পর্কের খুড়তুতো ভাই হয়তো আছে, তাকে চিঠি লিখেছি।

সবিতার জানতে ইচ্ছে করল, কেউ নেই তো ব্যানার্জী বিলেতে এসেছিল কি করে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। ব্যানার্জী প্রায় নাচতে নাচতেই ইণ্ডিয়া হাউসে ফিরে গেল। সবিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আর ভাবল, কবে তাকে এভাবে দেশ ডাক দেবে ?

হ্যাঁ টি. ভি. ছাড়া আর গতি কি? টি. ভি.'তে হয়তো এডি দেখল কোন নাটক, বুড়ো বয়সে দেশে মা বাবার কি দুর্দশা হয় তা নিয়ে।

এডি ব্যরনকে বুকে জড়িয়ে আদর করে বলে, একটু সত্য আতঙ্কে, ঠাট্টার ছলে, হে স্বর্গের মাতা, আমারও তো বুড়ো বয়সে এ দশা হবে।

ব্যরন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মার হাত ধরে আন্তরিকভাবেই প্রতিজ্ঞা করে, আমি তোমাকে কোনদিন ছেড়ে যাব না, মা। তুমি দুশ্চিন্তা কর না।

এডি হয়তো খাবার টেবিলে বলল, বাপু তুমি আমাকে ছেড়ে দেশে চলে গেলেও, আমার ছেলে আমাকে ত্যাগ করবে না। এডি আদর করে পোষা কুকুরের মতো গা ঝাড়া দিতে থাকে। ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলে, My sweety little, beauty little, funny little boy! Isn't he comical, Sabita?

ব্যরন মুচকি হেসে মাথা নিচু করে খেয়ে যায়।

এডি সবিতাকে বলে, কত বলি বেরো, মেয়েদের সঙ্গে মেশ, বিয়ে তো করতে হবে। তা ছেলে শুনবে না। বলে কিনা ইংরেজ মেয়ে ভাল লাগে না। আরে তোর মা তবে কি? বলে, ইউরোপীয়ান মেয়ে বিয়ে করলে নাকি মাকে ছেড়ে যেতে হবে। পাগল ছেলে! এডির মুখে সব স্নেহ ঝরে পড়ে, বলে, মা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে না-কি, মাকে নিয়ে জীবন কাটে? Isn't he comical!

এডি জীবন আর মানুষ সম্বন্ধে একমাত্র সত্য-সিদ্ধান্ত সর্বশেষে প্রকাশ করে থামে: সুখ-দুঃখ সব কথার পরে, হাস্যকর! Comical!

বার

সবিতার সিদ্ধান্ত

এডি একদিন তার বিরল অ-হাস্যকর মুহূর্তে তার নিজের জীবন-দর্শন ব্যক্ত করছিল।

দেখ প্রতি মানুষেরই সমস্যা আছে, দুঃখ আছে। ভেবে দেখতে গেলে বেঁচে থাকা এমন কিছু লোভনীয় নয়। তবু জীবন যতক্ষণ আছে, বেঁচে থাকতে হবে এবং তোমার যা আছে তা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে, whether you like it or not, সুতরাং make the best of it!

এডি ঠাণ্ডা সসেজে কামড় দিয়ে বক্তব্য শেষ করেছে।

সবিতার মুখে দেবেন্দ্রর কথা শোনেনি কেউ চৌধুরী বাড়িতে। ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা এদেশে অভদ্রতা। তবু এডি মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছে ঘুরিয়ে সবিতার দুঃখের মূলে আসতে। হয়তো আরম্ভ করেছে, আজকে কাগজে পড়েছ, ক্যান্সারে কত লোক মারা যাচ্ছে এ দেশে?

সবিতা মুখ লাল করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে নয় ছুতো করে উঠে গেছে ঘর থেকে।

শচীন্দ্র সবিতাকে ফোন করে একদিন বলল, মায়াকে দেখতে যাবে? আমি যাব এই রোববার।

যাব। সবিতা ছোট্ট করে বলল।

বেশ তৈরি থেকো। দশটার সময় তোমাকে তুলে নেব'খন।

বোর্ডিংয়ে হাউস-মাদার বা গৃহ-মাতা তাদের বসবার ঘরে বসিয়ে বলল, বসুন, মায়াকে ডেকে দিচ্ছি।

মায়া ঘরে ঢুকে মাকে দেখে দরজার কোণায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সবিতা উঠে এসে মায়াকে কোলে নিল। শচীন্দ্র বলল, তোমরা গল্প কর, আমি একটু ঘুরে আসছি।

সবিতার বুকে কান্না ফুলে উঠতে লাগল। সে কান্না চেপে গলা ঝেড়ে হেসে বললে, বাব্বা আমার মায়া কত বড় হয়ে গেছে।

মায়া কোন উত্তর দিল না। মায়ের কোলে সে কাঠের পুতুলের মতো বসে থাকল।

মায়া তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

মায়া মাথা নেড়ে জানাল, বলবে সে।

তোমার এখানে ভাল লাগে?

মায়া ইংরেজীতে উত্তর দিল, ভাল লাগে।

আমি যদি নিয়ে যাই আমার সঙ্গে থাকবে তো?

তুমি আমাকে চাও? মায়া চোখ বড় বড় করে বলল।

সবিতা মায়ার গালে গাল রেখে বললে, তোমাকে চাইব না তো কাকে চাইব আমি? তুমি তো আমার সব, মায়া?

মায়া বলল, আমার বন্ধু বলেছে বাবা মাটির তলায় ঘুমুচ্ছে। সত্যি নাকি মা?

সবিতা শুধু মাথা নাড়ল। একটুক্ষণ পরে বললে, তুমি কি বাংলা বলতে ভুলে গেছ মায়া?

হ্যাঁ, মা।

শচীন্দ্র ফেরার পথে ড্রাইভ করতে করতে বলল, তুমি কি করবে কিছু ঠিক করেছ কি, সবিতা?

ভাবছি, কি করব!

শচীন্দ্র বলল, আমার ইচ্ছা নয়, মায়া বোর্ডিং স্কুলে পড়াশুনো করে। আমার মনে হয় তুমি যদি মায়াকে নিয়ে দেশে ফিরে যাও, সবদিক থেকে সেটাই ভাল হবে।

দেশে? দেশে আমাকে কে চাকরি দেবে?

চাকরির কথা কে বলছে? শচীন্দ্র বিরক্ত হয়ে বললে, চাকরি করার তো তোমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি অবনের বাড়িতে থাকতে পার। আমি কথা দিচ্ছি আজীবন তোমাকে একশ টাকা করে পাঠাব।

অবন হচ্ছে সবিতার দেওর, ইঞ্জিনীয়ার। সবিতা কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। সে বললে, আমি ভেবে দেখব দাদা।

ভেবে দেখবে? অর্থাৎ এর মধ্যে ভাববার আবার কি আছে? আচ্ছা ভাব।

শচীন্দ্র বলল, দেবেন্দ্র বেঁচে থাকলে, মায়ার শিক্ষা নিয়ে সমস্যা হতো না। দেবেন্দ্র ওকে ভারতীয় ঐতিহ্যে শিক্ষা দিত। কিন্তু এখন মায়ার বোর্ডিং স্কুলে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তার ফলে এই হবে যে সে মাতৃভাষা ভুলে যাবে, যা এখনই গেছে, নিজের দেশের প্রতি কোন টান থাকবে না। বড় হয়ে মায়া বিলেতে পড়তে নিশ্চয় আসবে, আমি তো এখানেই থাকব। কিন্তু এই শিশু বয়সেই সে নষ্ট হয়ে যাবে—তা হতে দেওয়া চলে না।

তুমি ভেবে দেখে আমাকে জানিও। আমি জানি তুমি দেশেই সুখী হতে পারবে।

সবিতা শুধু নিজের মনে হেসে বলল, সুখ? সুখ কাকে বলে?

সবিতা সেদিন বাড়িতে ঢুকেই চৌধুরীকে খুঁজে বার করল। সে ডেইলী ওয়ার্কার পড়ছিল। চৌধুরী নিয়মিত কমিউনিস্ট মুখপত্র ডেইলী ওয়ার্কার আর লেবার মান্থলী রাখে এবং বাড়ির মধ্যে বাপু নিজেই তার একনিষ্ঠ এবং একমাত্র পাঠক। সবিতা হেসে ভাবে ইণ্ডিয়ান হাইকমিশনার জানলে আর চৌধুরীর চাকরি থাকবে না।

চৌধুরী সবিতাকে দেখে বললে, এই যে আসুন। মায়া কেমন আছে?

ভাল আছে। আপনাকে ক'দিন ধরেই ভাবছিলাম একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

কি বলুন।

আমার পুরনো চাকরিতে ফিরে যাবার কি কোন সম্ভাবনা আছে?

আমার মনে হয়, আছে। চৌধুরী টাকে হাত বুলিয়ে বলল, আপনি যখন মানে—চৌধুরী কথা খুঁজে পেয়ে বলল, কাজে যাওয়া বন্ধ করেছেন, তখন ডি. সুজা আমাকে বলেছিল, ও টেম্পরারী কাউকে রাখবে আপনার ফিরে না আসা পর্যন্ত।

তাহলে কাল গিয়ে আমি দেখা করতে পারি?

অথবা ফোন করতে পারেন।

না না, দেখা করাই ভাল। সবিতা বলল।

সবিতা নিজের ঘরে গিয়ে, দেবেন্দ্র মারা যাবার পরে এই প্রথম দেশের, আর লণ্ডনের চিঠিপত্র খুলে বসল। ভাই বোনেরা সকলেই সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখেছে, কিন্তু সাবধানে ঘুরিয়ে জানিয়েছে যেন বিধবা বোন তার মেয়ে সুদ্ধ ঘাড়ে এসে না চাপে।

মা-বাবা লিখেছেন, বিধাতা কেন আমাদের প্রতি এত অপ্রসন্ন হইলেন, বিধাতাই জানেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করা ব্যতীত আর কি গত্যন্তর আছে।

ভগবানে বিশ্বাস রাখ, ধর্মপথ ছাড়িও না—শান্তি পাইবে। ভুলিও না পবিত্র জীবন তোমার কাম্য। হিন্দু নারীর ঐতিহ্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাইবে।

আমাদের মনে হয়, তুমি যদি তোমার কন্যাকে লইয়া এই দরিদ্র কুটিরে থাক তবে সবদিক হইতেই ভাল হইবে।

ইতিমধ্যে ভগবৎ গীতা পাঠাইলাম, প্রত্যহ পড়িবে। দেবেন্দ্রর

আত্মা যেন শান্তি পায় এই প্রার্থনা করি। ভগবান তোমাকে শান্তি দিন।

সবিতা পড়ে দেখল মা-বাবার পর পর কয়েকটি চিঠিতেই মোটা-মুটি এক কথা। কবে সবিতা ফিরে আসছে? সবিতার চোখে একটু জল এসে গেল ঃ মা বাবা সব সত্ত্বেও তাকে ফিরে চায়! ভগবৎ গীতার লাল মলাটের দিকে সে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। চোখ তুলে নিতেই তার মনে হলো ঘরটাও যেন গোলাপী হয়ে গেছে!

দেশে ফিরে যাবে—ফেলে-আসা সেই ক্ষুদ্র গ্রামে, তার অন্ধকারে, তার অসম্পূর্ণ জীবনের পরিক্রমা শেষ হবে! মায়াও তার মতো সেই সঙ্কীর্ণ পরিধিতে বড় হয়ে উঠবে; তারই মতো পঙ্গু, অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে—সে সবিতা কল্পনাও করতে পারে না। তার জীবনে যাই হোক মায়াকে তার অভিশাপের ভাগী হতে সে দেবে না।

অবনের বাড়ীতে থাকা যায় কি? শচীন্দ্র টাকা পাঠাবে। তার ফল কি হবে? সবিতাকে দরিদ্রা আত্মীয়ার মতো করুণা কুড়িয়ে ঘরের ঝি-গিরি করতে হবে। অবনের ছেলে-মেয়ের-স্ত্রীর সেবা করে সবসময় তার মনে হবে, মায়া ওদের সমান নয়। করুণার উৎস দু-দিনে শুকিয়ে যাবে, সবিতা দেশের আত্মীয়দের ভাল করে চেনে, দোষ দিতে পারে না। না, না, সবিতা কারুর ঘাড়ে বোঝা হতে পারে না। দেবেন্দ্রও চায়নি শেষ সময়ে দাদার সাহায্য নিতে। সবিতা তার নিজের জন্য কোন্ মুখে নেবে?

সবিতা যদি দেশে চাকরি পেত, তবে মায়াকে নিয়ে যেতে সে কিছুমাত্র দ্বিধা করত না। কিন্তু দেশে বি. এ., এম. এ. পাশেরাই ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়, আর সবিতা! ম্যাট্রিক পাশ বিলেত ফেরত বিধবা, কন্যা-সহ সবিতা!

না, সবিতা শচীন্দ্রর সাহায্য নিতে পারবে না। সবিতা মায়াকে

আনিয়ে নেবে, স্কুলে ভর্তি করে দেবে। কষ্ট করে মানুষ হোক, কিন্তু পরমুখাপেক্ষী হয়ে যেন মানুষ না হতে হয়।

ডি. সুজা জানাল, সবিতা পরের সপ্তাহ থেকে কাজে যোগ দিতে পারে।

সবিতা তারপরে গেল নিজের ফ্ল্যাটে ; এসে শুনল শচীন্দ্র ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে, তার জিনিসপত্র বেসমেণ্টের ঘরে আছে। সবিতার রাগ করারও সময় নেই।

সবিতা বাড়িআলার সঙ্গে গিয়ে দেখা করল। বাড়িআলা সাইপ্রাসের লোক, দেবেন্দ্রর সঙ্গে পরিচয় ছিল, সে বললে, দুঃখিত, তোমার ফ্ল্যাটে তো লোক এসে গেছে।

সবিতা বললে, আমার ফ্ল্যাটের দরকার নেই। যে কোন আকারের একটা ঘর যদি থাকে।

বাড়িআলা বললে, তিন তলায় একটা ছোট ঘর খালি আছে, এ্যাটিকে। আমি আরেক জনকে দেব মোটামুটি কথা দিয়েছিলাম কিন্তু আপনি যদি আসেন, তবে তো তাকে না করতেই হবে।

অশেষ ধন্যবাদ !

আপনাকে সাহায্য করতে পেরে আমি নিজেই বাধিত।

সবিতা চৌধুরী-বাড়ি ফিরে এডিকে বলল, আমি এই শনিবার আমার পুরনো বাড়িতে ফিরে যাব।

সে-কি ? এডি ইতস্তত করে বলল, দাদা (এডিও শচীন্দ্রকে দাদা বলে) ফোন করেছিল, বলল তুমি নাকি দেশে ফিরে যাচ্ছ ! দাদা বলল, কয়েক সপ্তাহ তুমি এখানে থাকতে পার কি না ! আমি বললাম, নিশ্চয় তোমাকে পেয়ে আমরা সবাই খুশি।

সবিতা নিজের কথা আগে কোনদিন বলেনি, কিন্তু আজ না বলে থাকতে পারল না, হ্যাঁ দাদার ইচ্ছা আমি দেশে ফিরি ; আমি স্থির করেছি এদেশেই থাকব।

আখরোট ভেঙে মুখে না দিয়ে, এডি আস্তে আস্তে বলল, তুমি ভাল করে ভেবে দেখেছ তো। life is difficult here, and—এডি একটু থেমে বলেই ফেলল, you might get awfully lonely, you know!

সবিতা মুখ তুলে, দুঃখের হাসি হেসে বললে, জানি মিসেস চৌধুরী। এতটা বয়স পর্যন্ত পরের দয়ায় জীবন কেটেছে, আর তাতে ফিরে যেতে মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। হয়তো ভুল করলাম। তবু জীবনে একটি মাত্র সান্ত্বনা থাকবে, ভুল করার মতো সাহস আমার একবার অন্তত হয়েছিল।

সবিতা মাথা নেড়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ বললে, Don't ask me to go back, please don't!

এডি একটু যেন অবাক হয়ে গলা নামিয়ে বললে, তুমি যা ভাল বুঝবে নিশ্চয় তা করবে। After all this is your life and you are still young!

সবিতা হেসে ক্লান্ত ভাবে বলল, আমার মনে হয় আমার একশ বছর বয়স।

এককাপ ওভালটীন খাও, আশি বছর কমে যাবে তোমার। এডি আশ্বাস দিয়ে উঠে পড়ল, ওভালটীন বানাতে।

সবিতা আজ সত্যিই ক্লান্ত, দু-মাস পরে, এত ঘুরে, চিন্তা করে, ওর নিজেকে হঠাৎ মনে হল বড় দুর্বল, অসহায়। তার সাহায্য অস্বীকার-আত্ম-ব্যর্থতা আর অপচয়েই হয়তো শেষ হবে। সকলের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো শক্তি তাকে কে দেবে? টেবিলে মাথা রেখে আধো ঘুমে সে স্বপ্ন দেখল, দেবেন্দ্র ওর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, যেমন শেষের দিকে সে দিত।

এডি ওভালটীন নিয়ে এসে দেখল, চোখ-বোজা সবিতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, শীতকালে স্নো-পড়া আবছা জানলায় বরফ গলে জল পড়ার মতো। সে আস্তে আস্তে কাপ নিয়ে বাগানে চলে

গেল, আপেল গাছের শুভ্র অফুরন্ত ফুলের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে সে আনমনাভাবে কাপে চুমুক দিয়ে বলে উঠল, নিজের মনেই ঃ এটা তোমার জন্য নয় এডি। রাক্ষুসী এডি!

দরিদ্র, করুণাগ্রাহী ব্যক্তি ধনীর দানকে উপেক্ষা করলে তার অহঙ্কারে লাগে, মনে হয় আত্মসম্মানে কেউ যেন আঘাত দিয়েছে।

সবিতা না বলাতে শচীন্দ্র প্রথম বিশ্বাস করতে পারল না, তারপরে প্রচণ্ড রাগে সে বললে, এরপরে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

এ পাপের স্থান লণ্ডনে অল্পবয়সী সবিতা তার পবিত্রতা, বংশের সুনাম বজায় রাখবে কি করে?

সবিতা হেসে ভাবলে এমন কি বিলেতবাসী নারী-হৃদয়-হন্তারক শচীন্দ্রও পবিত্রতার কথা চিন্তা করে? ছেলেরা যে যাই করে যাক, করতে থাক, বৌ যেন বংশের সুনাম রাখে!

সবিতা প্রমাণ করে দিল দেবেন্দ্রর মতোই সে তার সিদ্ধান্তে অচল থাকতে পারে।

মায়াকে নিয়ে আসার কথা যখন উঠল, শচীন্দ্র বললে, তুমি জান আমি কোনকালই এ দেশের শিক্ষার পক্ষপাতী নয়। মায়াকে বোর্ডিং স্কুলে রুথ পাঠিয়েছে, আমি পাঠাইনি।

এবারে কিন্তু ডাঃ চৌধুরী বাধা দিল; সে বললে, আপনার যা শরীর মিসেস বরাট, চাকরি করে মায়াকে সামলাতে পারবেন না। চেষ্টা করে দেখেছেন তো! দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করুন।

রুথ কিন্তু বললে, তার শুভ্র স্থূল-গ্রীবা ঊর্ধ্বে তুলে রেখে, তুমি কি করে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পার মায়াকে দেখাশোনা করতে পারবে? আর তাছাড়া দেবেন্দ্র আমাকে অনুরোধ করে গেছে মায়া যেন ভাল শিক্ষা পায়। আমি তো চিন্তাও করতে পারি না মায়া টম্ ডিক আর

হ্যারির সঙ্গে স্টেট স্কুলে পড়তে যাচ্ছে। কোন্ বাড়ি থেকে মায়া আসছে একবার চিন্তা করে দেখ।

সবিতা আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করল যে রুথ পর্যন্ত বাড়ির সুনাম সম্বন্ধে এত সচেতন। আগে কোনদিন টের পায়নি সে!

সবিতা হার মানল এখানে। সকলের বিরুদ্ধে মায়াকে নিয়ে আসার সাহস তার হলো না। ডি. সুজার বদলে অন্য যদি কেউ আসে? সে যদি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে?—চাকরি যায়?—মায়াকে তখন কে দেখবে?

এরপরে সে নিজের দুর্বলতাকে, স্বার্থপরতাকে কতই না ধিক্কার দিয়েছে।

সবিতা ভাবতে পারে না রুথের মতো মেয়েমানুষের মাতৃ-স্নেহ বলে কিছু আছে! তার মনে হয়েছে, রুথ মায়াকে নিয়েছে যাতে লোকের কাছে গর্ব করে বলতে পারে—আমার মেয়ে পাবলিক স্কুলে যায়। সমাজের সিঁড়িতে উঠতে মায়া সাহায্য করবে রুথকে। সবিতা ভাবল আর একটু লজ্জা পেল। তার মনটা বড় নীচ হয়ে গেছে, ভেবে।

সবিতা বিদায় নিল চৌধুরী-পরিবার থেকে, এই কথা দিয়ে যে নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই সে আসবে তার যখন ইচ্ছা হবে। কেন সে জানে না, তবু তার মনে হলো এ বাড়িতে আসার ইচ্ছা তার খুব আর হবে না।

দ্বিতীয় খণ্ড

"My son, here may be agony,
but not death; remember,
remember!" —Virgil.

এক

শেষের পটভূমিকা

দেশে ফিরতে গররাজী হয়ে সবিতা দেশীয় জীবন-প্রথার সত্তা বা মিথ্যা-মূল্যকে অস্বীকার করেছে অথচ দেশে-গড়া মনের ভিত নিয়ে সে লণ্ডনের জীবন-স্রোতের সুরে সুর মেলাতে পারেনি; বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, রিক্ত, বিশুদ্ধ চরিত্র একাকিত্বকে সম্বল করে। না পারল সে পার্টিতে গিয়ে ডেলিকেট শেরীর গ্লাস দু-আঙুলে ঘুরিয়ে ফ্লার্ট করতে কিংবা ইনটেলেকচুয়েলদের আসরে গিয়ে পৃথিবীর মূর্ত-বিমূর্ত সমস্যার সমাধান করতে; আরো পারল না লণ্ডনের স্বনির্বাচিত দিদি, মাসি হয়ে পাতানো ভাই-বোনদের খাইয়ে তৃপ্ত হতে, কিংবা ভগবৎগীতা হাতে মাসওয়েল হীলে রামকৃষ্ণ মিশনে ঈশ্বরগামী দৃষ্টি নিয়ে যাতায়াত করতে। সবিতা আফশোশ করে না দেশে ফিরে যায়নি বলে, সে বিশ্বাস করে না দেশে ফিরে গেলে তার জীবন এর চেয়ে কিছু বেশি সহনীয় হতো। তার মনে হয়, দুনিয়ায় কিছু লোক জন্মায় জীবন-দর্শক হয়ে। রঙ্গমঞ্চে উঠে অভিনয় করার সাধ তাদের কখনো-সখনো হয়, কিন্তু অক্ষমতার ব্যর্থতা আর অভিশাপে তারা যেন এক বিমূর্ত বেদনার অবিচল সাক্ষী হয়ে থাকে সারা জীবন।

সুখের স্বপ্ন সবিতা দেখে না। হয়তো ছেলেবেলায় দেখে থাকবে, কাঠামোবিহীন মূর্তির মতো, কথা-না জানা সঙ্গীতের সুরের মতো। সেই স্বপ্নে ঘর ছিল না, স্বামী-সন্তানের আদরে-সেবায় ভরা সংসার ছিল না। মনে হতো, লেখা পড়া শিখলে, নিজে একা টাকী থেকে বেরিয়ে পৃথিবী দেখতে পারলেই সে বুঝি খুশি হবে, সুখী হবে। পৃথিবী বলতে সে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যই কেবল ভাবেনি, সমষ্টিগত মানুষের অস্পষ্ট কিন্তু বিশিষ্ট একটি রূপও ছিল তার অস্ফুট চিন্তায়। বিয়ে

না হবার জন্য তার মনে কোনদিন দুঃখ হয়নি, দুঃখ হয়েছে মা-বাবার ভারবাহী হয়ে থাকার জন্য। বিয়ে হবার সম্ভাবনায় সে পুলকিত হয়ে ওঠেনি, কিন্তু বিয়ের পরে সে সুখের স্বপ্ন দেখেছে। তখন মনে হয়েছিল ভালবাসতে পারলেই সে সুখী হবে। মনে হয়েছিল, সে আলো চায়, জল চায়, বেদনা চায়, তবেই মাটি ফুঁড়ে তার সুপ্ত যৌবনের সাধ-ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ফুলে-ফলে-পাতায় আকাশের দিকে চেয়ে হেসে উঠবে। দর্শক অভিনেতা হতে চেয়েছিল! দেবেন্দ্রর প্রাণহীনতা, দ্বিধান্বিত দেহ-ইচ্ছার অগ্রসরের দুর্বলতায় সবিতা ছটফট করেছে, কেঁদেছে, রাগ করেছে, হাল ছেড়ে দিয়ে ভেবেছে, মায়া—সন্তানকে ভালবেসে, আদর করে, সেবা দিয়ে সে সুখী হবে।

সে মায়াও তার হাত থেকে সরে গেল। মণীন্দ্রনাথের স্ত্রী রুথ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে মায়ার উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। কিন্তু মায়া ধরা দেয়নি। আদর করতে গেলে কাঠ হয়ে গেছে। সবিতা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিয়েছে, যত কম কথা খরচ করে পারা যায়। আর বোর্ডিং, রুথ-এর দাবী মিটিয়ে কতটুকুই বা সে মায়াকে কাছে পেয়েছে? আশা করেছে, মায়া একদিন হয়তো বদলাবে, 'মা' বলে তার তৃষ্ণার্ত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সান্ত্বনা চাইবে ভালবাসা দাবী করবে।

ছবি এল, অন্তর্লীন কুয়াশা থেকে সবিতাকে জোর করে বাইরে নিয়ে এল। কুমারী কালের সখীর মতোই সে ভালবেসে ফেলল ছবিকে। বিলেতে আসার পরে এই প্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদের দরজা তার সামনে আস্তে আস্তে খুলে যেতে লাগল।

চল।

কোথায়?

টমাস বীচাম আছে রয়েল ফেস্টিভেল হলে।

দুর, আমি ওদের গান-বাজনা বুঝি না।

শুনবে চল, শুনতে শুনতেই বুঝবে, ভাল লাগবে।

থাক, আরেকদিন যাব।

উহুঁ, আজকেই আরেকদিন, চল। ছবি কথা শোনেনি।

আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।

দুঃখের দরদে নিজের জন্য ডুবে থাকলে শরীর মন কোনটাই ভাল থাকে না।

না, ছবি কোন ওজর শোনেনি। সবিতাকে যেতে হয়েছে। গিয়ে বসে মনে হয়েছে, সবাই তার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে ভাবছে—এই অজ্ঞান বাংলা দেশের গ্রামের মেয়েটা সূক্ষ্ম সফিস্টিকেটেড সঙ্গীত-অনুষ্ঠানে এসে কি করছে? কিন্তু শুনতে শুনতে সে আস্তে আস্তে নিজেকে ভুলে গেছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছে কনডাকটার-এর দেহভঙ্গী, কঞ্চির ওঠা-নামায়-রেখায়—সারি সারি বসা বাদকদের মিলিত অর্কেস্ট্রায় বেটোফেন সীম্ফনি কখনও মুখর হয়ে উঠেছে সমস্ত পৃথিবীর উর্ধ্বে, কখনও বা দীর্ঘ, কম্পিত মৃদু স্বরের একক রেশে পৃথিবীর গভীরতম বেদনা, ভাবাবেগ, চিন্তা, চঞ্চল সৃষ্টি কঞ্চির আগায় থর থর করে কেঁপেছে। সবিতা হাততালি দিতে ভুলে গেছে। সঙ্গীতের ঢেউ তার বুকে, তখনও আছড়ে পড়ছে। টিলবারি ডক-এ জাহাজ থেকে নেমেও যেমন প্রথম কিছুক্ষণ মনে হয়েছিল সে দুলছে, ডকের ব্যস্ততা, শব্দ, যেন সমুদ্রের বুক থেকে উঠে আসছে। চূড়ায়-বসা ড্রামের মৃদু কম্পন তার বুকে দুম দুম করে যেন বেজেই চলেছে।

আসতে চাইছিলে না, এখন দেখি উঠতে চাও না। হঠাৎ এক সঙ্গে সবাই কথা বলতে শুরু করেছে, সকলেই উঠে বেরোবার চেষ্টা করছে। সবিতা লজ্জা পেয়ে বললে, বাঃ, চল না।

সিনেমা, থিয়েটার, সঙ্গীত, উপন্যাস, আর্ট গ্যালারীর দরজা যেন একসঙ্গে খুলে গেল। সবিতার যেন ঘুম ভেঙে গেল, দেখতে পেল নতুন জগৎ, এ্যালিসের-এর ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড-এর মতো, ফরাসী

উপন্যাসের লিটল প্রিন্স-এর মতো। অফিস থেকে ঘরে ফেরার একাকিত্ব বাঙ্ময় হয়ে উঠল, ডস্টয়ভস্কি,' সার্ত্রে, হেমিংওয়ে, গ্রাহাম গ্রীন, হার্টলে আরও কত বিখ্যাত অখ্যাত লেখকদের চিন্তায়।

কোন একটা বই ভাল লাগলেই সে ছবিকে খুঁজে বার করত।

পড়েছ, ব্রাদার্স কারমাজফ ?

হ্যাঁ।

কি অদ্ভুত, না ?

বিস্ময়কর জীবন ! বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দিন রাত্রি কাজ, অবসর সব যেন কোথা দিয়ে চলে যেতে লাগল। শুধু ছবির সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগত, কথা বলত সে। চারপাশের আর মানুষ যেন সুন্দর সত্যের বিকৃতি। সবিতা রেকর্ড প্লেয়ার কিনল, রেকর্ড কিনল, লাইব্রেরি থেকে রেকর্ড এনে বাজাল, বাক্, ডেবুসী, বেটোফেন, চায়-কোভস্কি, স্ট্রস—ওর ছোট্ট ঘরের সস্তা ছাপা ওয়াল পেপারে ফুল ফুটিয়ে রূপে রসে গন্ধে পৃথিবী-উত্তর সুর এনে দিল সবিতার প্রাণে। কিন্তু তার আনন্দ সম্পূর্ণ হতো না যতক্ষণ ছবি তার ভাগ না নিত।

রবীন তখনও লণ্ডনে আসেনি আমেরিকা থেকে। ছবি তার মুগ্ধ ভক্তমণ্ডলীকে ঠাট্টাভরে উপেক্ষা করে সবিতার সঙ্গে বেরোত।

রবীন এল, ছবি সরে গেল খানিকটা। তারপর দেশে ফেরার সময় এসে গেল একদিন। ছবি চলে না যাওয়া পর্যন্ত সবিতা নিজেও বুঝতে পারেনি কতখানি সে নির্ভর করত তার ওপর। তিন বছর পরে আবার যেন সে দিশেহারা হয়ে গেল। আনন্দের ভাগ দিতে বা নিতে আর কারুর কাছে ছুটে যাওয়া যায় না। আর সে জন্য যেন আনন্দ তার অর্থ হারিয়ে ফেলল। সঙ্গীত, বই, ছবি এখনও তাকে সান্ত্বনা দেয় কিন্তু সেই সঙ্গে বুকের ভেতরে এক তীব্র অব্যক্ত পিপাসা জাগিয়ে তোলে। কিসের পিপাসা সবিতা ঠিক ধরতে পারে না। বই হাতে পড়ে থাকে, সুর বৃথাই কেঁদে মরে, সবিতার মন কোথায় চলে যায়। কাজে ভুল হতে থাকে।

Are you alright, Mrs Barat? বস্ জিজ্ঞাসা করে চিন্তিতভাবে।

Why, yes! সবিতা বলে।

হিসেবে বড় ভুল হচ্ছে যে!

আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আবার করে দিচ্ছি। সবিতা মাথা নিচু করে বলে।

মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়। ঘুম আসে না রাত্রে। ডাক্তারের কাছে যায়। ফ্রি ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের ডাক্তার, তার সময় কোথায়? তার সার্জারীতে তিনভাগের দু-ভাগ রুগী ভীড় করে মানসিক চাপে দেহের বিড়ম্বনা নিয়ে। পিল্ পিল্ আর পিল্! এই বুড়ো ডাক্তার যেন বিরক্ত হয়েই সার্টিফিকেট দেয় সবিতাকে: কাজে যেতে হয় না, সে শুয়ে থাকে, মনে হয় শরীরে তার এতটুকু শক্তি নেই। এক রকম না খেয়েই দিন কেটে যায়।

সেই সময়ে পূরব এল, দাবী জানাল অনেক রকমের। সবিতা সাড়া দিল। সবিতা যেন বুঝতে পারল জীবনের মূল সত্য। ভালবাসতে পারাতেই সুখ। সর্বস্ব দান করাতেই সুখ। তবে কি তার বুকের পিপাসার নাম—প্রেম? জীবন-শিল্পের সত্য সৌন্দর্য প্রেমেই সার্থক হয়ে ওঠে। কিন্তু একমুখী রাস্তায় ভালবাসা পরিপূর্ণ হতে পায় না; এক অসার্থক, অগ্নিময় জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো একই পথে চমকে চমকে ফিরে আসতে থাকে। নিবে যেতে থাকে, কমে আসতে থাকে শক্তি। পূরব বিলেতে যেন গ্রহণ করতেই এসেছে, তৃষ্ণার তার শেষ নেই; কিন্তু সে দিতে রাজী নয়, ততটুকুই রাজী যতটুকুতে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে। পূরব এসেছে, একটু আশা দিয়েছে, ইঙ্গিতে, আশ্বস্ত করেনি। হাতে চাপ দিয়েছে, সবিতা দ্বিতীয়বার চেক লিখে দিতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু সবিতাকে বুকে টেনে নেয়নি। সবিতার হাহাকার ওর চোখের পাতায়, চোখের কোলে ভারী ছায়া হয়ে থেকে গেছে।

গীতি এল নতুন দেশ থেকে, যখন ওর জীবন থেকে পূরবকে বিদায় দিতে পারলে সবিতা বাঁচে। গীতির চোখে তখনও বাঙালী মেয়ে-সুলভ একটু ভীতিবোধ, সাবধানতা, পাছে ভুল না হয়ে যায়, লোকে না ভাবে সে অসভ্য (!) দেশ থেকে আসছে। গীতি চাইল সবিতার অভিজ্ঞ সহায়, সবিতা চাইল গীতির সহানুভূতি, তারুণ্যের স্পর্শময় চঞ্চলতা।

গীতিকে দেখলে মনে হতো সে যেন কিছু থেকে পালিয়ে আসতে চাইছে, নতুনতর অর্থবোধের সন্ধান করছে। গীতি জানে না, সবিতা বহুদিন লক্ষ্য করেছে, গীতির চোখে জল টলটল করে ভরে উঠেছে। সবিতা জানতে চেয়েছে কেন কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায়নি, ক্লান্ত বোধ করেছে, কান্না সে আর সইতে পারে না।

ছবি তখন চলে গেছে। সবিতা আবার বেঁচে ওঠার চেষ্টা করল গীতিকে অবলম্বন করে। গীতিই প্রথম আরম্ভ করলে, আপনার এত কষ্টে জমানো টাকা! টাকা দেওয়া বন্ধ করুন পূরবকে।

সবিতা কয়েকমাস পরে, একদিন রাত্রে ফিরে বললে, বলে এসেছি পূরবকে।

গীতি বই থেকে চোখ তুলে হাসিমুখে বললে, কি বললেন? বিয়ে কর, তবে সব টাকা পাবে?

সবিতাও হেসে বললে, তোমার সমকালীন যুগে জন্মালে হয়তো তাই বলতাম।

কি বললেন তবে?

বললাম আর টাকা দেব না। সবিতা গম্ভীর হয়ে বললে, বললাম ওকে, গীতি বারণ করেছে আপনাকে টাকা দিতে।

গীতি খাট থেকে লাফিয়ে পড়ল, আপনি আমার নাম করেছেন?

হ্যাঁ। নিজের কথা বলতে সাহস হল না।

গীতি হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। হাত থেকে সিগারেট পড়ে গেল।

নাঃ, আপনি দেখছি আমার কলেজে যাওয়া বন্ধ করলেন।

পূরব কি বলল তা জানতে চাইলে না? বললাম যখন, খানিকক্ষণ গুম মেরে বসে থাকল। কাঁহাতক আর মুখোমুখি চুপ করে বসে থাকা যায়, আমি বললাম, উঠি। ও শুনতে পেল না, বললে, আপনার বন্ধু বাবার টাকার জোরে পড়তে এসেছে, সে কি করে বুঝবে বিত্তহীন ছাত্রদের দুরবস্থার কথা! সবিতা থামল।

গীতি উঠে বসে স্থিরদৃষ্টিতে সবিতার কথা শুনছিল। সেও একটু চুপ থেকে বললে, তা হবে।

আমি তো চ্যারিটি ফাণ্ড খুলে বসিনি। সবিতা রাগ করে বললে, পূরবের মতো অনেক ছেলেকেই তো তবে সাহায্য করতে হয়। আমার কাজ করার ক্ষমতা যখন থাকবে না, কে দেখতে আসবে আমাকে, শুনি? আসবে পূরব?

গীতি কোন কথা বললে না। গীতি ওর আট-দশ বছরের ছোট হলেও সবিতা তাকে বন্ধু বলেই মনে করত। ওর কাছে কোন কথা বলতেই সবিতার বাধত না।

গীতি হয়তো বললে, আচ্ছা, আপনার স্বামীর কথা খুব মনে পড়ে?

খুব না হলেও মনে পড়ে বৈ-কি। কখনও রাগ হয়, কখনও স্বামীর জন্য একটু দুঃখও হয়। ভালবাসতে চেয়েছিলাম, বাসতে পারিনি তবু মনে হয় ও বেঁচে থাকলে আমার বেঁচে থাকা, এত অর্থহীন, অসার্থক মনে হতো না। মানিয়ে তো একরকম নিয়েইছিলাম। অন্তত মায়াকে তো কাছে রাখতে পারতাম।

অনেকের ছেলেমেয়েই তো বোর্ডিং-এ পড়াশুনো করে। গীতি সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে হয়তো।

তা করে। তবে দায়িত্ব থাকে মা-বাবার। আমার সাধ্য নেই বছরে চার-পাঁচশো পাউণ্ড খরচ করে ওকে পড়াই। মাসে একবার দেখতে যাই, মায়া ধরা দেয় না। ছুটিতে সে যায় কাকুর কাছে। আমার কাছে বড় জোর থাকে এক সপ্তাহ কি দশদিন।

গীতি অবস্থা না জেনে বিচারের ভঙ্গীতে বলে, মায়াকে বোর্ডিং স্কুলে না দিয়ে, নিজের কাছে রেখে তো কাউন্টি কাউন্সিল স্কুলে পড়াতে পারতেন।

এ অভিযোগ যখন বাইরের লোকে করে সবিতা মুখ ফিরিয়ে চুপ করে থাকে, কিন্তু গীতির প্রশ্নের উত্তরে বলল, ইচ্ছে ছিল, সাধ্য ছিল না। নিজের রুগ্ন দেহমন নিয়ে রুগ্ন মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম না। যখন ফিরে চাইলাম তখন দাদা বললেন, মায়ার বাবা তো ওকে ওদের হাতে দিয়ে গিয়েছেন লেখাপড়া শেখাবার জন্যে। আমি কেন ওর ভবিষ্যৎ নষ্ট করব নিজের স্বার্থে? জোর করতে পারিনি। মায়ার বাবার কথা মনে পড়েছে। ওকে জোর করে নিয়ে আসলে মণি কোন সাহায্যই করত না। আমার সাত-আট পাউণ্ডের রোজগারে মেয়েকে কি খাওয়াব, কি পরাব, আমি অফিসে গেলে ওইটুকু মেয়ে একা থাকবে? আমি তো এক মুহূর্ত শান্ত হয়ে কাজ করতে পারব না।

দেশে তো ফিরে যেতে পারতেন? গীতি তবু বলে।

কোথায়? দাসীবৃত্তি করতে? নিজের ভাই নয় দেওরের কাছে। ঝিয়ের মেয়ের ছোটত্বে, অপমানে, অবহেলায় আমার মেয়ে আমার মতো অর্ধ-পঙ্গু ব্যক্তিত্ব নিয়ে বড় হয়ে উঠবে, এ আমি চিন্তায়ও সহ্য করতে পারিনি!

গীতি আর কিছু বলে না।

কথা কথা আর কথা। পুরনো মদের মতো বুকের ভার ছিপি-বন্ধ করে রেখ না। কথা বল, বুকের ভার লাঘব কর—সবিতার যখন নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল, ডাক্তার বলেছিল, কথা বল।

কথা বলে কি দুঃখের কারণের নিশানা পাওয়া যায়? নিশানা যদিও বা পাওয়া যায়, দুঃখ কি তাতে কমে? যা চাওয়া যায়, তাই পেলে কি দুঃখ থাকে না? তা হলে সবিতা সুখী নয় কেন? সবিতা

চেয়েছিল, স্বাধীন-জীবন, পৃথিবী পরিদর্শন—তা তো করেছে, করছে সে, তবে সুখ কেন হাতের মুঠো দিয়ে পালিয়ে গেল জলের মতো ?

খাও, খাতায় অঙ্ক কষ, আর ক্লান্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর, এই তো সবিতার জীবন। নিজের মূল্যহীন অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখার পরিশ্রান্ত পাপক্ষয়। কে তার বন্ধু হবে, কে তাকে সান্ত্বনা দেবে ? ইংলণ্ডের ব্যক্তি-প্রধান সমাজ, আত্ম-কেন্দ্রিক জীবন, দ্রুতগামী লণ্ডনে দাঁড়াবার সময় কোথায়—সবিতা কাকে দাঁড় করিয়ে বলবে, আমার কথা শোন। যাকে বলবে তার কথা শুনতে কি সবিতাই রাজী ? শোনা আর শোনানোতে তো সমাধান নেই। সবিতা বন্ধু পায়নি, সে তো সত্য নয়। ছবি, গীতি পড়তে এসেছে, বিশ্বসভায় তাদের আমন্ত্রণ, অজস্র তাদের উৎসাহ আর ঔৎসুক্য—তারা চলে গেছে ফিরে।

আর সবিতা ? একই পথে তার দ্রুত, ক্লান্ত গতায়াত। অতীতের সুখ-স্মৃতি নেই, যার স্বপ্ন নিয়ে সে বেঁচে থাকবে। ভবিষ্যৎ ?

মায়াকে কাছে পাওয়ার, একাত্ম করে পাওয়ার অক্লান্ত সাধ নিয়ে সবিতা বেঁচে আছে। নাকি মৃত্যুকে ডেকে আনতে ভয় পায় বলেই বেঁচে আছে ? সবিতা জানে, মায়া বড় হচ্ছে, ধীরে ধীরে আরো বড় হবে, তারপর একদিন আত্মোপলব্ধির সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে জীবন আর পৃথিবীর পরিক্রমায়। তারপর ? সবিতা আর ভাবতে চায় না। মায়া সুখী হবে। প্রিয়জনের সুখেই নিজের সুখ—এ কথাই তো প্রচলিত। সবিতা বিশ্বাস করতে চায়, যা প্রচলিত তাই সত্য !

সবিতা হয়তো জিজ্ঞাসা করত, আচ্ছা গীতি, তোমার কাছে সারাক্ষণ এত বকি তোমার boring লাগে নিশ্চয়ই।

গীতি চোখে হেসে বলত, Raw material যোগাড় করছি, উপন্যাস লিখব।

সত্যি বলছ ? সত্যি ?

হুঁ হুঁ।

ছি, ছি, লোকে কি বিশ্রী আমাকে ভাববে বলো তো ?

কে জানবে আপনি কে ? আর বিশ্রী কেন ?

সবিতা যেন সত্যিই গীতিকে বিশ্বাস করে। মুখ গম্ভীর করে বলে, তুমি যদি আগে এ কথা বলতে, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতাম না।

গীতি হেসে ফেলে, আপনি একদম ছেলেমানুষ! আমি বাংলার 'ব' লিখতে পারি না, আর উপন্যাস লিখব? -আর লিখলেই বা পড়ছে কে ?

সবিতা সন্দেহের চোখে দেখে, তারপরে হেসে ফেলে, বলে, জান গীতি, মানুষ তার নিজের জীবনের ঘটনার বিবরণ দিতে পারে, কিন্তু মনের ভেতরে, একেবারে ভেতরে যা অনুভব করা যায় নিজেও স্পষ্ট বোঝা যায় না, তাকে যেমন বলাও যায় না, সাহিত্যে রূপও দেওয়া যায় না। একমাত্র বোধহয় আর্টিস্ট কিছুটা ফুটিয়ে তুলতে পারে তার ছবিতে-রঙে-রেখায়।

আমি একবার একটি mental hospital-এ group therapy নিয়েছিলাম। আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতাম, বিশ্রীভাবে পরস্পরকে সমালোচনা করতাম, ডাক্তার শুধু বসে শুনত, ঝগড়ার মতো হয়ে উঠলে থামিয়ে দিত। বুঝতে পারতাম আমিই একা দুঃখ-সমস্যায় জর্জরিত নই। বুঝতে বা বোঝাতে পারতাম কি, সেই ভেতর-কার দুঃখের কথাটা ? ডাক্তার আমাদের ছবি আঁকতে দিত। ছবি আঁকা শেষ হলে, একেকদিন মনে হত পেয়েছি, ফুটিয়ে তুলেছি, কি বলতে চাই, কি জানাতে চাই। আমার মনে হয় কি জান—সবিতা হঠাৎ সচেতন হয়ে বলে, বাজে বকছি কি ?

না, না, আপনি বলুন। I am interested to know, মনো-বিজ্ঞান পড়ছি কিনা!

বলছিলাম, সবিতা আশ্বাস পেয়ে বলে, এই যে communication বা যোগাযোগ এর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মানুষের জীবনের মূল এবং

অকৃত্রিম সমস্যা। দেহের যৌন-ইচ্ছাই বল, আর মনের সই-পাতানোই বল, সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত—এ সবই তো সেই যোগাযোগের আকাঙ্ক্ষা থেকে।

ফ্রয়েড অবশ্য বলবে যৌন-বৃত্তি থেকে। গীতি টিপ্পনী কাটে।

সবিতা টিপ্পনী অগ্রাহ্য করে বলল, আমার জীবনে এই যোগাযোগ এসেছে বিদ্যুৎ সঞ্চারের মতো।

যেমন—?

যেদিন Victoria Embankment-এ প্রথম পূরব আমার হাতের ওপর হাত রাখল, সেই মুহূর্তে বা ইংরেজীতে যাকে বলে split second-এ মনে হয়েছিল পূরব আমার এমন জায়গায় হাত দিয়েছে, যেখানে আমার আমিত্ব সমস্ত পূরবের হয়ে গেছে। সেই অদ্ভুত মুহূর্তটি তার সঙ্গে আর কোনদিন ফিরে পাইনি, পুকুরে ঢিল ছোঁড়ার মতো তার কাঁপন যদিও আজ পর্যন্ত থামল না।

আপনি পূরবকে সত্যিই খুব ভালবাসেন, না? গীতি জিজ্ঞাসা করে নরম করে।

কি জানি! ভালবাসা কাকে বলে কোনদিন তো জানতে পাইনি। আমাকে তো কেউ কখনও ভালবাসেনি। সবিতা শুষ্ক উদাসীনভাবে বলে।

গীতি কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে যায়।

দুই

শান্ত, স্থির সরোবর

না, পুকুরে ঢিল ছোঁড়ার কাঁপন থামেনি। পূরব দেশে ফিরেছে, চিঠি দিয়েছে একটা, তারপর কত মাস চলে গেছে। সবিতা দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করেছে, নিজের কাছেও স্বীকার করতে পারেনি যে সে প্রতীক্ষা করছে পূরবের জন্য। মুখে রাগ করে বলেছে—ভণ্ড, ঠগ

টাকা ফেরত দিল না। এরাই আবার নাকি পিএইচ. ডি.। যেন পূরব পিএইচ. ডি. থিসীসে লিখেছে, টাকা ধার করিলে, ফেরত দিব।

পূরব ফেরার বছর খানেক পরে। গ্রীষ্মকালের রোদে ঝলমল-করা সুন্দর বিকেলে, বিকেল মানে রাত আটটা, সবিতা রেডিও খুলে 'বি. বি. সি.'র থার্ড প্রোগ্রাম শুনছিল কিংবা শুনছিল না। বাইরের আকাশে বাতাসে বাইরে যাওয়ার ডাক, শীত উৎরোন ক্ষণ-খামখেয়ালী আবহাওয়ার সাদর উৎফুল্ল আহ্বানে—সবিতার ইচ্ছে করছিল সাড়া দেয়, বলে, আসছি এক্ষুনি, ওগো আর একটু অপেক্ষা কর। কিন্তু একা কিছুই ভাল লাগে না। আনন্দ, ভাল লাগা, ভাল লাগার আস্বাদ কেমন যেন বিস্বাদ হয়ে যায়।

টক্, টক্, টক্, দরজায় কে টোকা দিচ্ছে। সবিতা সমাদরে ডেকে বললে, Come in please !

একটি সুন্দর তরুণ-মুখ দরজা একটু ফাঁক করে বললে, Mrs Barat, you are wanted on the phone !

Thank you ! Thank you very much indeed ! সবিতা স্বভাববিরুদ্ধভাবে লাফিয়ে উঠল। যেই ফোন করুক, তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। এই মুহূর্তে মনে হলো মানুষের সঙ্গ তার চাই-ই, মনে হলো সারা ছুনিয়ায় এর চেয়ে বেশি লোভনীয় আর কিছু হতে পারে না।

সবিতাকে আজকাল বড় একটা কেউ ডেকে দেয় না, ফোন আসলেও হয়তো বলে দেয়, হোস্টেলে নেই, বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এই মেয়েটি নতুন এসেছে, এখনও হোস্টেলের ক্ষুদ্রতায় সংক্রামিত হয়নি।

কি বিষময় শুভদৃষ্টি হয়েছিল কে জানে, হোস্টেলের ওয়ার্ডেন আর সবিতার মধ্যে, প্রথম থেকেই হিম-শীতল ব্যবহার চলে আসছিল। সবিতাকে প্রথম দেওয়া হলো ডাবল সীটেড্ রুম। সবিতার সঙ্গে ছিল আরেকটি অল্প বয়সী ইংরেজ মেয়ে, মফঃস্বল শহরে বাবা-মার আওতা

থেকে বেরিয়ে আঠারো বছর বয়সে লণ্ডনে চাকরি নিয়ে এসেছে। লণ্ডনের যুব-রাজ্য জয় করে, পছন্দ মতো বিয়ে করাই তার জীবনের একমাত্র উচ্চাশা। প্রাণ-চাঞ্চল্যে সে ভরপুর। তার কেন ভাল লাগবে জীবন-বিহীন সবিতাকে! সবিতার জন্য তার সময় কোথায়? যেটুকু সময় সে ঘরে থাকে, সাজসজ্জা করে বেরিয়ে যাবার সময় আর রাত্রে শুতে আসার সময়ে সবিতার থমথমে মুখ দেখতে তার ভাল লাগে না। সে বহু কষ্টে ওয়ার্ডেনের হাতে-পায়ে ধরে অন্য ডাবল সীটেড্ রুমে চলে গেল। তার চলে যাবার পরে আর কেউ সবিতার ঘরে আসতে চাইল না। ওয়ার্ডেনের তখনই ইচ্ছা সবিতাকে উঠিয়ে দেয়। তাই সবিতা এসে যখন বলল গীতির কথা, ওয়ার্ডেন রাজী হয়ে গেল।

গীতি এসে দেখল সবিতা বড় একটা কারুর সঙ্গে মেশে না, এবং অন্যান্য ইংরেজ ছেলেমেয়েরাও সবিতাকে সযত্নে এড়িয়ে চলে। গীতি কিছুদিন পরে হাঁপিয়ে উঠে বলল, বাব্বা, ইংরেজরা কিরকম, এত গর্ব কিসের ওদের? আমরা কালো বলে যেন মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না।

সবিতা বর্ণ বৈষম্যের প্রশ্নে কখনও উত্তেজিত হয় না। সে হেসে বললে, এরা তো বেশির ভাগই অর্ধ-শিক্ষিত, তাই কালো কুসংস্কার থাকবে, আশ্চর্য কি? এ হোস্টেলে মেশে না কেন সে দোষটা প্রথমত আমার, কারণ আমি যেচে কারুর সঙ্গে মিশতে পারি না। এখানে শতকরা নিরানব্বই জন অল্প বয়সের, ওরা বয়ফ্রেণ্ড, উইক-এণ্ড নিয়ে ব্যস্ত। ওদের ফ্রেমে আমি কোথায় আঁটব বলো? আর যারা মধ্য বয়সী কয়েকজন আছে—তারা বিয়ে না-করতে পারা কুমারী, বিধবা অথবা স্বামী-বিচ্ছেদে ভুক্ত-ভোগী, ওদের আমি এড়িয়েই চলি।

সে না হয় হলো। গীতি তবু বলে, আমি তো ওদের জানতে চাই। ওরা তো কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না।

ওটা ওদের জাতীয় চরিত্র, নিজের থেকে এসে আলাপ করে না, তুমি কথা বলো না কেন দেখবে ওরা কথা বলবে।

কিন্তু গীতি যে কারণেই হোক পারল না আলাপ জমাতে, ন' মাস পরে হোস্টেল ছেড়ে পালিয়ে বাঁচল। আবার সেই পুরোন সমস্যা। সবিতা ওয়ার্ডেনকে গিয়ে বলল, তাকে একলার ঘরে দিতে, টাকা একটু বেশি পড়বে, তা হোক, সঙ্গী না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে তো বাঁচবে।

সবিতা এল একলা ঘরে। টোনী পা খোঁড়া আইরিশ জনকে বিয়ে করে চলে গেল, সেই ঘরে। সামান্য ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই খটাখটি লাগল ওয়ার্ডেন Mrs Smith-এর সঙ্গে। মিসেস স্মিথ একদিন ডেকে সবিতাকে বললে, তোমার তো প্রায়ই সর্দি ফ্লু লেগেই আছে, ওতে আমার মেয়েদের ক্ষতি হচ্ছে। It's infectious, you know!

তোমাদের ক্লাইমেটে, সবিতা বললে—সর্দি, ফ্লু, ব্রঙ্কাইটিস তো নিত্য সঙ্গী, you will have to vacate the island to get rid of the ailments!

মিসেস স্মিথ অপমানে লাল হয়ে অগ্নিচক্ষে বললে, আমি তোমাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি তোমাকে হোস্টেল ছেড়ে দিতে হবে।

দেখা যাক। সবিতা শান্তভাবে বলে বেরিয়ে এল অফিস ঘর থেকে। ইংরেজদের মুখের ওপর কথা বলার সাহস তার এক বছর আগেও ছিল না। সাতদিন পরে লিখিত নোটিশ পেল সে, এক মাসের মধ্যে তাকে ঘর ছেড়ে যেতে হবে। না হলে necessary action will be taken—

সবিতা বিচলিত হলো। সে কোথায় যাবে? পরশ্রীকাতর বাঙালী বা ভারতীয় আড্ডা ছাড়া সে ঘর পাবে কোথায়? তাছাড়া আবার সেই নিজের জন্য সংসার করা, ভাবতেও আতঙ্ক হয়। অফিসে চন্দকে গিয়ে বলল নোটিশের কথা। সে বললে, আপনি এত অপমান সহ্য করে এদেশে থাকেন কেন? আপনার গায়ের রংটা কালো বলেই না এত হেনস্তা?

সবিতার বলতে ইচ্ছে গেল, আপনি নিজেই বা কি সম্মান বজায় রেখে কোন্ সুখে লণ্ডনের মাটি কামড়ে পড়ে আছেন কুড়ি বছর ধরে ? আর কালো ? সবিতা কালো বলে, জন্ম থেকে মা-বাবা, ভাই-বোন পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন কি মাথায় তুলে রেখেছিল ? এদেশে কালো বলে যদি হেনস্তা হয় তবে বাংলাদেশে ফরশা হলে স্বর্গের দেবদেবী বলে গণ্য করা হয় ! ভারতীয়দের মুখে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা শুনলে তার গা জ্বালা করে। সবিতা বলে, আমার পিত্তি জ্বলে যায়।

আপনার কাছে তো দেশে ফেরার উপদেশ চাইনি, সবিতা বললে। সে আজকাল আরো কাটা কাটা কথা বলে, কিছু করা যায় কি না সেটা বলুন।

চন্দ ধমক খেয়ে বললে, সেই কথাতেই তো আসছি। আপনি লণ্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে সিভিল সার্ভেন্ট, আর ওটা সিভিল সার্ভিস হোস্টেল। আপনার ডিপ্লোম্যেটিক ইমিউনিটি আছে, কোর্ট কেস বা পুলিস করে সহজে আপনাকে তাড়াতে পারবে না ? আমি একটি চিঠি ড্রাফট করে দিচ্ছি, আপনি টাইপ করে রেজিস্টার্ড পোস্টে পাঠিয়ে দিন। লিখব যে ওরা যদি আপনাকে তাড়াবার চেষ্টা করে তবে আপনি ইণ্ডিয়ান হাইকমিশনারকে ধরবেন গিয়ে। ধরবেন তো বটেই, ছেড়ে দেবেন না নিজের অধিকার। চন্দ বাঙালী-সুলভ একটি বৃহৎ ভাবযুক্ত ছোট্ট বক্তৃতা জুড়ে দিল, এই নচ্ছার জাত আমাদের ওপর তুশো বছর রাজত্ব করে যেন চাকর কিনে নিয়েছে জীবনের মতো। যখন ইচ্ছে রাখবে, না পোষালে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। আমরা কমনওয়েলথ সিটিজেন, তাড়ালেই হলো !

সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেন। সবিতা মনে মনে শুদ্ধ করে দেয় চন্দকে। সবিতা যেন এতক্ষণ কিছুই শোনেনি এভাবে বললে, আপনার সুবিধা মতো তু-একদিনের মধ্যে লিখে দেবেন দয়া করে।

চন্দ ইংরেজ-ভদ্রতা ধার করে বললে, আপনার কোন কাজে আসা —এতো আমার অতিশয় আনন্দ।

চন্দ চিঠি লিখে দিলে সবিতা টাইপ করে পোস্ট করে দিল। এর পরের সপ্তাহে ঘর ভাড়ার চেক দিতে গিয়ে দেখল মিসেস স্মিথের মুখ থমথম করছে, সুপ্রভাতের প্রত্যুত্তরও দিল না। সেই 'স্ট্যাটাস কো' এখনও চলছে। ফোন আসলে কেউ ডেকে দেয় না, তার খোঁজে যদি কেউ আসে, ওয়ার্ডেনের সামনে পড়ে গেলে বলে দেয়, বাড়ি নেই! তাই নতুন মেয়েটি যখন ফোন এসেছে বলে ডাকতে এল, সবিতা প্রায় কিশোরীর মতো লাফাতে লাফাতে, হাঁপাতে হাঁপাতে ফোন বুথে ঢুকে রিসিভার তুলে বললে, Mrs Barat speaking—

Good evening Mrs Barat! How are you?

কে? কে কথা বলছে অপর পার থেকে?

I am fine, thank you!

May I have the pleasure ot meeting you; now, right now?

কে? সবিতা আর সইতে পারল না সাসপেন্স, বলে উঠল, কে কথা বলছেন?

সে-কি, আমার গলা শুনে বুঝতে পারেননি, না, বিশ্বাস করতে পারছেন না, না-কি ভুলে গেছেন সব!

সবিতার গলার স্বর বুজে এল, সে বলতে চাইল, বুঝতে পারিনি, বুঝতে পারিনি! পূরব ফিরে এসেছে লণ্ডনে। পূরব কি সবিতার কাছে ফিরে এসেছে? পূরব কি—

কি ছেড়ে দিলেন নাকি?

না। বোবা ভাষায় সবিতা উত্তর দিল।

তবে আসুন না আপনাদের মোড়ের ইটালীয়ান কফি হাউসে, আমি ওখান থেকেই কথা বলছি।

যাচ্ছি। সবিতা বললে। আস্তে আস্তে রিসিভার রেখে সে শুধু বললে আবারঃ যাচ্ছি! পূরব ফিরে এসেছে লণ্ডনে!

হোস্টেল থেকে পথে বেরিয়ে সবিতার মনে হলো পৃথিবী সুন্দর, আমি সুন্দর, আর সুন্দর মানুষ! রাস্তা ধরে যেতে যেতে মনে হলো দুধারে গাছের পাতা রিমঝিম করছে সেই সৌন্দর্যে মদির হয়ে। সেই প্রথম ঢিল ছোঁড়ার কাঁপন দ্বিগুণ বেগে ফিরে এল সবিতার বুকে। প্রথম যেন সবিতা পূরবের মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারল না।

ভাল আছেন তো? পূরব গভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলে; সবিতার ভীরু দুর্বল হাত ঈষৎ স্পর্শ করে।

চলে যাচ্ছে, এই আর কি। সবিতা স্বাভাবিক গলায় বললে, তারপর দেশ কেমন লাগল?

ভাল লেগেছে বলতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম। পূরব সোজা-সুজি তাকিয়ে বললে, টিকতে পারলাম না। ভারতবর্ষ আর মধ্যবিত্তের জন্য নয়। এত কষ্ট করে এত আশা নিয়ে ডক্টরেট করে গেলাম, সাড়ে-তিনশো টাকা মাইনেয় স্টার্টিং।

আমাদের দেশে খরচও তো কম, তাই না? সবিতা জানতে চাইল।

খরচ অত্যন্ত বেশি। এক বিশ্রী বাড়ি পেলাম একশো পঁচাত্তর টাকায়, হাতে কি থাকল? যা খাবেন তাতেই ভেজাল। কলকাতা আরো নোংরা হয়েছে, ভীড়ে পথে হাঁটা যায় না, ট্রাম-বাসে ওঠা দুষ্কর, উঠতে পারলেও ভদ্রভাবে নামা যায় না। সর্ব জায়গায় inefficiency, মানুষগুলো অভদ্রের একশেষ।

আপনি দেখছি অভিযোগের লিস্ট নিয়ে দেশ ছেড়েছেন। সবিতা হেসে বললে।

সত্যি! পূরবও একটু হাসলে। ভাল হোক মন্দ হোক দেশ তো

নিজের, চেয়েছিলাম থাকতে। কিন্তু পেটে কিছু পড়া চাই, ভাইবোন ভাগ্নেকে মানুষ করতে হবে। আমেরিকায় Columbia Universityতে ভাল একটা অফার পেলাম, নেওয়া ছাড়া বেঁচে থাকার কোন উপায় দেখতে পেলাম না।

কে যেন কানে কানে বললে সবিতাকে, পূরব তোমার কাছে ফিরে আসেনি, তোমার কাছে সে ফিরে আসেনি সবিতা!

মা কিছু বললেন না?

মা? পূরব একটু থামল, কি বলবেন, উনি তো দেখলেন আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। এত আশা করে সব রকম কষ্ট সহ্য করেছেন। তবু ছেলে দেশে বাঁচতেও পারল না, বাঁচাতেও পারল না। পূরব থেমে গেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সবিতা ভাল করে তাকাল পূরবের দিকে। সিটিয়ে গেছে চেহারা। কালো রুগ্ন চেহারার মধ্যে শুধু দুটো কালো চোখ জ্বল জ্বল করছে চশমার ফাঁকেও।

পূরব কফি হাউসের চারদিকে তাকাল, সুন্দরী ইটালীয়ান ওয়েট্রেস, হাসিতে, কথার ভঙ্গীতে ওর কার্পণ্য নেই ইংরেজ ওয়েট্রেসের মতো। পূরব আরেক কাপ কফি চাইতে সে হেসে মিষ্টি করে বললে, I am so glad, you are enjoying your coffee!

Sure, I am! পূরব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়। চারিদিকে তাকায়, তাকিয়ে যেন আশ মেটে না। সবিতাও তাকায়। ছেলে মেয়েরা নিজের সঙ্গী নিয়ে ব্যস্ত। কারুর বা রোমান্টিক নৈকট্যে বসার দূরত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেউ বা শুধু কথা বলতে বা শুনতেই ব্যস্ত। সবিতা দেখতে পেল ওদের হোস্টেলের সব চেয়ে গ্ল্যামারাস মেয়েটিব চোখ জলে ভাসছে, ওর পাশে সুন্দর ছেলেটি হোস্টেলেরই, একটু যেন লজ্জিত। মেয়েটিকে সে সব সময় হাসতে দেখেছে, তারও বুকে যে কান্নার উৎস ছিল সবিতা জানত না। সবিতা আরেকবার অবাক হয়ে তাকাতেই মেয়েটি একটু হাসবার চেষ্টা করল! সবিতা মাথা নেড়ে

তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলে। কাউণ্টারের চারিপাশ ঘিরে বাস্কেটের ফ্রেমে ভরা কিয়াস্তির বোতলে সবুজ দীর্ঘ পাতা নরম আলোতে, তন্বী ইটালীয়ান ওয়েট্রেসের মতোই ঈষৎ দুলছে, ঈষৎ হাসছে, ঈষৎ ইশারায় মনকে ভরপুর করে তুলছে।

পূরব সেই দিকে চোখ রেখে বললে, আঃ—আরামের নিঃশ্বাসের মতো করে সে আবার বললে, আঃ! মনে হচ্ছে এতদিন পরে আবার বেঁচে উঠেছি, রাস্তায় বেরিয়েই দেখতে হবে না নোংরা ক্ষুধার্ত্ত মুখ। দেশে যখন এদের নকল করে রেস্টুরেণ্ট হয়, মনে হয় নকল ফুলের মতো সুবাসহীন প্রাণহীন মমির মাঝখানে বসে নকল আনন্দ করার চেষ্টা করছি। আর ওদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কিছুই বিসদৃশ লাগে না, ওদের প্রেম, ওদের ঔদাসীন্য! আপনার সঙ্গে কফি খাচ্ছি বলে কলঙ্কের ভয়ে কিছু অন্যায় না করেও চোর হয়ে থাকতে হবে না—

আপনি দেখছি ভীষণ দেশদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। সবিতা টিপ্পনী কাটে।

তাই মনে হচ্ছে, না? পূরব হাসে, দেশ ছেড়ে আসতে হবে ভেবে তো দেশে ফিরে যাইনি। দেশকে ভালবাসি বলেই, রাগে-দুঃখে-অপমানে এসব কথা বলছি। যদিও অসত্য কিছুই বলিনি. অর্ধ সত্য বলতে পারেন! আগে যখন ছেলেরা দেশে ফিরে টিকতে না পেরে এদেশে ফিরে এসেছে, তাদের কত গালাগাল না করেছি, এখন বুঝি আর লজ্জা বোধ হয়।

পূরব হঠাৎ নড়েচড়ে বসে বললে, চলুন ওঠা যাক, এমন সুন্দর গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় অন্দরে বসে থাকার মানে হয় না।

চলুন। সবিতা সায় দেয়। বিল চুকিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। দিনের আলোর রেশ বিদায়ের ভঙ্গীতে লুকিয়ে পড়ে রাত ন'টার সময়েও ইতস্তত করছে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে মার্বেল আর্চের গেট দিয়ে হাইড পার্কে ঢুকল। অনেক যুগল প্রেমক্রীড়ায় রত। হাইড-

পার্কের অসীম সবুজ বিস্তৃতি বড় লোভনীয়। ওরা সরু রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল।

পূরব পুরোন কথার জের টেনে বলতে থাকে, জান সবিতা, দেশ আর বিদেশের সীমানা রাজনীতিকদের অনুশাসনে। আমার, তোমার অঞ্জনার মতো কত লোক আজ এপার ওপার করছে। আঁকড়ে থাকলে কি ভালবাসা হয়? পূরব স্বাভাবিক ভাবেই সবিতার হাত নিজের হাতে মুষ্টিবদ্ধ করল। সবিতা আপত্তি করল না, কিংবা আবেগে কেঁপেও উঠল না। সবিতা আপন মনে বললে, আমি নারী। আমার ভালবাসা আঁকড়ে ধরতে চায়, বাসা বাঁধতে চায় যে পূরব!

ওরা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। সবিতা আস্তে আস্তে বললে, দেশের রীতি আর প্রথার অত্যাচার থেকে অব্যাহতির উৎসব করছেন না কি?

পূরব উত্তর দিল না। হাতও ছাড়ল না। কয়েকটি টেডী বয় পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বলে গেল, Hold her tight young man!

ওরা দূরে সরে গেলে পূরব সবিতাকে কাছে আকর্ষণ করে বললে, দেখলেন এ দেশটাকে এত ভালবাসি কেন?

সবিতা নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বললে, এই কারণেই যদি শুধু লণ্ডনকে ভালবাসেন, ধোপে টিকবে না। চলুন ফেরা যাক!

আপনার sense of humour দেখছি একেবারে নেমে গেছে।

কি করব বলুন? যারা জীবনে কেবল মার খেয়ে বুড়ো হতে থাকে তাদের রসবোধ শুকিয়ে গেলে দোষ দেবেন কাকে? নিন সন্ধ্যেটা বেশ লাগছিল, ঝগড়া করে কাজ নেই।

অর্থাৎ ঝগড়া বা ভাব কোনটা করেই কাজ নেই, এই তো?

ঠিক তাই?

তবে চলুন।

হোস্টেলের কাছাকাছি এসে পূরব বললে, আমি পরশু সকালের

প্লেন ধরছি, কাল দেখা করতে পারব কি না সন্দেহ। আমি একটু ওদিকে গুছিয়ে নিয়ে আপনার টাকা আস্তে আস্তে ফেরৎ দেব।

ধন্যবাদ।

হোস্টেলের সামনে এসে পূরব বললে, আপাতত বিদায়। আবার দেখা হবে নিশ্চয়।

দেশ বিদেশের সীমানা তো কেবল রাজনীতিকদের অনুশাসনে, দেখা হওয়া আবার আশ্চর্য কি? সবিতা উত্তর দিল শান্তভাবে।

দেখা করার জন্য ধন্যবাদ।

Pleasure was mine! Good-night!

Good-night!

সবিতা দরজা খুলে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরের দিকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল ধীর ক্লান্তিতে, হাতে চটি খুলে, যাতে শব্দ না হয়, ঘুম না ভেঙে যায় অন্য কারুর।

চার পাঁচ বছর পরে St. Pancras হলে আলী আকবরের বাজনা শুনতে গিয়ে সবিতা দেখে একেবারে সামনের সীটে পূরব বসে আছে, পাশে শ্বেতাঙ্গ মহিলা। বিরতির সময় পূরব বাইরে বেরোতে গিয়ে চোখাচোখি হয়ে গেল সবিতার সঙ্গে।

Mrs Barat যে! কেমন আছেন?

ভাল। আপনি ভাল আছেন তো?

হ্যাঁ। বিয়ে করেছি। ফ্লোরার খুব ইউরোপ দেখার শখ, তাই দেশে যাবার পথে একটু থেমে থেমে যাচ্ছি।

দেশেই থাকবেন বুঝি?

দেখি ভাল চাকরি পেলে থেকে যাব। নইলে ফিরে আসব আবার দায়িত্ব তো এখনও শেষ হয়নি। বেরোবার পথে আপনার সঙ্গে ফ্লোরার আলাপ করিয়ে দেব।

কনসার্ট শেষ হলে ভীড়ের ঢেউয়ে সবিতা রাস্তায় বেরিয়ে এল, দাঁড়াল না আর। ফ্লোরার সঙ্গে আলাপের অনিচ্ছায় নয় প্রয়োজন-

হীন পরিচয়ের সংখ্যা বাড়ানোয় সবিতা বিশ্বাস করে না, আকর্ষণও নেই।

গীতি দেশে ফেরার আগে সবিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এ-কথা সে-কথা।

কি বিবাহিত জীবন ভাল লাগছে তো?

খুব খারাপ কি?

তোমার স্বভাবটা কিন্তু বেশ ইংরেজদের মতো আছে। সবিতা হেসে বললে, চিরকাল দেখে আসলাম প্রাণের কথাটা অর্ধেক প্রাণে রেখে কমিয়ে নিজের সুখ-দুঃখের কথা বল।

স্বভাবদোষ আর কি! গীতি হেসে স্বীকার করে, ঠাণ্ডায় কলের জল জমে পাইপ ফেটে যাচ্ছে, কোন ইংরেজ বলে হাত ঘষে হাসি হাসি ভাব নিয়ে বলবে, it is not very warm today, is it?

দুজনেই হাসল। সকৌতুকে, বিদ্বেষের তিক্ততায় নয়।

কথায় কথায় গীতি জিজ্ঞাসা করল, পূরবের কি খবর?

ভালই আছে। আমেরিকান বিয়ে করেছে।

আমেরিকান? গীতি সত্যিই অবাক হয়ে বলে, পূরবের মতো টিপিক্যাল ক্যাবলা বাঙালীর ছেলে বিয়ে করল—

তুমিও তো শেষ পর্যন্ত বাঙালীর ছেলেই বিয়ে করলে! সবিতা হেসে স্মরণ করিয়ে দেয়।

তা সত্যি। গীতি হাসে, ক্যাবলাই বলি আর যাই বলি, বয়ফ্রেণ্ড আমার যে দেশি-ই থাক না কেন, বিয়ের সময়ে মনে হলো বাঙালীর ছেলের মতো স্বামী আর কেউ হবে না।

সবিতা মাথা নেড়ে হেসে বলে, তুমিও তবে গলা মেলালে শেষ পর্যন্ত।

নিজের বেলায়—হ্যাঁ। অন্য কেউ বিদেশি বিয়ে করতে চাইলে আমি সব সময় উৎসাহ দিই। তাদের সাহসের প্রশংসা না করে

পারি নে। বিয়েটা হচ্ছে gamble, বাজা খেলা, ভালবাসার বিয়েই বলুন, আর সম্বন্ধ-করা বিয়েই বলুন। কার সঙ্গে যে কার বনাবনি হবে বিয়ে না হয়ে ঘর করা পর্যন্ত কেউ বলতে পারে না।

তা হবে, সবিতা বলে।

পূরবকে আপনি এখনও ভালবাসেন? গীতি আচমকা জিজ্ঞাসা করে। আচমকা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা গীতির স্বভাব।

না। সবিতা জবাব দিতে দেরা করে না। পূরব যখন স্টেটস-এ যাবার পথে লণ্ডনে আসলো, ভেবেছিলাম আর নিজেকে ধরে রাখতে পারব না। বড় ভয় নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম—সবিতা থামে।

দেখে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন?

তোমার এ ধরনের অভিজ্ঞতা আছে?

আছে।

হ্যাঁ, দেখেই কাঁপুনি থেমে গেল। মনে হলো পূরব পরাজিত। দেশ থেকে পালিয়ে এল টাকার জন্য, দুঃখ হলো। অজান্তে প্লাগ টেনে নিলে, ইস্তিরি যেমন এক সময়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে যায়—সবিতা এক মুহূর্ত চুপ করে আবার শুরু করে, পূরবকে আবার দেখলাম স্ত্রী নিয়ে আলী আকবরের বাজনা শুনতে এসেছে, দেখলাম একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

গীতি শুনল মন দিয়ে, মন্তব্য করল না। সবিতাও বলল না ওকে ও দুদিন আগে পূরবের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে। পূরব লিখেছে সোজাসুজি, সবিতা, আমাকে তোমার ক্ষমা করতে না পারাই স্বাভাবিক। হল থেকে বেরিয়ে তোমাকে যখন কোথাও খুঁজে পেলাম না, তাই আশ্চর্য হইনি। দেশে ফিরে মনে হচ্ছে, তোমার কাছে আবার একদিন ভিক্ষা পাত্র নিয়ে হাজির হতে হবে। এবারে অর্থের জন্য নয়, ফিরিয়ে যদি দাও, দোষ নিজেকে ছাড়া আর কাকে দেব।

কোনদিনও বলিনি, আজ ছেলেমানুষের মতো বলতে ইচ্ছে করছে, তোমাকে আমি ভালবাসি, সবিতা।

সবিতা চিঠি পড়ে চঞ্চল হয়ে ওঠেনি, উদাসীনভাবে টেবিলে ফেলে রেখেছে, দু-একদিন পরে মনে পড়েছে, খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পায়নি। হয়তো টেবিল থেকে পড়ে গিয়েছিল, ক্লীনার ফেলে দিয়ে থাকবে।

পূরব টাকা ফেরত দিয়েছে?

একবার এক কিস্তি পাঠিয়েছিল স্টেটস থেকে, লিখেছিল আবার পরে পাঠাবে. তারপরে বিয়ে করে আর বোধহয় পেরে ওঠেনি। দেবে আস্তে আস্তে।

আপনি দেশে ফিরবেন না, সবিতাদি? কোনদিন?

কোনদিন গো অনেকদিনের কথা. কে বলতে পারে? মায়া বড় হচ্ছে, কি বলে দেখি।

আপনার ইচ্ছে করে না, না?

ইচ্ছে করে বৈ কি একেকসময়। তার চেয়ে স্বদেশ-ভীতিটা আরো বেশি প্রবল। আমার এদেশ ভালই লাগে, ইংরেজদেরও ভাল লাগে। যে দেশে বাস করছি, সেটাই আমার দেশ। তবু বাবাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে। বুড়ো তো হয়েছেন। দেখি, পারলে একবার ঘুরে আসব।

দেশে ফিরলে বা গেলে নিশ্চয় আমার সঙ্গে দেখা করবেন?

নিশ্চয়।

গীতি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সবিতা একলা ঘরে ফিরে এল। রেডিওটা খুলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল। বই হাতে নিয়ে, সবিতা আলো নিভিয়ে দিল। দেবেন্দ্র নেই. ছবি চলে গেল. পূরব চলে গেল. গীতি ফিরে যাচ্ছে—প্রিয়জনের প্রস্থানের দর্শক হয়ে সবিতা বসে থাকল। একবার মনে হলো, চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বুঝি গড়িয়ে পড়বে. পড়ল না।

টাকীর ইছামতীর প্রবল, তীব্র, চোরা-স্রোত সবিতার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে ওর মনের সারবান মাটিকে তছনছ করে ভেঙে

নিয়ে যেতে লাগল, কোথায় কে জানে। সবিতা উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে অস্ফুটে আর্তনাদ করে করে ওঠে, ও মাগো…

উদাসীন লণ্ডনের বিবর্ণ আকাশ শীতার্ত অতিথির মতো বৃথাই বন্ধ জানলার বাইরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে সারারাত ধরে।

তিন

মায়ার দ্বৈত্য-আনুগত্য

মায়াকে খবর দিতে গেছে। সবিতা অপেক্ষা করছে মায়ার নেমে আসার। খেলার মাঠে ছোট মেয়েদের কচি গলার মিষ্টি হাসি, মিষ্টি কথা ভেসে আসছে সবিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলার সামনে দাঁড়াল। শীতের কুয়াশায় বন্ধ কাঁচের জানলা ঝাপসা হয়ে গেছে। সবিতা হাতের তালু দিয়ে কাঁচ পরিষ্কার করে দেখবার চেষ্টা করল। যা দেখল সে কি সত্য হতে পারে? সে আবার একটুখানি কাঁচ, আবার রুমাল দিয়ে মুছবার চেষ্টা করল, মনে পড়ল না, বাইরে থেকে না মুছলে, সে কিছুই দেখতে পাবে না। কিন্তু সবিতা দেখতে পেল, ফায়ার-প্লেসের সামনে দেবেন্দ্র মায়াকে নিয়ে বসেছে, বাংলা ছবির বই নিয়ে সবিতা বলছে, মেয়েকে এবার ইংরেজী শেখাও, স্কুলে ভর্তি হবে কি করে?

না, না, আমি ভাংগা শিখব। মায়া বাংলা বলতে পারত না। তিন বছরের মায়া ইংরেজী শিখতে গররাজি হয়েছে। তোমার মেয়েকে দেখছি দেশেই পাঠাতে হবে লেখাপড়ার জন্যে. দেবেন্দ্র ঠাট্টা করে বললে।

আমার ওপর তোমার রাগ হয় না? ফস করে রাজি হয়ে গেলাম দাদার কথায়—

না, সবিতা। আমার কাছে কলকাতা লণ্ডনে বড় একটা পার্থক্য

নেই। দেশের কথা মনে হলে মনে পড়ে চাঁদপুরের কথা। কিন্তু চাঁদপুরেও ফেরা সম্ভব নয়! ছেলেবেলাতেও কেউ ফিরে যেতে পারে না। দেবেন্দ্র থামে। তারপর একটু ঔৎসুক্য নিয়েই জিজ্ঞাসা করে, তোমার টাকী দেখতে ইচ্ছে করে না?

দেখতে ইচ্ছে করে না, বলব না। তবে সেখানে ফিরে যাবার কথা আমার মনে হয় না কখনো। সবিতা মায়ার ঝাঁকড়া চুল-গুচ্ছ ধরে হাতের মুঠোয় নিয়ে বললে, মায়া যেখানে আমার কাছে থাকবে সেই আমার দেশ।

মায়া কি বুঝল কে জানে, সে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করলে, ভাংগা দেশ? মা—

দেবেন্দ্র হাসল, সবিতাও হাসল আর সরে এল দেবেন্দ্রর পাশে।

ভাংগা শিখবে, মা?

Ma! What are you whatching? Ma!

মায়া কখন এসে সবিতার পাশে দাঁড়িয়েছে। সবিতা চোখ সরাল সহসা। আপনা থেকে ওর হাত মায়ার মাথা খুঁজে নিল। একমাথা ঝাঁকড়া চুল হাতের মুঠোয় ধরা দিল না, সযত্নে ছাঁটা, ব্রাশ-করা মসৃণ মাথা সরিয়ে নিলে মায়া, চুল নষ্ট হয়ে যাবে যে।

সবিতা চেয়ার টেনে বসল। আরেকটি চেয়ার সামনে টেনে মায়াকে বললে, বস, মায়া।

মায়া বাংলা বলতে পারে না, বোঝেও না। ইংরেজি কথা বলে পাবলিক স্কুলে-পড়া ইংরেজদের মতো, যারা এর পরে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজে যায়, তারপরে বেরিয়ে দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে, রাজনীতি আর ব্যবসায়ে।

মায়া গুটিয়ে থাকে, সবিতা পারে না মেয়েকে আদর না-করে থাকতে, ওর ইচ্ছে করে মায়াকে ছোটবেলার মতো বুকের মধ্যে জড়িয়ে আদর করে। কিন্তু মায়া এখন বড় হচ্ছে, মা গায়ে হাত দিতেই সে শামুকের মতো নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায়।

একটু রোগা হয়ে গেছ তুমি। কেন? খাও না ভাল করে?

পরশু তো ওজন নিলাম। মায়া প্রতিবাদ করে, একই তো আছে।

তোমাকে শুকনো দেখাচ্ছে যে।

মায়া বলতে পারে না কেন শুকনো দেখাচ্ছে।

দু-সপ্তাহ পরে তো তোমার ছুটি হয়ে যাচ্ছে, তুমি আমার কাছে আগে এসে থেকে যাবে, না কাকুর ওখানে প্রথমে যাবে?

তোমরা যা বলো?

তোমার কি ইচ্ছে?

মায়া ওর চঞ্চল উজ্জ্বল কৃষ্ণ-দৃষ্টি সরিয়ে রাখে। উত্তর দেয় না।

সবিতার বাংলায় বলতে ইচ্ছে গেল, পাষাণী, আমাকে এমন করে দূরে সরিয়ে রাখিস না রে! আমি যে আর পারি না!

ইংরেজীতে বললে, আমার কাছে আগে এক সপ্তাহ থেকে যাও, আমার এখন ছুটি নিতে সুবিধে হবে। পরে আবার স্কুলে ফেরার আগে আমার কাছে দু-চারদিন থেকে যেও, কেমন?

আচ্ছা, মা!

ওঃ, আমি তো ভুলেই গেছি, তোমার জন্য একটা পুতুলের সেট এনেছি, সবিতা ওর হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে বের করে দিল, উলওয়ার্থে কেনা, (উলওয়ার্থ হলো ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর, শ্রমিক শ্রেণীর পকেট আর রুচির দিকে নজর রেখে এদের ব্যবসার প্রসার) লণ্ডনের এমন পাড়া কমই আছে যেখানে উলওয়ার্থ নেই। মায়ার ওয়াকীটকী ডল আছে, প্যারিসের লাস্যময়ী ক্যান-ক্যান ডল আছে, আমস্টারডামের ডাচ্ পুতুলের জোড়া আছে, তবু সে সাগ্রহে মার হাত থেকে পাঁচ শিলিং-এর পুতুল তার সঙ্গে ন্যাপি, ফ্রক, দুধ খাওয়াবার বোতল হাত বাড়িয়ে নিলে, ছোট্ট পাখির মতো গলায় বললে, Thank you, Ma!

Thank you! মায়া আবার বললে।

তোমার পছন্দ হয়েছে তো! ঈষৎ সন্দেহে সবিতা বললে, আমি

তো তোমার কাকীমার মতো দামি দামি পুতুল কিনে দিতে পারি না!

কিন্তু আমার এটাই তো ভাল লাগছে! মায়া প্রতিবাদ করে। মাকে বলতে পারে না, দামি সুন্দর পুতুলগুলো ওর ঘরে সাজানোই থাকে, ওর খেলতে মন যায় না। একটু আদর করে আবার সে তুলে রাখে। মার উলওয়ার্থ থেকে কিনে আনা পুতুল ওর বালিশের পাশে নিয়ে সে ঘুমোয়, স্নান করায়, কাপড় বদলায় আর ঘুম পাড়ায়, নিজের ঘুমোবার সময়ে। মার ছোট্ট গরীব পুতুলগুলোকে সে যে কেন বেশি ভালবাসে সে নিজেও জানে না। মায়া জানে না কাকে তার বেশি ভালবাসা উচিত, মাকে-না-কাকীমাকে। সে জানে কাকা-কাকীমা তাকে ইংলণ্ডের সবচেয়ে ভাল স্কুলে লেখাপড়া শেখাচ্ছে, ছেলেমানুষের সত্য বুদ্ধি দিয়ে সে এ-ও বোঝে যে কাকীমা তাকে ভালবাসলেও সে ভালবাসায় উত্তাপ নেই, স্নেহপ্রবণতার আলিঙ্গন নেই, নিখুঁত কর্তব্য আছে হয়তো। মাকে তার ভাল লাগে, সজ্ঞানে সে মার আদর পায়নি, তার আগেই তাকে বোর্ডিং-এ চলে যেতে হয়েছে, মা তার গায়ে হাত দিলে কেন যে তার শরীর কাঠ হয়ে যায় সে বুঝতে পারে না। মায়া আরো জানে, মা আর কাকিমা দুজনে দুজনকে সহ্য করতে পারে না। তার বুদ্ধি পাকার আগে সে যদি কখনও তার বিশালকায়া ইংরেজ কাকিমাকে বলেছে, মা আসে না কেন এ বাড়িতে? আমি মার সঙ্গে খেলা করব! আব্দার ধরেছে মায়া। কাকীমা গম্ভীর গলায় বলেছে, ছোট্ট মেয়েদের অত বেশি কথা বলতে হয় না। যা করছ করো।

মায়া যদি বলেছে মাকে, জান মা, কাকীমা আমাকে কি সুন্দর একটা ছোট্ট কুকুর এনে দিয়েছে। ওর নাম দিয়েছি আমি স্যামি কাকীমা বেশ ভাল, না!

মায়া লক্ষ্য করে দেখেছে, সবিতার মুখও কাকীমার মতো গম্ভীর হয়ে গেছে। সবিতা শুধু বলেছে, হুঁ।

কাকে মায়া ভালবাসবে? ছুটি হলেই মা বলবে, তোকে আমি মোটে কাছে পাই না। কাকীমা বলবে, মার ওখান থেকে ফিরলে তোমার ওজন কমে যায়। বড় হচ্ছো পড়াশুনোয় মন দাও, শুধু হৈ হৈ করে বেড়ালেই তো দিন যাবে না। না, মায়া কাউকে ভালবাসে না, কাকাকে ছাড়া! বাবাকে তার আবছা মনে আছে, কাকা যেন ঠিক বাবার মতো! কিন্তু কাকার রাতদিন কাজ, রাতদিন রুগী দেখে বেড়ানো! কতটুকু দেখা হয় কাকার সঙ্গে?

তাহলে মণিকে ফোন করে বলে দেব, তোমাকে নিয়ে যেন আমার ওখানে দিয়ে আসে, সবিতা বললে।

আচ্ছা, মা!

আমি এবার যাই। আধ ঘণ্টা পরে ট্রেন ধরতে হবে।

মায়া উঠে বললে, Thanks, for coming, Ma!

সবিতা তার উত্তরে মায়াকে জড়িয়ে আদর করে বিদায় নিল। মায়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল মার চলে যাওয়া। সহপাঠী এসে বললে, চল খেলতে চল।

মায়া অন্যমনস্কভাবে বললে, কোথায় যাব?

চার

মণীন্দ্রর আত্ম-আবিষ্কার

মণীন্দ্রর একটা গুণ আছে, সে হাসে, হাসতে ভালবাসে, লোকে হাসুক তাও সে ভালবাসে। ওর হাসির মধ্যে এমন একটি অমায়িক আন্তরিকতা, শিশুর সারল্য আছে যে ঐতিহ্যপ্রিয়, সংস্কার-অমুক্ত গম্ভীর ইংরেজ-হৃদয়ও তার আকর্ষণ অস্বীকার করতে পারে না। আস্তে আস্তে সে পসার জমিয়েছে। গিলফোর্ডের আশেপাশের রাস্তায় মণীন্দ্রকে দেখলে লোকে থেমে সম্ভাষণ করে, Good morning, Doctor!

মণীন্দ্র হাসিমুখে সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দেয়, Morning to you !

It is not a very nice morning, is it ?

Smile away, Mrs Jones, মণীন্দ্র বলে হাসিমুখে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে এদিকে।

That's the game !

রুথও স্বামীকে সাহায্য করেছে। নার্সিং ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সেক্রেটারী-নার্সের কাজ করেছে। রুথ-এর বিশালবপু ব্যক্তিত্বকে গিলফোর্ডের W.V.S. (নারী স্বেচ্ছাসেবিকা সমিতি) থিয়েট্রিক্যাল ক্লাব অস্বীকার করতে পারেনি। রুথকেও লোকে মান্য করে, শুধু তাদের প্রিয় ডাক্তারের স্ত্রী বলেই নয়, রুথ—রুথ বলেই। কিছু কিছু ইংরেজ সম্প্রদায় বলে ভারতীয় ডাক্তারই বেশি ভাল । তারা অনেক বেশি যত্ন করে দেখে। হ্যাঁ, ডাক্তার আর রুগীর মধ্যে ব্যক্তিগত আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে মণীন্দ্র। যখন ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস হলো, বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেল ধনী-নির্ধন, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, মণীন্দ্র তার যত্নের নিক্তি কমায়নি, নিচ্ছিদ্র ব্যস্ততার মধ্যেও তার হাসি উদার আর অমলিন থেকেছে।

অবস্থা ভাল হতেই রুথ রাখল 'মেড', ঘরের কাজ, রান্নাও করবে আর টেলিফোনের মেসেজ রাখবে। বিলেতে মেড অধিকাংশ কন্টিনেন্টাল মেয়ে, যারা ইংলণ্ডে ইংরেজী শিখতে আসে। কিন্তু রুথ-এর কপালে বেশিদিন আরাম যেন সহ্য হবার নয়। মণীন্দ্র ইতি-মধ্যে বাড়ি কিনেছে, বিল্ডিং সোসাইটির সাহায্য নিয়ে, কিস্তিতে ধার শোধ হবে। সামনে পেছনে বাগান। দুজনের পক্ষে ভালই বাড়ি। মায়ার জন্য আলাদা ঘর রাখা আছে, সযত্নে পরিষ্কার করা। রুথ মনোযোগ দিল dog breeding-এ, পেডিগ্রি ডগ। বিশেষ করে পেছনের বাগান, আস্তে আস্তে সমস্ত বাড়িতে কুকুর ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদের পেছনে কাজ কম নয়, স্নান করানো, ব্রাশ করা, বিশেষ কুকুরকে বিশেষ খাবার দেওয়া, লোম ছেঁটে দেওয়া, নজর রাখা

কে কার প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে, কি ভাবে তা রোধ করা যায় পেডিগ্রির সামঞ্জস্য রেখে। রুথ আরম্ভ করেছিল শখ করেই, বিত্তবান-শ্রেণী-সুলভ অবসর-সময় কাটাতে। কিন্তু বিলিতি কুকুরের পরিবার-সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকলে তার খরচ পোষানো জাতীয় স্বাস্থ্য চিকিৎসকের (ন্যাশনাল হেলথের জি. পি.র) পক্ষে সম্ভব নয়। কমিটির মিটিং-এ রুথ ব্যবসার প্রচারের পথ দেখতে পেল।

নাট্যসমিতির সভায় মিসেস জাড, ব্যবসায়ীর স্ত্রী, রানীর ভাষায় বললে, কথাগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে, এই একদিন তোমার বাগানে একটি রাশিয়ান স্লেজ ডগ দেখলাম! তুমি কোথায় পেলে? I am dying to get hold of one! মিসেস জাডের একমাত্র মেয়ে এক বৈজ্ঞানিককে বিয়ে করে আমেরিকায় চলে গিয়েছে।

Really? রুথ বিশেষ ঔৎসুক্য না দেখিয়ে বললে, ওর বাচ্চা হয়েছে। If you are interested, you are welcome to have one!

How, মিসেস জাড সিগারেট হোল্ডার মুখ থেকে সরিয়ে বললে, Very kind of you! John (Mr Judd) would be simply thrilled! Thank you!

That's alright! আমাকে ফোন করে একদিন এসে দেখে যেও।

I would love to. Thanks again! মিসেস জাড রুথ এবং মণীন্দ্রর সঙ্গে সামাজিক পর্যায়ে মেশে না, অর্থাৎ ওর বাড়িতে ককটেল পার্টি হলে ওরা নিমন্ত্রণ চিঠি পায় না। মিসেস জাডের ডাক্তার মণীন্দ্র নয়।

রুথ প্রথম কুকুরের বাচ্চা বিক্রি করে মোটা টাকা পেল। খবর ছড়িয়ে পড়ে। কেউ হয়তো ফোন করে বললে, দয়া করে দাও না আমায় একটা। কতদিন ধরে খুঁজছি। যোগ করতে ভোলে না, বলে, I am dying for one!

দয়া করার জন্য রুথ যে অপেক্ষা করেই আছে, সে দু-পক্ষই জানে।

কিন্তু এ-তো দোকানের কেনাবেচা নয়, জিনিস বেছে নিলাম আর দর পোষালে টাকা ফেললাম। রুথ যে কেবল অবসর কাটাচ্ছে। এ যে লাভজনক অবসর-বিনোদন, তাতে কারুর মনে কোন সন্দেহ নেই।

মণীন্দ্রের মনে প্রথমে একটু দ্বিধা থাকলেও বাস্তবে অর্থোপার্জনের উপকারিতা যে স্বীকার না করে পারে না। মায়াকে পাবলিক স্কুলে পড়ানোর খরচ, স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখা সমাজে, উপরি টাকা কাজে লাগে বৈ-কি। ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে? টাকা জমাতে পারা তো বুদ্ধিমানের কাজ। আর রুথ খুশি থাকলেই মণীন্দ্র খুশি।

ডাক্তারের জীবনে সুখের কথা চিন্তা করার সময় কতটুকু থাকে। মণীন্দ্ররও নেই। গৃহফ্রণ্টে শান্তিই তার একমাত্র কাম্য। সজ্ঞানে সে অন্য কিছুর অভাব বোধ করার সময় পায় না, পেলেও যা পাবার নয় তার জন্য দুঃখ বিলাসের স্বভাব মণীন্দ্রর নয়। জীবন হয়তো এভাবেই কেটে যেত। গেলে ভাল হতো কিনা মণীন্দ্র সঠিক ভেবে বলতে পারে না।

ডরিস এল জার্মানী থেকে। পুরনো মেড বিয়ে করে প্রস্থানের পর। ডরিস এল দক্ষিণ জার্মানীর স্টুটগার্ট থেকে। ফরাসী প্রভাব সুনির্দিষ্ট—চরিত্রে-খাদ্যে-সংস্কৃতিতে। লাস্যময়ী তরুণী ডরিস আবির্ভূত হলো ঃ নিশ্চিত, ছককাটা, গতানুগতিক জীবনে স্টুটগার্টের খোলা এক পলকা হাওয়ার মতো, ব্ল্যাক-ফরেস্টের রহস্যময় জাদুর মতো ডরিস আবির্ভূত হলো।

ভদ্র গতানুগতিক সম্ভাষণে ডরিসের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করা যায় না। সুপ্রভাত! আশা করি এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ইংরেজী শিক্ষা কি রকম চলছে। ভালই তো ইংরেজী বলছ তুমি। ইত্যাদি দিয়ে।

উহুঁ, ডরিসের হাসি বড় বেশি মিষ্টি, ওর সুডৌল দেহের ক্ষীণতা এমনই যে বেশি বা ভারী কাজ করলে, কোন ভদ্রলোক চুপ করে বসে

দেখতে পারে না, তাকে ফস করে চেয়ার ছেড়ে উঠে বলতেই হয়, আগ্রহ নিয়ে, Please, let me help you, Doris !

ডরিসকে রুথ-এর প্রথমে ভালই লেগেছিল। মায়া ছেলেমানুষ হলে হবে কি, সে বড় বেশি গম্ভীর, নিজেও আপনা থেকে কাছে আসে না, লোককেও দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু ডরিস সব সময় মিষ্টি হেসে কাছে এসে বলবে, কি তার দরকার। কি সে করতে পারে ?

আজকাল ডাইনিং-টেবিলে চুপ-ভাঙা এলোমেলো কথা এ-মাথা থেকে ও-মাথায় গড়িয়ে যায় না। ডরিস সব যোগাড় করে একসঙ্গে বসে খেতে। মায়াও ভালবাসে ডরিসকে। সে থাকলে তো কথাই নেই। মনে হবে, এবং সঠিক ভাবেই একটি সুন্দর, সুখী, সু-মিলিত পরিবার কেবল খাবার জন্যই খাওয়ার কাজ সারছে না, জীবনকে উপভোগ করার জন্যই খাচ্ছে। হাসিতে-কথায়-আলোচনায় ঘর গমগম করতে থাকে। সবাই সবাইকে তুষ্ট করছে সাগ্রহে। মণীন্দ্রর বড় ভাললাগে আজকাল একসঙ্গে খেতে। সবিতা মনে মনে বললে— বাঙালীর স্বভাব যাবে কোথায় ? মায়াকে সারাদিনের জন্য দেখতে এসেছিল সে।

কিভাবে কি হয় বলা শক্ত। মধ্যবয়সী মণীন্দ্র ভয়ানকভাবে প্রেমে পড়ে গেল ডরিসের। সে নিজেও আগে টের পায়নি।

এক বছর হতে চলেছে ডরিস কাজ করছে ও বাড়িতে। একদিন শীতের রাত্রিবেলা খাবার পরে সকলে এসে বসল লাউঞ্জে। বসার আগেই ডরিস বাসন মেজেছে, মণীন্দ্র সানন্দে বাসন মুছে তুলে তুলে রেখেছে জায়গায় জায়গায়। কফি পারকুলেটর অন্ করে ওরা এসে বসেছে কয়লার সুন্দর ফায়ার প্লেস ঘিরে। ডরিস স্মোক করে, মণীন্দ্র করে না। ডরিস ওর হাত-ঘড়ি দেখতেই মণীন্দ্র বলে উঠল, তুমি বস, আমি কফি নিয়ে আসছি।

ডরিস কিছু বলার আগেই রুথ বলে উঠল, ডরিস আনবে, won't

you, dear ? তুমি সারাদিন খেটেছ, এখন একটু বিশ্রাম ক ডারলিং

ডরিস লাফিয়ে উঠে মিষ্টি হেসে বললে, Sure ! I'll get th coffee !

মণীন্দ্র চুপ করে আগুনের খেলা দেখতে লাগল। কিছু গুঁ কয়লা উপরে ছড়িয়ে দিলে।

রুথ বললে, Watch your step, Mani !

Pardon ?

তুমি ওকে অত আহ্লাদ দিতে যাও কেন ? After all, sh is nothing but a maid ! তোমার ব্যবহার দেখলে মনে হ তুমিই ওর চাকর।

মণীন্দ্র নিতান্ত আশ্চর্য হয়ে, রুথ-এর মতোই চাপা গলায় বলে How ! How could you say such a thing ! আমরা কারু সঙ্গেই তো ঝি-চাকরের মতো ব্যবহার করি না। তাছাড়া she is lik our—

Like what ? রুথ তীব্রস্বরে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল।

মায়া সব ব্যাপারটা না বুঝলেও, নিজের অস্তিত্বকে তার বিরক্তিক মনে হতে লাগল, সে তাই অত্যন্ত খুশি হলো, যখন ডরিস দরজা দি ঢোকার আগে থেকে মিষ্টি করে ঘোষণা করলে, Cheer up শীত মানুষেরা। কারণ আমি আগুনের মতো গরম কফি এনেছি, তোমাদে

মায়া তার অস্বভাবোচিতভাবে লাফিয়ে উঠে বললে, Oh, you are an angel !

রুথ কিন্তু আর কিছু বললে না। শোবার আগে নিজের দিককা বেড-ল্যাম্প নিভিয়ে আলাদা খাটে শুয়ে পড়ল। মণীন্দ্র সাধারণ ঘুমের আগে শুয়ে শুয়ে বই পড়ে, আজ বই হাতে শুধু খোলা থাকল। এগারো বছর বিয়ের পরেও, কোন ভদ্র, শিক্ষিত,

ব্যক্তির মনে কোন যুবতী যে এমনভাবে নাড়া দিতে পারে তার অজান্তে মণীন্দ্র ভাবতেই পারেনি। রুথ-এর সেই একটি কথা, like what? কিসের মতো? like what? ওর মাথায় যেন কথাটা হাতুড়ির মতো মারতে লাগল। like what? উত্তর চাই-ই।

ডরিসের কাজে সাহায্য করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ দেশে সব প্রভু বা প্রভু-পত্নীই সাহায্য করে থাকে সময় এবং ইচ্ছা মতো। কিন্তু ঘরের কাজে হাতে হাতে সাহায্য করার মধ্যে যে এত আনন্দ, এত মাধুর্য, তা কি মণীন্দ্র আগে জানতে পেরেছে? সত্যই তো, বাড়িতে ফিরতে তার আজকাল এত ভাল লাগে কেন? বাড়িতে ফিরে কখনও যদি দেখে ডরিস নেই, মনের আলো টুক করে নিভে যায় কেন? কেন ডরিসের সাহচর্য এত ভাল লাগে? কেন???

প্রায়ান্ধকার কোণ থেকে রুথ বললে, শুধু শুধু হাত ব্যথা করছ, ইলেকট্রিসিটিও নষ্ট হচ্ছে।

মণীন্দ্র লজ্জা পেয়ে ফস করে আলো নিভিয়ে দিলে। নিভিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের ভেতর থেকে ধাক্কা মেরে নিষিদ্ধ কথাগুলো বেরিয়ে এসে জ্বল জ্বল করে উঠল ভদ্র, ধর্ম-ভীরু মণীন্দ্রর মনের সমক্ষে। সে আবার আলো জ্বালিয়ে বিছানায় উঠে বসে অত্যন্ত শান্তভাবে বললে, I am in love, Ruth. I love Doris!

রুথ নিশ্চিন্ত স্বরে পাশ ফিরে শুতে শুতে বললে, Good for you! মধ্যরাত্রে উঠে বসে তোমার প্রেমের কাহিনী শুনব, সে নিশ্চয় তুমি আশা করনি। Good night, darling! And sweet dreams!

মণীন্দ্র মুখ কালো করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। সে চিরকাল রুথ-এর এই অদ্ভুত শক্তি লক্ষ্য করেছে, কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রুথ-এর যদি মত না থাকে, সে এমনভাবে কথা বলবে, মণীন্দ্রর নিজের প্রস্তাবকেই মনে হবে ছোট, তুচ্ছ, হাস্যকর। প্রথম প্রতিক্রিয়া তাই হলো। কিন্তু তার এই নব আবিষ্কৃত প্রেম এক ভয়ানক সত্যের মতো

তার সযত্নে গড়ে-তোলা ভদ্রসত্তাকে এমনভাবে নাড়া দিলে, ককটেল শেকার-এর মতো, যে রুথের উপহাসও তাকে অকিঞ্চিৎকর করে দিতে পারল না। সে পাশ ফিরে শুতে শুতে নিজের মনে ভয়ে-লজ্জায়-আনন্দে বলে উঠল, তরুণ যুবকের মতো করে, I love you Doris !

সংসার চলতে লাগল আগের মতোই। মণীন্দ্র আরো বেশি সোৎসাহে বাসন মুছে বাসন গুছিয়ে রাখতে লাগল। রুথ যেন দেখেও দেখে না, যেন এসব ছেলেমানুষী দেখার সময় আর যারই থাক, লর্ড বংশ-ধারী রুথ-এর নেই।

এক সন্ধ্যায় রুথ কোন কমিটি মিটিং-এ গেছে। মণীন্দ্র বাড়ি ফিরে ডরিসকে বললে, তুমি লিভিংরুমে (বসবার ঘর) গিয়ে বস, আমি চা করে আনছি তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। I want to talk to you, Doris !

ডরিস একটু অবাক হয়ে বললে, বেশ তো! আমি চা করছি, তুমি বস।

মণীন্দ্র ওর হাত ধরে সোফায় বসিয়ে চা করে নিয়ে এল। চা ঢেলে কাপ এগিয়ে দিল ডরিসকে।

Thank you। কি কথা বলবে আমাকে ?

মণীন্দ্র বসল না। কাপ হাতে করে ম্যাণ্টেল-পীসের ওপর রাখল। ডরিসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, অনেক বুঝিয়ে, গৌরচন্দ্রিকা করে বলবে ভেবেছিল, আমি যা তোমাকে বলতে যাচ্ছি, কোন ভদ্র বিবাহিত ব্যক্তির তা বলা সাজে না। আমার কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই। আমি মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে—

এসব কথা কিছুই বলা হল না, মণীন্দ্র চায়ে চুমুক দিয়ে শুধু বললে, I love you Doris !

রঙ্গমঞ্চের মতোই গরম চা ছলকে ডরিস-এর স্কার্টের উপর পড়ল, সে বলে উঠল, উঃ !

মণীন্দ্র তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভেজা স্কার্ট থেকে বৃথাই চা ঝেড়ে

ফেলার চেষ্টা করে বললে, আমি বড়ই দুঃখিত। It is all my fault!

না, না, বাঃ ঠিক আছে। ডরিস উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

মণীন্দ্র ডরিসের গোলাপি চিবুক আঙুলে উঠিয়ে বললে, May I kiss you?

ডরিস চোখের পাতা নত করে সম্মতি দিলে।

টেলিফোন বেজে উঠল। নিজের বাড়িতে ডাক্তারের কি একটু নিশ্বাস ফেলে প্রেম করারও সময় আছে?

ডরিস নিজেকে ছাড়িয়ে একটু দুষ্টু হেসে বললে, Tha'ts the warning! কর্তব্য তোমাকে ডাকছে, ডাঃ! ভুলে যাও রোমান্স!

বেচারা মণীন্দ্রকে ছুটতে হলো পুরনো ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে, যাবার আগে ভুল হলো না, আলতোভাবে চুমু রেখে যেতে ডরিসের ঠোঁটে।

মণীন্দ্র সেদিন রাত্রিবেলায় রুথ বাতি নিভোতে যাবে এমন সময় বললে, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

রুথ মহা বিরক্ত হয়ে ক্লান্তস্বরে বলে উঠল, বলে বস না তুমি ডিভোর্স চাও, হাই চাপতে চাপতে বললে, I thought you got over your fancy love! শত হলেও তোমার আটত্রিশ বছর বয়স!

মণীন্দ্র তার যথারীতি প্রতিক্রিয়াকে সচেষ্টভাবে উপেক্ষা করে শক্ত হয়ে বললে, I am quite serious! আমি ডরিসকে সত্যিই ভালবাসি।

আশ্চর্য, তোমার মনে হয় না কি, রুথ শান্তভাবে মেপে মেপে বললে, আমাদের বয়সে প্রেম, প্রেম-প্রেম, একটু কেমন একঘেয়ে পানসে মতো লাগে! নতুন কিছু বলো, বলার থাকলে।

বেশ, আমাকে ডিভোর্স দাও।

তুমি হাসালে। দু-এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে রুথ স্বল্প হেসে বললে,

কিসের জন্য ডিভোর্স চাও? You want to go to bed with her? Go, right ahead! তার সঙ্গে ডিভোর্সের কি সম্পর্ক? মেডিক্যাল বোর্ড জানতে না পারলেই হলো। I assure you!

Don't be vulgar, অশ্রাব্য কথা বলতে তোমার বাধে না।

রুথ নিতান্ত অবজ্ঞাভরে বললে, অশ্রাব্য কাজ করতে পার, বললেই দোষ। এই হচ্ছে ভারতীয়দের দ্বৈত্য-মান, double standard!

মণীন্দ্র বিছানায় উঠে বসে বললে, আমাকে তুমি যা খুশি বল, আমার দেশের নাম তুলতে যেও না।

রুড ক্লান্তভাবে বললে, বেশ, পবিত্র থাক তোমার জন্মভূমি। আমার ঘুম পেয়েছে। তোমার সঙ্গে আর বকতে পারছি না। Good night, darling! 'ডারলিং' বলতে রুথের ভুল হলো না।

মণীন্দ্র আবার সেদিনের মতো হার-মেনে শুয়ে পড়ল। সেও হার-মানা ক্লান্তস্বরে বললে, Good night!

বিলেতের দেয়াল বড় ফাঁকা। সাউণ্ড-প্রুফ না হলে, গলা যদি একটু অসাবধানে চড়ায় ওঠে তবে পাশের ঘরের বেচারা মানুষ-কানে তো ঢুকবেই। মায়া কিছু কিছু শুনতে পেল! মায়া খুব আশা করে বাড়ি এসেছিল গ্রীষ্মের ছুটিতে ভাল কাটবে বলে। ছুটি ছুটির মতোই কাটছিল। কেন যে কাকামণি সেদিন কফি বানাতে যেতে চাইল, তারপর থেকেই কোথায় যেন কি হয়ে গেছে। এখনও এরা হাসে, গল্প করে, একসঙ্গে খায়, কিন্তু থেকে থেকে মনে হয় কোথা থেকে এক অশুভ ঠাণ্ডা চোখ ওদের ওপর শীতল দৃষ্টি ফেলছে। সবিতাও প্রতি সপ্তাহ শেষে আসে এ বাড়িতে, সারাদিন থাকে, শনি বা রবিবারে, সন্ধ্যাবেলায় চলে যায়! সবিতার ডরিসকে খারাপ লাগত না আবার গলে পড়ার মতো ভালও লাগত না। ও বুঝতে পাচ্ছিল, ইংরেজীতে যাকে বলে, some thing

is cooking ! হোস্টেলে কন্টিনেন্টাল মেড দেখে দেখে সবিতা অভ্যস্থ, সে জানে তারা অল্প বয়সে ঘর ছেড়ে বিদেশে আসে, রোমান্সের জন্য তৈরি হয়ে, তারপর সুবিধামতো যদি বিয়ে হয়ে যায় মন্দ কি ? দেশে ফিরে কি করবে ? সেক্রেটারীর হাড়ভাঙা একঘেয়ে খাটুনী, যদি কোন আমেরিকান ফার্মে কাজ পাওয়া যায় তাও একটু ভাল, কিন্তু কি ভবিষ্যৎ ? আমেরিকানরা ডেট করতে উৎসাহী, কিন্তু ভারতীয়দের মতো ওরা এত সহজে টোপ গেলে না। ভাগ্য ভাল থাকলে জার্মান ছেলে বিয়ে করতে পারে কিন্তু তার অর্থ হচ্ছে, রান্নাঘরে ফিরে যাওয়া back to the kichen অর্থাৎ বেশির ভাগ সময়ে চাকরিও কর, ঘরও সামলাও। জার্মান ছেলেরা ইংরেজ স্বামীর মতো ঘরের কাজে সাহায্য করে না স্ত্রীকে, করলেও খুবই কম। মিলিটারী ট্রাডিসনের দৌলতে পিতৃকর্তৃত্বে তাদের অগাধ বিশ্বাস। সবচেয়ে ভাল ভারতীয় ছেলেরা, তারা বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে সম্মান করে, সাহায্য করে হাতে হাতে, চাকরি ছেড়ে 'লেডী এ্যাট লেজার'-এর মতো থাকতেও পারা যায়, সে রকম ভাগ্যে মিলে গেলে।

রুথ-এর মতো স্ত্রী নিয়ে যে মণীন্দ্র কি করে ঘর করে চলেছে তা নিয়ে সবিতার সব সময় বিস্ময়। মণীন্দ্র যে এতদিন চরিত্রবান আছে কি করে, সেটাই তো আশ্চর্য। আর ডরিস ? কৃষ্ণ সৌন্দর্যকে কন্টিনেন্টাল মেয়েরা বড়ই সুন্দর দেখে। মণীন্দ্র সুপুরুষ ; বয়স হতে থাকলেও তার তারুণ্য তরুণকে লজ্জা দেয়, তার হাসির সঙ্গে মেশানো গাম্ভীর্য ডরিসকে যে আকর্ষিত করবে তাতে বিস্ময়ের কি আছে ?

সেই রবিবার সবিতা মণির বাড়ি গিয়ে দেখে, দীনেন বসে-বসে ডরিসের সঙ্গে গল্প করছে।

আরে দীনু যে, কি ব্যাপার ?

মধুর লোভে মৌমাছি আসে, দীনেন চটপট জবাব দেয়।

ডরিস চোখ টিপে হেসে বললে, ভুল জায়গায়, ভুল সময়ে এসে পড়েছ, ডিনেন !

দীনেন হাসিতে যোগ দিয়ে বলে উঠল, Oh boy! দীনেন অল্পদিন হলো আমেরিকা বেড়িয়ে ফিরেছে, তাই ওর কথায় আমেরিকান ভাষার ছড়াছড়ি।

I never make a mistake। মধু সংগ্রহে আমার ভুল হয়নি! I am big brother's disciple, don't you know? শচীন্দ্রকে ওরা big brother বলে।

Oh gosh! এই শব্দটা ডরিস নতুন আয়ত্ব করেছে ইংরেজী ক্লাসে, বলে উঠল, আমাকে সাবধানে থাকতে হবে দেখছি।

You better be honey! দীনেন বলল।

ওর honey কথাটা শুনে তিনজনে উচ্চ শব্দে হেসে উঠল।

রুথ সবিতার গলা পেয়ে, এসে বললে, এই যে কখন এলে?

এই পাঁচ মিনিট হবে।

আমি আজ মাছ আনিয়েছি, স্যামন, তুমি একটু ঝোল করে দেবে?

নিশ্চয়ই। সবিতা অবাক হয়ে বললে। রুথ তো কখনও তাকে অন্দরে ডাকে না, স্যামন মাছের ঝোল! অমন ফুলের মতো এত দামি মাছকে কি করে যে তোমরা butcher করতে পার, আমার ধারণার বাইরে।

এস তবে আমার সঙ্গে।

আমি কিছু সাহায্য করতে পারি? ডরিস উঠে বললে, মেড-এর কর্তব্যের তাগিদে।

না, রুথ নরম করে বললে, ডিমু অনেকদিন পরে এসেছে, ও একা বসে থাকবে কি? আমার আবার বাচ্চাদের খাওয়াতে হবে। রুথ কুকুরদের বাচ্চা বলে।

Yon are an angle, aunt-Ruth! দীনেন বলে।

How sweet of you to think of it! রুথ জবাবে বললে। ওরা সকলেই হাসল। রুথ আর সবিতা অন্দরের দিকে গেল। রুথ মায়াকে পড়তে পাঠিয়েছে। এ সময়টা ওর পড়ার সময়।

পাঁচ

বিপদ সংহারক দীনেন্দ্রনাথ

দীনেন শচীন্দ্রর খুড়তুতো বোনের ছেলে। সেই খুড়তুতো বোন প্রায় ডজনখানেক ছেলেপিলে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। শচীন্দ্র একবার দেশে বেড়াতে গিয়ে দীনেনকে দেখে ওর বড় ভাল লেগে গিয়েছিল। সে বললে বোনকে, দীনেনকে আমি নিয়ে যাব, মানুষ করব নিজের ছেলের মতো।

বোন তো হাতে স্বর্গ পেল, খেতে দিতে পারে না, লেখাপড়া শেখাতে পারে না, এতগুলো ছেলেমেয়ে! সে এক কথায় রাজি হয়ে গেল। শচীন্দ্র দীনেনকে কলকাতায় এনে Army Navy Stores থেকে পোশাক পরিয়ে বোনকে দেখাতে গেল। বোন তো ছেলেকে দেখে হেসে-কেঁদে বাঁচে না। পরের প্লেনে দীনেন চলে এল লণ্ডনে তার মামার সঙ্গে। প্রাইভেট টিউটর রেখে দীনেনকে ভর্তি করা হলো প্রাইমারী বোর্ডিং স্কুলে। তখন ওর বয়স চোদ্দ।

শচীন্দ্র গর্ব করে বললে, He is the brightest star among us! মিথ্যা নয়, দীনেন শুধু নতুন পড়া আয়ত্ব করল তা নয়, পাবলিক স্কুলে গিয়ে থার্ড, সেকেণ্ড, ফার্স্ট হতে লাগল। স্কলারশিপ পেয়ে গেল অক্সফোর্ডে ডাক্তারী পড়তে। দীনেন কখনও ভুলে যায়নি সে কোথা থেকে এসেছে। সে ভাল করে লেখাপড়া শিখে মামার ঋণ শোধ করবে, এই ছিল তার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাশা।

অক্সফোর্ডে পড়তে এসে দীনেন আস্তে আস্তে বদলাতে লাগল। সে মামাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে ভয়ও পায় কিন্তু ওর ক্রমাগত মনে হতে লাগল কৃতজ্ঞতা নিয়ে যে বাঁচতে পারবে না। শচীন্দ্র ওকে

খুবই অল্প পকেট-মানি দিত। বলত, সব ভাইদের যেমন সে বলেছে, আমি বহু কষ্ট করে বড় হয়েছি। টাকা সহজে আসে না, কষ্ট করতে হয় তার জন্য—সেটা বোঝা দরকার। লেখাপড়া শেখাচ্ছি, এর পরে নিজের সামর্থ্য দিয়ে উপার্জন কর, উপভোগ কর জীবনকে, I am all with you ! কিন্তু এখন ? You have to struggle !

দীনেন দেখল সে বড়লোকের ছেলের মতো মানুষ হয়ে উঠেছে, কিন্তু অক্সফোর্ডের ধনী সন্তানদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে খরচ করতে পারে না। বান্ধবীকে 'উইক এণ্ডে' নিয়ে যেতে পারে না, লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে দামি আরামী সীটে কনসার্ট শোনাতে, থিয়েটার দেখাতে পারে না, পারে না Savoy, Ritz-এ ডিনার খাওয়াতে।

দীনেনের মনে হলো, জীবনে প্রাণপণ খেটে পরীক্ষায় প্রথম হওয়াটাই সব নয়, আরো কিছু, এমন কিছু আছে, আশেপাশে ছড়িয়ে যে তাকে সরিয়ে উপভোগ করতে না পারলে জীবনধারণ অর্থহীন। না, দীনেন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল না, তার জীবনের এতদিনের শৃঙ্খলা কেমন যেন বিশৃঙ্খল হয়ে গেল চাঁদপুরের দেশের বাড়ির মতো। অভাব, সব সময় কেবল অভাব, চারিদিকে অভাব, যা তাকে পাগল করে তুলত। কল্পনায় অতীত যেন তীব্র সত্য হয়ে ফিরে এল তার কাছে। ছুটিতে অন্য ছাত্রদের মতো কাজ করে সে উপরি-পয়সা রোজগার করতে রাজি নয়। কেন সে হাতের কাজ করবে ? তেরো বছর পর্যন্ত এমন কাজ নেই সে করেনি। এখন কেন করবে ? শচীন্দ্র মতো এত ধনী মামা, যে নাকি বলে নিজের ছেলের মতো মানুষ করছে. সে তাকে কেন এমন হাত-পা বেঁধে দরিদ্র করে রাখবে ? বলে কিনা কষ্ট কাকে বলে বুঝতে শেখ। যেন সে আর জানে না। যেন সে—

দীনেন পাশ করে গেল এই পর্যন্ত। প্রথম বছরে প্রফেসাররা ওর ওপর অনেক আশা করেছিলেন, তারপরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

শচীন্দ্র কিন্তু বড় আঘাত পেল। বিলিতি কাগজে বেরুল না, গ্রেট ব্রিটেনে ভারতীয় ছাত্রের অভূতপূর্ব কৃতিত্ব ইত্যাদি। শচীন্দ্র মুখে

কিছু বলল না। সে দীনেনকে সত্যিই স্নেহ করত। বলল, এফ. আর. সি. এস. পড়।

দীনেন বললে এখনই তার পড়ার ইচ্ছা নেই। ভবিষ্যতে দেখা যাবে। শচীন্দ্র ভাইদের বেলা পড়া শেষ হলেই দেশে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ওর মনে মনে ইচ্ছা ছিল দীনেন এখানেই ভারতের উজ্জ্বল তারকা হয়ে তার কাছে কাছে থাকে। কিন্তু ছেলের মতিগতি দেখে সে বললে, দেশে যাও তবে, একবার ঘুরে এস। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও দেখা হবে। তোমার ইচ্ছা হলে কিছুদিন থেকেও আসতে পার। আর আমি তো আছিই, তোমার যখন ইচ্ছা হয় চলে আসবে। শুধু আমাকে জানিয়ে দেবে কবে আসতে চাও, টিকিট কেটে পাঠিয়ে দেব।

দীনেন রাজি হয়ে গেল। কথায়, বলায়, পোশাকে, আচার-ব্যবহারে পুরোদস্তুর ইংরেজ সে। টম, ডিক, হ্যারীর মতো ইংরেজ নয়—পাবলিক স্কুলে পড়া, অক্সফোর্ডে যাওয়া ইংরেজ সে। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে।

শচীন্দ্র ইঞ্জিনীয়ার ভাইকে লিখে দিলে, পার যদি ভাল বাঙালী মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দিও। অবশ্য যদি দীনেন রাজি হয়। অবনীন্দ্র কোলকাতার কত বাড়িতে দীনেনকে নিয়ে গেল আলাপ করাতে, বললে, দাদা বিয়ের কথা বলেছে। দীনেন ঔৎসুক্য নিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করলে। কিন্তু যে মেয়েদের সে দেখল তাদের বিয়ে করবে কে? দীনেনের হাসি পেল ওদের কাউকে তার স্ত্রী হিসেবে ভাবতে। ভাল করে একটা কথা বলতে পারে না। চোখের দিকে তাকিয়ে। কেউ আবার কথার উত্তরে ফিককরে হেসে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওর মজাই লাগল, ওরা নাকি কলেজে ইউনির্ভাসিটিতে যায়, কিন্তু ওদের সঙ্গে পুতুল খেলা যায়, খেলাঘরের বর-বউ খেলতেও বোধহয় ওরা আপত্তি করবে না! আর যে দু-একজন ইঙ্গবঙ্গীয় মেয়ের

সঙ্গে আলাপ হলো, দীনেন তাদের কিছু.ওই সিরিয়াসলি নিতে পারলে না। না জানে নিজের দেশকে, না বুঝতে পারে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল সত্যকে! এরা যেন ফাঁকা অনুকরণে, বড়লোকের ড্রয়িংরুমে সাজানো সস্তা প্ল্যাস্টিক ফুল!

অবন যখন হয়রান হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি পছন্দ হলো না একজনকেও?

হ্যাঁ, পছন্দ তো খুব হয়েছে। আমার তো মনে হয় বাঙালী মেয়েরা ভারী মিষ্টি আব সুন্দর দেখতে, ইচ্ছে করে গাল টিপে দিই।

অবনের স্ত্রী দীনেনের কথা শুনে অভ্যস্ত, সে হেসে বললে, বেশ তো বৌ করে যত ইচ্ছে গাল টেপ।

দীনেন হা হা করে হাসল। না মামীমা, আমার কপালে বাঙালী মিষ্টি মেয়ে নেই। ওরাও রাজি হবে না আমাকে বিয়ে করতে, আমিও হব না। বাঙালী মেয়ে বাংলাদেশেই মানায়, বিদেশের সমাজে এরা একেবারে বেমানান হবে।

তবে কি তুমি যাওয়াই ঠিক করলে?

দীনেন ওর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে বললে, না আমি দেশে মানিয়ে নিতে পারব না। ভেবেছিলাম হয়তো পারব। এখানে ছমাস থেকে দেখলাম, আমার ফিরে যাওয়াই ঠিক হবে। আমি বোধহয় দেশ হারিয়ে ফেলেছি।

দীনেনের মনে হলো ও যেন বলেছে, মাকে হারিয়ে ফেলেছি। মিথ্যা আশা নিয়ে মাকে দেখতে দেশে যায়নি সে। তার ছেলেবেলার স্মৃতি মাতৃপ্রেমে কিছু উজ্জ্বল নয়। বছবে বছরে আঁতুড় ঘরে ঢোকা আর-বেরুনোর মাঝের সময়টুকু মারধোর করে সামলে, কান্না আর ঝগড়া থামিয়ে, খিট খিট করে কেটে যেত মা-র সময়; গালে হাত বুলিয়ে ভালবাসার সময় কোথায় ছিল মা-র? অর্থ কোথায় ছিল পিঁড়ি পেতে বসিয়ে একটা মাছের বদলে তুটো মাছ পাতে দিয়ে ভালবাসা

দেখানোর? দীনেন গেল, মাকে দেখে জড়িয়ে ধরল। মা তার নোংরা, হলুদ, আর কফ লাগা কাপড় পরে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে ছেলের থেকে সরে এল, খাওয়াল অনেক আদর করে, বাঙালী মা-র একমাত্র প্রেমাস্ত্র খাদ্যোপচার! দীনেনের এমন আমাশয় হলো যে তাকে গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলো। ভাল হয়ে আবার সে গিয়েছিল মা-র সঙ্গে দেখা করতে, সে ভয়ে ভয়ে জল স্পর্শ করেনি। মা-ও বললে না, থেকে যাও। পরের দিন পেটে ব্যথা আরম্ভ হতেই সে তল্পিতল্পা গুটিয়ে মায়ের কাঁধে হাত রেখে বললে, আমি যাচ্ছি এখন, মা।

যাবে? সাবধানে থেকো যেন। কলকাতায় গিয়েই চিঠি দিও।

দেব। দীনেন চলে এল কলকাতায়। শচীন্দ্র তাকে যে টাকা পাঠিয়েছিল ভারত-ভ্রমণের জন্যে, সে সেই ভাগটা মা-র নামে ব্যাঙ্কে জমা করে মাকে চেক-বই পাঠিয়ে দিলে।

দীনেন লণ্ডনে ফিরে পড়ল না। চাকরি নিল হাসপাতালে। আর মাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে লাগল। জীবনে অনেক রকম বিপর্যয় গেছে, কিন্তু মাসের প্রথম সপ্তাহে মাকে টাকা পাঠাতে সে কখনো ভোলেনি। এই হচ্ছে দীনেনের ইতিহাস

দীনেনের সঙ্গে সবিতার যথেষ্ট হৃদ্যতা। মণীন্দ্রর বাড়িতে সে মাঝে মাঝে যেত, কিন্তু রুথ শ্বশুর বাড়ির লোকেদের বড় একটা আমল দেয় না, খ্রীস্টমাসের দিন ছাড়া। কিন্তু রুথ উৎসাহ দিতেই, মধুর লোভে দীনেন ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করে দিলে। দীনেনকে মণীন্দ্র পছন্দ করে, সে যে আজকাল আসছে, তাতে সে খুশি। কেন আসছে, কার উৎসাহে, তা মণীন্দ্রর ব্যস্ত মাথায় ঢুকল না। আর যদি ঢুকেও থাকে, তার ডরিসকে অবিশ্বাস করার কথা মনেই এল না তার ব্যস্ততার মধ্যে যেটুকু সময় হাতে থাকে সে শুধু ডরিসের

চিন্তা করে, কিভাবে সে মুক্ত হয়ে ডরিসকে বিয়ে করতে পারবে। সেই চিন্তা!

মণীন্দ্র আবার একদিন বললে রুথকে, আমাকে ডিভোর্স দাও।

রুথ কিন্তু সেদিন ব্যঙ্গভরে উড়িয়ে দিলে না। সে সোফায় সোজা হয়ে বললে, বারবার এক কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। শেষবারের মতো শুনে নাও, আমি তোমাকে কোনদিনও ডিভোর্স দেব না।

আমার তাহলে তোমাকে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তুমি কি ভেবেছ আমাকে পরিত্যাগ করে গ্রেট ব্রিটেন কেন, পৃথিবীর কোথাও প্র্যাকটিস করতে পারবে আর? মনে রেখ ডাক্তারী বিদ্যার চেয়ে বড়, ডাক্তারের চরিত্রের সুনাম। তুমি যেখানে যাবে আমি তোমার আশেপাশে থাকব।

সে দেখা যাবে। আমার মন তৈরি হয়ে গেছে। মণীন্দ্র ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। মণীন্দ্র বললে ডরিসকে তার সঙ্কল্পের কথা। ডরিস কেঁদে ফেলল মণীন্দ্রর কোলে মাথা রেখে।

মণীন্দ্র জানে রুথ তাকে মিথ্যা ভয় দেখায়নি। সে এক রকম ভাবে বুঝল রুথকে ছেড়ে যাওয়া মানে—সম্মান, প্রতিষ্ঠা, সুনাম, শান্তিময় জীবনকে পরিত্যাগ করা। মণীন্দ্র এ নিয়ে ভাবতে চাইলে না। তার শুধু মনে হলো ডরিসকে তার চাই-ই। তলিয়ে দেখার মতো মন ছিল না তার, সে বুঝতে পারলে না, ডরিস তার শেষ অবলম্বন, শান্তিময় সাবধানী জীবনের একঘেয়ে শূন্যতা থেকে বাঁচার, জীবনে এই প্রথম জীবনকে পরিপূর্ণতর করে তোলার পরশমণি হচ্ছে ডরিস। মণীন্দ্র স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে বললে, আমি মুক্তি চাই!

তিন চার দিন পরে রাত্রিবেলায় বাড়ি ফিরে সে খেতে বসে দেখলে, রুথ খাবার বেড়ে দিচ্ছে। মণীন্দ্র প্লেট সরিয়ে দিয়ে বললে, ডরিস কোথায়?

বলছি আগে খেয়ে নাও।

আগে বল আমাকে।

রুথ তার এপ্রনের পকেট থেকে খামে-আঁটা একটা চিঠি মণীন্দ্রর প্লেটের ওপর রাখল। মণীন্দ্র চিঠি নিয়ে বসবার ঘরে খুলে পড়ল, ডরিস লিখছে ঃ

মণি, প্রিয়তম, আমাকে তুমি ক্ষমা করবার চেষ্টা কর। তুমি যখন এ চিঠি পাবে, জানবে আমি দীনেনের স্ত্রী হিসেবে মধুচন্দ্রিমায় বিদেশে যাচ্ছি।

আমার মনে হয় এই-ই সবদিক থেকে ভাল হলো। তোমাদের শান্তির সংসারে আমি ক-দিন উপদ্রব করে গেলাম সেজন্য আমার আফশোশের শেষ নেই।

তোমার স্ত্রীর কাছে আমি হাজার মাফ চাইছি। তুমি একটু আমার হয়ে বলবে কি? মিসেস বরাট (রুথ) আমার সঙ্গে আগা-গোড়া এত ভাল এবং সুন্দর ব্যবহার করেছে যে আমি নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যেতাম, কি করে সম্ভব।

দীনেন তোমার আশীর্বাদ চেয়েছে। আশীর্বাদ করো আমরা যেন সুখী হই।

তুমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জেন। আমাকে ক্ষমা করো তুমি, আবার ভিক্ষা চাইছি।

মণীন্দ্র চিঠি হাতে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। রুথ ট্রেতে কফি করে প্লেটে দুটো বিস্কিট রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কফির পেয়ালায় আনমনা হয়ে চুমুক দিয়ে সে ভাবলে, তার জীবন যেন একেবারে শূন্য, অর্থহীন হয়ে গেল, সে বাঁচবে কি করে? কি নিয়ে? ডরিসকে ছাড়া? ইস্ট বার্লিনের দেয়ালের মতো যেন রাতারাতি তার বেঁচে ওঠার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে! কারোর ওপরে ওর রাগ হলো না, কেবল আত্মদুঃখের শূন্যতায় সে এমনভাবে তলিয়ে গেল যে তার চারপাশের অস্তিত্ব ঊর্ধ্বগামী জ্বালাময় নৃত্যরতা আগুনের শিখায় পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল যেন।

মায়া খ্রীস্টমাসের ছুটিতে বাড়িতে এসে দেখে ডরিস নেই। রুথকে জিজ্ঞাসা করলে সে, আন্টি, ডরিস কোথায়?

ডরিস চলে গেছে, রুথ বললে, ওর নাম এ বাড়িতে আর কোনদিনও উচ্চারণ করো না।

মায়া যন্ত্রচালিতের মতো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। মায়া অপেক্ষা করতে লাগল সুযোগের।

প্রতিবছর খ্রীস্টমাসের দিন সবিতাকে রুথ নিমন্ত্রণ করে। সবিতা এল প্যাকেটে সকলের জন্য উপহার নিয়ে। রুথও সেদিন বিশেষ করে সবিতাকে খুব দামি দামি উপহার দেয়। খ্রীস্টমাস ট্রি-তে সাজিয়ে রাখে, ডিনারের পরে কফি খেতে খেতে যে যার উপহার বিনিময় করে। আরো দু-একজন এদিক-ওদিকের ছাত্র বা ছাত্রী থাকে। আর থাকে ডক্টর সোমনাথ! শচীন্দ্রর দেশসম্পর্কে আত্মীয়। সোমনাথ লণ্ডনে এলে পরে শচীন্দ্র তাকে সাহায্য করেছিল যদ্দিন না সে চাকরি পেয়েছে। সোমনাথ চিকিৎসাবিদ্যার ডাক্তার নয়, সে সবাই জানে; কিন্তু কোথা থেকে কোন বিষয়ে কোন্ দেশ থেকে কে যে তাকে ডক্টরেট দিয়েছে, সবিতা কেন, কেউ-ই জানে না। অবশ্য পরশ্রীকাতর কিছু লোক বলে সে জার্মানী থেকে ওই উপাধিটা কিনে নামের আগে জুড়ে দিয়েছে। যাই হোক সোমনাথ আর তার বয়স্কা জার্মান স্ত্রী ক-বছর ধরে নিয়মিত আসছে, দু-তিন বছর অন্তর অন্তর অবশ্য পরিবারের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে তার।

মায়া সেদিন কিছুতেই সুযোগ পেল না, সবিতা সর্বসময়েই লোকের ভিড়ে বসে আছে বা ঘুরছে। ও যখন স্কুলে ফেরার আগে সবিতার হোস্টেলে থাকতে গেল, প্রথমেই সে প্রশ্ন করলে,

মামণি, ডরিস কি করেছে?

কি করবে?

না তাই বলছি। ও কোথায়?

ডরিস দীনেনকে বিয়ে করে ব্রেজিলে চলে গেছে।

সত্যি? মায়া চোখ বড় বড় করে খুশি হয়ে বললে, কেউ আমাকে জানাল না কেন? আমি ডরিসকে একটা কার্ড পাঠাতাম! ডীনু কি ভাল, তাই না? তবে—

তবে কি?

না কিছু নয়।

সবিতা একটু চুপ করে থেমে বললে, What's worrying you dear?

রুথ তাকে কি বলে-না-বলে, সে কথা মায়া সবিতাকে কখনো বলে না। কিন্তু আজ বললে, আণ্টি আমাকে ওর নাম উচ্চারণ করতে বারণ করলে কেন?

সবিতা নিশ্বাস নিয়ে বললে, ডরিস তোমার আণ্টির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি।

সত্যি? ওতো সব সময় মিষ্টি করে কথা বলত!

মিষ্টি করে কথা বলেও খারাপ ব্যবহার করা যায়।

ওঃ। মায়ার মনে পড়ে গেল টুকরো দৃশ্য, টুকরো কথার ঘটনা-বিন্যাস। সাড়ে-এগার বছরের মায়া পৃথিবীর মূলতম এক সমস্যা নিয়ে ভাবতে বসল। কে কবে ভেবে পেয়েছে? টুকরো টুকরো puzzle game-এর ছবিগুলো সে চেষ্টা করল ঠিক জায়গামতো ফেলতে। সবিতা দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করল, সাড়া পেল না। দেখল মায়া গভীর মনোযোগসহকারে সবিতার এনে দেওয়া বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। পাতা উল্টিয়েই চলেছে

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের মুখ কালো। সকাল, না সন্ধ্যা, না রাত্রি—বোঝা মুশকিল। সবিতা সর্বাতি চাপিয়ে হোস্টেলের দরজা খুলে সাড়ে-আটটার সময় রাস্তায় নামতে গিয়ে দেখতে পেল দীনেন দাঁড়িয়ে আছে স্যুট পরে, রেন কোট, ছাতা কিছুই না নিয়ে।

একি, বৃষ্টিতে ভিজছ কেন? ছাতা নিয়ে আসব ওপর থেকে?

মনে মনে সবিতা বললে, কি মুশকিল, অফিসের যে দেরী হয়ে যাচ্ছে।

দীনেন বললে, কিছু দরকার নেই। তুমি অফিসে ফোন করে দাও লাঞ্চের পরে যাবে।

সে কি! সবিতা ভীষণভাবে প্রতিবাদ করতে গিয়ে দীনেনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

দীনেন গাড়ির দরজা খুলে বললে, চলে এস।

সবিতা লক্ষ্মী মেয়ের মতো গিয়ে ওর পাশে বসল। দীনেন লণ্ডন এ্যায়ার পোর্ট পর্যন্ত কোন কথা বলল না। সেখানে পৌঁছে সবিতাকে হাতে ধরে নামিয়ে এ্যায়ার পোর্টের রেস্তোরাঁতে গিয়ে বসল। নিজে নিল ঠাণ্ডা বিয়ার, সবিতার জন্য চা।

রুথ লণ্ডনে দীনেনের ফ্ল্যাটে এসে দেখা করেছে। বলেছে সমস্ত ঘটনা। রুথ-এর চোখে জল দেখে দীনেন বিচলিত হয়েছে। ইংরেজ মেয়েরা কাঁদে কে কবে দেখেছে, সর্বোপরি রুথ-এর চোখে জল!

ডরিসকে এতদিন ছাড়িয়ে দেয়নি কেন? সবিতা বলে।

ছাড়িয়ে দেবে কি! ছাড়িয়ে প্রায় দিতে গিয়েছিল, মণি মামাও নাকি ওর সঙ্গে রওনা দিতে প্রস্তুত।

ও! সবিতা ছোট্ট করে বললে।

একমাত্র সমাধান হচ্ছে আমার ওকে বিয়ে করা।

তুমি ওকে বিয়ে করার মতো ভালবাস?

দীনেন কিন্তু এতোক্ষণের গাম্ভীর্য ভেঙে হাসল।

আমার বত্রিশ বছর বয়েস হয়েছে। মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি। নানা ধরনের। বিয়ের কথা সিরিয়াসলি চিন্তা করিনি কখনো। দীনেন এবার একটু গম্ভীর হলো, লোকে বলে বিয়ে নাকি করতেই হয়। বেশ করব। ডরিস অন্য মেয়ের চেয়ে কিছু খারাপ নয়। বিদ্বান নয়? কিছুই এসে যায় না।

সবিতা বলতে গেল, আমার কথার উত্তর তো দিলে না।

কই—

ভালবাসি কি না? দীনেন হাসে। ভালবেশে বিয়ে করা যায় না?

যায় বৈ-কি! ভাল না বাসলে কিন্তু সুখী হতে পারবে না। বিয়েটা তো ছেলেখেলা নয়।

দীনেন হেসেই বলে, বেশ সবিতা—বিয়ের পরে ভালবাসায় মন দেব।

সবিতা হাসে না। একটু দ্বিধা করে বলেই ফেলল, শুধু তোমার মামাকে বাঁচাবার জন্যই যেন বিয়ে করো না।

দীনেন সোজা সবিতার চোখে চোখে তাকাল, চুরুট মুখ থেকে নামিয়ে বললে, না সবিতা, দীনেন ওকে মামিমা বলে না, নাম ধরে ডাকে, ব্যাপারটা তাই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু বিয়ে যদি করি ওকে, নিজে চাই বলেই করব।

ডরিস কি রাজি হবে?

হবে, দীনেন বললে।

দীনেন ডরিসকে বিয়ে করে ব্রেজিলের প্লেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে শচীন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। শচীন্দ্র ওদের দুজনের বাড়ানো হাতের দিকে তাকাল, তাকাল আঙুলে বিয়ের আংটির দিকে, কোন কথা বলতে পারল না, হাতে হুইস্কির গ্লাস ছিল, এক চুমুকে শেষকরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। শচীন্দ্র যে কত আঘাত পেল, কেউ জানতে পারল না। নিজের বাড়ির লোকদের নিয়ে আলোচনা সে কখনো কারুর সঙ্গে করে না। শচীন্দ্রর এই গুণটি সবিতা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। সে জানে বহু বাঙালীকে শচীন্দ্র সাহায্য করেছে, তারাই বেরিয়ে গিয়ে শচীন্দ্রর বদনাম করে বেড়িয়েছে। মানুষের অকৃতজ্ঞতা, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যা নিয়ে অভিযোগ করতে, দুঃখ করতে শচীন্দ্রর মুখে কেউ কোনদিন শোনেনি। দীনেন এ্যায়ারপোর্টে সবিতাকে একধারে নিয়ে বললে, মামাকে একটু দেখ। ঢোঁক গিলে

একদল। কান্নাকে নামিয়ে দিয়ে, দীনেন তাড়াতাড়ি ডরিসের কাছে চলে গেল।

সবিতা গিয়েছিল শচীন্দ্রর সঙ্গে দেখা করতে। শনিবার দুপুর বেলা। আড়াইটে বেজেছে। খোঁজ নিয়ে জানল শচীন্দ্র 'প্রাইভেট বারে'-এ রয়েছে, এখনও লাঞ্চ খায়নি। শচীন্দ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মলির সঙ্গে গল্প করছে, হুইস্কির গ্লাস হাতে। সবিতাকে দেখে বলল, এই যে এস, ভাল আছ ?

হ্যাঁ। দাদা ! আপনি এখনও খাননি শুনলাম।

তুমি খেয়েছ ?

হ্যাঁ। মলি সবিতাকে চোখে ইঙ্গিত করে বারণ করলে, খাবার কথা যেন না তোলে।

না, আমরা ক-দিন ধরে স্যাণ্ডউইচ লাঞ্চ খাচ্ছি। শচীন্দ্রকে হঠাৎ বৃদ্ধ দেখাল, ক্লান্ত, যুদ্ধ-পরাজিত যেন। সবিতা বললে, দীনেন ব্রেজিলে গেছে।

জানি।

দীনেন বলতে বলেছে, ওকে যেন ক্ষমা করেন আর আশীর্বাদ করেন।

শচীন্দ্র শুধু মাথা নাড়ল, উত্তর দিল না। হঠাৎ যেন মনে পড়ে গিয়েছে এইভাবে বলল, মলি, সবিতাকে একটা কিছু দাও। Some kind of wine !

সবিতা মাথা নেড়ে বললে, না, আমি অ্যাপেল জুস খাব।

সবিতা আনমনে মায়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে এই সব ভাবছিল। জীবনে সেই প্রথম তার রুথ-এর জন্য কষ্ট হয়েছিল। এই বয়সে, এই বিপুল দেহ নিয়ে স্বামী হারালে বেচারা করত কি ? রুথ-এর জীবনে প্রেস্টিজ এক মস্ত বড় কথা, সে মুখ দেখাত কি বলে, এক কালো ভারতীয় স্বামী তাকে ডিভোর্স করবে পেডিগ্রিহীন জার্মান

মেড-এর জন্য। ঠাট্টা করে এসব ভাবলেও, সবিতা স্বীকার করে রুথ দীনেনকে রঙ্গমঞ্চে ডেকে ভালই করেছে। সবিতা নিজেকে বারবার আশ্বাস দেয়, দীনেন নিশ্চয় সুখী হবে!

মণীন্দ্র ডরিসের প্রেমে পাগল হয়ে যত ত্যাগ স্বীকার করতেই রাজি হোক না কেন, সুখী হতে পারত কি? মণীন্দ্র শান্তিকামী, তার জীবিকাই তার কাছে জীবন, সে শুধু রুগীর রোগ সারায় না, তাদের ভালও বাসে, তাদের জীবনের সুখদুঃখের সেও একজন অংশীদার। সবিতা বিশ্বাস করে, রুথ মণীন্দ্রকে ছেড়ে দিত না। রুথ ছায়া-বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে করত কি, সে ধরে রাখতে পারত কি বিশ বৎসর যুবতীর প্রেম, জীবন জীবিকা ত্যাগ করে? কিন্তু কে বলতে পারে নিশ্চয় করে, কার সুখ কোথায়?

মণীন্দ্র কি ভেবেছে কে জানে। খ্রীস্টমাসের সময় লক্ষ্য করেছে সবিতা, মণীন্দ্রর হাসি, কথা অম্লান থাকলেও তার চোখে এক থমকে-থাকা দুঃখের ছায়া এলোমেলো করে দিয়েছে দৃষ্টি। সে ডাক্তার, তার বসে শোক করার সময় কোথায়?

মায়া এভাবেই বড় হয়ে উঠতে লাগল। সে যখন বোর্ডিং-এ থাকে পড়াশুনো করে, হেসে-খেলে আর দশজন মেয়ের মতোই তার সময় কেটে যায়। সমস্ত ক্লাসে সে-ই যে একমাত্র ভিন্ন বর্ণ, তা নিয়ে কখনো দুশ্চিন্তা করে না, কারণ তার পাঠ্য-সঙ্গীরা আজ পর্যন্ত ভিন্ন ব্যবহার করেনি, সে তাদের সঙ্গেই শৈশব থেকে মানুষ হয়ে উঠেছে, বড়জোর তারা জানতে চেয়েছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, সে গর্বভরেই উত্তর দিয়েছে যতটুকু সে জানে, যতখানি সে জানে না। বন্ধুদের আশ্বাস দিয়েছে, জেনে নিয়ে পরে ওদের বলবে।

এই ভারত-জিজ্ঞাসাই মায়াকে সবিতার কাছে টেনে আনল। মণিকাকার সঙ্গে গল্প করার এত কম সময় পাওয়া যায়! আর রুথ-আন্টি তো কিছুই জানে না! যদিও সবিতার নিজের দেশের প্রতি

শ্রদ্ধা খুবই কম, কিন্তু সে বুঝল মায়াকে অশ্রদ্ধা করতে শেখানো অন্যায় হবে। দেবেন্দ্র বেঁচে থাকলে সে সবিতাকে ক্ষমা করত না। অতএব সবিতাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বই পড়া শুরু করতে হলো। সে গীতির সাহায্য নিল। গীতি নাকি দেশে রাজনীতি করত।

মায়ার সবিতার বন্ধুত্ব অতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল, মাসের-পর-মাস, বছরের-পর-বছর একটু একটু করে সুদে মূলধন বেড়ে গিয়ে। অশ্রদ্ধা করতে না শেখালেও সবিতা কখনো দেশপ্রেমের অগ্নিময় ভাবাবেগে গোলাপী করে তুলত না জন্মভূমিকে। বলত, দুঃখ-দুর্দশার কথা, স্বাধীনতার কথা, দুর্নীতির কথা, সৎ চেষ্টার কথা, নানা সমস্যা সবিতাকেও ভাবিয়ে তুলত, একেক সময়। গোটা দেশটাই একটা বিরাটতর সমস্যা, তার সমাধান যে কেমন ভাবে কবে হবে তা সে বুঝতে পারত না। মায়া হয়ত গল্প করতে করতে এক সময় বলে উঠত, মা জান, আমার গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে কেমন আমার দেশ ?

ওখানে গিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে ?

সে কি করে বলব ? দেশ না দেখলে ? ডীমু তো পারল না থাকতে—

মায়ার দেশ দেখার সুযোগ এসে গেল অতর্কিত এক দুর্ঘটনায়।

ছয়

শচীন্দ্রনাথের জীবন পরিক্রমা

শচীন্দ্রনাথ এসেছে ইংলণ্ডে সে আমলে যখন ভারতবাসীরা দলে দলে শ্রেণী নির্বিশেষে বিলেতে ভাগ্য পরিবর্তন করতে আসত না। অবিভক্ত বাংলার খুব কম লোকই আছে যে শচীন্দ্রনাথের হোটেলের দরজা খোলা পায়নি, খেয়ে যায়নি নিখরচায়। দরকার হলে থেকেছে. পড়তে পড়তে কোন কারণে বাড়ির টাকা বন্ধ হলে পেয়েছে শচীন্দ্রনাথের উদার আতিথেয়তা। কেউ কেউ দেশে ফিরেছে, নাম করেছে, ধনী হয়েছে, কেউ করেনি, কেউ করেনি বলে ফিরে এসেছে বিলেতে, ছড়িয়ে আছে তারা চারিদিকে। খুব কম সংখ্যক লোকই শচীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। অধিকাংশ লোক সুযোগ পেলেই প্রকাশ্যে নিন্দে করে বেড়ায়, সত্য মিথ্যায় নিজের মনের রুগ্ন বিকার মিশিয়ে।

শচীন্দ্রনাথের প্রথম ইংরেজ স্ত্রী সাদামাটা ছিল, দেখতে শুনতে, ব্যবহারে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে। সে শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, টাকার বীজ পুঁতেছে হোটেল রেস্তোরার ব্যবসায়, যত্ন, কষ্ট করেছে প্রাণপণ, তাকে ফুলে-ফলে শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত করতে।

অবস্থা ভাল হলে আইলীন-এর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, না-পোশাকে, না-আচার-ব্যবহারে। না-বদলালো চুলের কায়দা, না-বদলালো হ্যাটের ফ্যাসান। সে আগের মতোই মার্কস এ্যাণ্ড স্পেন্সারে কেনা ড্রেসের ওপর এ্যাপ্রন চাপিয়ে অমার্জিত ককনি ভাষায় সকলের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সুখ-দুঃখের ভার নেবার জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগল। সতেরো-আঠেরো বছর বয়স থেকে ভারতীয়দের মধ্যে

বড় হয়ে উঠে, বিয়ে করে প্রায় যৌবন অতিক্রান্ত করে এনেছে। তার সব সময় মনে থাকে না, দিন কালও বদলেছে, এমন কি ভারতীয় কাস্টমাররা পর্যন্ত নতুন লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনা করতে চায় না। তথাকথিত কিছু সফিস্টিকেটেড যাদের ব্যক্তিগত ইতিহাস লুকোন-সাপেক্ষ তারা আড়ালে আইলীনকে বলতে লাগল, নাক কুঁচকিয়ে, nosy so and so ; আর ইংরেজরা তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে আদৌ কথা বলে না, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে ছাড়া।

শচীন্দ্রনাথ-এর ব্যবসা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে চেহারায়, পোশাকে, আচারে-ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে। আপন বুদ্ধিতে, পরিশ্রমে বড় হবার সহজ আভিজাত্য সফিস্টিকেশনের জেল্লা এসেছে ব্যক্তিত্বে। দেখলে মনে হয় বয়স হচ্ছে কিন্তু বার্ধক্যের জরাজীর্ণতা যে কোন দিন তাকে স্পর্শ করতে পারবে তা মনে আসে না। জীবন জয়ের, গতিময়তার সে যেন এক মূর্ত প্রতীক। সে এখন আর সারাদিন এক রেস্তোরায় বসে থাকে না, তার আরও রেস্তোরাঁ, ক্যাবারে শো ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়েছে সারা লণ্ডনে। সে একদিন ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আইলীনের ঘরে ঢুকে নরম করে বললে, আগেও বলেছে, এবার বললে ব্যবসার স্বার্থে, সারা জীবন তো খাটলে, এবার কেন বিশ্রাম কর না।

আজ পাঁচ বছর পরে শচীন্দ্র তার ঘরে রাত্রি বেলায় ঢুকল। সে এই আশ্চর্য ঘটনাকে হজম করার চেষ্টা করে বললে,

বিশ্রাম? কিসের জন্য? বাতে ধরে মোটা হবার জন্যে? আমি তোমাকে আগেও বলেছি, মরা না-পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই।

Please listen to me, শচীন্দ্র আইলীনের দুই হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললে, কাজ যদি করতেই হয়, তুমি ম্যানেজ্রেস-এর চেয়ারে বস, কিন্তু কাস্টমারদের কাছে অর্ডার নেওয়া তোমার ভাল দেখায় না।

আইলীন নিবিষ্টভাবে কয়েক মুহূর্ত স্বামীকে দেখল, তারপরে বললে

অনভিযোগ-ভরা কণ্ঠে, যেন সে সত্য ব্যাখ্যা করছে, I am too old and too ugly to serve in your smart contemporary restaurant—yes, yes, yes !

শচীন্দ্র তখনও স্ত্রীর হাত ধরে আছে, সস্নেহে সামান্য চাপ দিয়ে আন্তরিক গভীরতায় সে বললে, Never say that again ! তোমাকে ছাড়া আমি জীবনে বড় হতে পারতাম না। . আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। একথা বলার সুযোগ আসে না, আজ বললাম।

সাদামাটা আইলীন মাথা ঝেঁকে নত মস্তকে বললে, I want your love, not your gratitude, Saki ! ও শচীন্দ্রনাথকে 'সাকী' বলে ডাকে।

বহু বছর পরে শচীন্দ্রনাথ বিগতযৌবনা আইলীনকে বুকে টেনে বেডসাইড ল্যাম্প নিভিয়ে দিল।

সেই থেকে আইলীন ম্যানেজ্রেস-এর চেয়ারে বসল, কিন্তু তার বিদ্যাবুদ্ধি এমন ছিল না যে কাগজপত্রে হিসাব রক্ষার কাজ করে। শচীন্দ্র কৌশল করে একজন দক্ষ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেখে দিল।

শচীন্দ্রর ব্যবসা শুধু পেশা বললে ভুল হবে ওটা ছিল তার নেশা। আসক্তি নারীতে, আসক্তি মদ্যপানে। শচীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় রূপসী স্ত্রী মার্গারিটা বলত, He is a connoisseur of women, not just pretty, beautiful women but attractive, talented and interesting woman !

আইলীনও জানত বৈ-কি সে কথা। সে একেক সময় অবাক হয়ে ভাবত শচীন্দ্র তাকে বিয়ে করেছিল কি বলে, অনাকর্ষণীয়, অসুন্দর আইলীনকে ? আইলীন-এর ভরা যৌবনকালে সে এ নিয়ে প্রথম দিকে চ্যাঁচামেচি করেছে, কান্নাকাটি করেছে, তারপরে হাল ছেড়ে দিয়েছে। দেখেও দেখেনি, শুনেও শোনেনি।

আইলীন-এর রেস্টুরেন্টেই মার্গারিটার সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের আলাপ।

শ্যাফ্‌টসব্যরী এভিনিউ-র ওপর, লণ্ডনের বিলাসকেন্দ্রে ভারতীয় রেস্টুরেণ্টে ভারতীয় এবং ইংরেজ বাদ দিয়েও এখানে অন্যান্য যথেষ্ট বিদেশীদের ভিড় হয়। আইলীনের অফিসের চৌকো কাটা ফাঁক দিয়ে দেখা যায় লোকদের আসা-যাওয়া। সে দেখল মার্গারিটাকে, পর মুহূর্তে ভুলে গেল সে দেখেছে।

মার্গারিটা একাই এসেছিল লাঞ্চ খেতে। এক কোণায় জানলার পাশে বসে, মাথার সিল্ক স্কার্ফ খুলতেই ওর ঢেউ খেলানো কাঁচা সোনার রঙের মতো সোনালি কেশদাম (রং করা নয়) দামি সুন্দর সাজানো ঘরে ঝিলিক দিয়ে উঠল। টানা-টানা নীল চোখে নীল ছায়া (eye shadow) দেওয়া, ওর স্বচ্ছ নীল চোখের তারায় সেই ছায়া আরো গভীরতা এনে দিয়েছে। পাতলা কিন্তু আঁকা ঠোঁটে লিপস্টিক না লাগিয়েও গোলাপী, রসে পরিপুষ্ট; মুখে আর কোথাও মেক-আপের চিহ্ন নেই, টানা লম্বা আঙুল সযত্নে ম্যানিকিওর করা। আকাশী নীল স্কার্ট সাদরে ওর ক্ষীণ কটি ঘিরে ধরে ভাঁজে-ভাঁজে নেমে গেছে হাঁটু পর্যন্ত, ঢিলে হালকা হলুদ রঙের ব্লাউজ ওর দুটি সূর্য-মুখী ফুলের মতো স্তনকে আবৃত করেও ফুটে রয়েছে নিভৃত সৌন্দর্যে। শচীন্দ্রনাথ হেড বয়কে ইশারায় বারণ করে নিজেই এগিয়ে এল।

মার্গারিটা ভারতীয় খাদ্য তালিকার জঙ্গলে পথ পাচ্ছিল না, শচীন্দ্র এসে বাউ করে বললে, সাহায্য করতে পারি তোমাকে?

Will you, please?

Pleasure! কি ধরনের ডিস তোমার পছন্দ আগে বল? ওঃ, হ্যাঁ, কিছু ড্রিঙ্ক করবে কি?

Please! Dry, light sherry!

মার্গারিটা কথা বলল ঝঙ্কৃত বিদেশী উচ্চারণে। ড্রিঙ্কস-এর অর্ডার দিয়ে শচীন বললে, জিজ্ঞাসা করতে পারি—তুমি কি কোন স্ক্যাণ্ডেনেভীয়ান দেশ থেকে আসছ?

মার্গারিটা প্রশংসায় অবাক হয়ে বললে, তুমি কি করে বুঝলে?

শচীন্দ্র হাসল।

মার্গারিটা বললে, প্রথম আকৃষ্ট হয়ে, হ্যাঁ, আমি সুইডেন থেকে আসছি।

সেই আলাপের শুরু। মার্গারিটাকে শচীন্দ্রনাথ যত্ন করে খাওয়াল, নিজে রান্নাঘরে গিয়ে তদারক করে এল।

মার্গারিটা খাওয়া শেষ করে, বিল চুকিয়ে উঠতেই, শচীন্দ্রনাথ কোট নিয়ে ওকে পরতে সাহায্য করল।

I hope, you have enjoyed your lunch !

চমৎকার ! এই প্রথম ভারতীয় লাঞ্চ খেলাম। exotic।

সুখী হলাম। আশা করি আবার তুমি আসবে।

মার্গারিটা যেতে-যেতে হেসে বললে, Except that I would have to watch my waist line and my slim purse too !

শচীন্দ্র হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে রেখে সামান্য বাউ করে বললে, I am sure, you can afford anything ! Anything !

I take it as a compliment !

Thank you ! মার্গারিটা হেসে বিদায় নিয়ে বললে, Good afternoon !

Good afternoon to you ! শচীন্দ্র জবাব দেয় তার গম্ভীর গভীর কণ্ঠে।

এর পর থেকে শচীন্দ্র শ্যাফ্‌টসব্যরী এভিনিউর নটরাজে রোজ লাঞ্চ খেতে লাগল আইলীনের সঙ্গে। আইলীন বড় খুশি, যদিও তার লক্ষ্য এড়ায়নি শচীন্দ্রনাথের দৃষ্টি চঞ্চল-হতাশায় বিক্ষিপ্ত ; সে বুঝল তার অভিজ্ঞতা দিয়ে, নিশ্চয় নারীঘটিত ব্যাপার হবে। কিন্তু ও নিয়ে আইলীন মাথা ঘামায় না। সে এমনিতে অল্প কথার মানুষ, কিন্তু শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে নয়। অনবরত আইলীন বকে যেতে থাকে, কে কি ধরনের লোক এসেছিল ; কাকে দেখে মনে হল সুখ, কাকে

country bumpkin ইত্যাদি ইত্যাদি। শচীন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে যায়, কিন্তু তার কানে একটা কথাও ঢোকে না।

শচীন্দ্রনাথ যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছে এবং ভাবছে সুইডেনের দূতাবাসে খোঁজ করলে কেমন হয়, মার্গারিটা এসে হাজির হলো, লাঞ্চে নয়, সান্ধ্য-ডিনারে, এক সুরেশ তরুণ ইংরেজ-এর সঙ্গে। সন্ধ্যের সময় কদাচিৎ শচীন্দ্রনাথ নটরাজে থাকে। ভাগ্যবশত সে সন্ধ্যায় সে উপস্থিত ছিল। মার্গারিতার সঙ্গীকে দেখে সে কিছুমাত্র হতাশ হলো না, এক নিরামিষ তরুণ ইংরেজ যে শচীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বময় পৌরুষ আকর্ষণের সামনে 'দুধ ভাতে' তাতে তার কোন সন্দেহ উদয় হলো না। শচীন্দ্রনাথ বড় হয়েছে আত্মবিশ্বাসের জোরে এবং সে নারী-হৃদয় জয় করে থাকে সেই একই বিশ্বাসে।

শচীন্দ্রনাথ নিজে এসে ড্রিঙ্কস-এর অর্ডার নিল যা সে আজকাল কদাচিৎ করে থাকে। মার্গারিটা ওকে দেখে ঈষৎ খুশি হয়ে বললে, Good evening !

Good evening to you ! শচীন্দ্রনাথ দুজনকেই সম্বোধন করে বললে।

ইংরেজ ভদ্রলোক চারদিকে চোখ বুলিয়ে সপ্রশংস পৃষ্ঠপোষকতার সুরে বললে, I see, you have a decent place here !

Thank you ! শচীন্দ্রনাথ ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় অভ্যস্ত, সে তার বক্রভাব ও ভাষা কণ্ঠস্বরের আড়ালে চাপা দিয়ে বললে, I am glad you thought it, is decent !

কি এ্যাপারতিফ চাই বল ?

তরুণ ইংরেজ শচীন্দ্রকে উপেক্ষা করে মার্গারিটার দিকে তাকিয়ে, বললে, তোমার মনে হয় না কি, আজ আমাদের সেলিব্রেট করা উচিত, তোমার—

না, মার্গারিটা মিষ্টি হেসে বললে, আরেকদিন হবে। সে শচীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি বল না কেন আমাদের, মিঃ—

মিঃ বরাট ! শচীন্দ্রনাথ সাহায্য করে !

মিঃ ব্রার্ট, কি নেওয়া যায়, হট-কারী খাবার আগে ?

তুমি কি ড্রাই না সুইট, রেড না ওয়াইট ওয়াইন পছন্দ কর !

I adore sweet ! মার্গারিটা ওর চিকন সুন্দর দুই হাত জড়ো করে বলে উঠল । I don't care red or white, how about you Peter ?

I don't either !

তা হলে আমি বলি কি আমার সেলারে পুরনো এক জব্বর বারগেণ্ডি আছে, try that—

That's kind of you, I must say ! পিটার বললে ।

শচীন্দ্রনাথ ঈষৎ বাউ করে বললে, I try to please my customers !

শচীন্দ্রনাথ মার্গারিটার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তার কথা শেষ করলে, Pleasure is mine !

মার্গারিটা হাসি ফিরিয়ে ওকে আশ্বস্ত করলে, I am quite sure, pleasure would be mutual !

হ্যাঁ ওরা পছন্দ করল রক্তিমাভা ওয়াইন। শচীন্দ্রনাথ দূরে এক টেবিলে বসে বন্ধু এবং মোসাহেবদের সঙ্গে হুইস্কি পান করছিল। মার্গারিটা দূর থেকেই নড করে হেসে জানালে ড্রিঙ্কসটা জব্বরই বটে ! ওদের খাওয়া শেষ হলো ঘণ্টা আড়াই পরে, শচীন্দ্রনাথের টেবিলের পাশ দিয়ে ওদের বেরিয়ে যাবার রাস্তা, ওরা কাছে আসতেই শচীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়াল, পিটার আন্তরিক ভাবেই বললে এবার, We really enjoyed our dinner to night !

I am glad you did ! শচীন্দ্র বললে।

ওরা চলে গেল। শচীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হয়ে বসল আবার বন্ধুদের সঙ্গে। সে জানে মার্গারিটা আবার ফিরে আসবে লাঞ্চে !

মার্গারিটা ফিরে এল দুদিন পরে। এই ভাবে সে আসা শুরু করলে। শচীন্দ্রনাথ আইলীনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। আইলীনের ভালই লাগল মেয়েটিকে, রূপে স্বভাবে গুণে সুন্দর, স্নিগ্ধ প্রশান্ত মেয়েটি! সুইডেনে সে প্রোট্রেট পেন্টার। একেবারে শিশু বেলা থেকে, তার শৈশব কালের স্বপ্ন লণ্ডনে এসে তার সুনাম প্রতিষ্ঠা করবে; সেই আশা নিয়ে সে দেশ ছেড়েছে, প্যারিসে বছর দুয়েক শিক্ষার পর সে লণ্ডনে এসেছে, প্যারিস এবং প্যারিসের বাইরে এধারে ছাড়াও, লোকে তাকে young talent বলে সুখ্যাতিও করেছে, কিন্তু তার মতে এখন লণ্ডন হচ্ছে সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র!

আইলীন এসব পোশাকী কালচারের ধার ধারে না। সে বললে একদিন শচীন্দ্রনাথকে, মেয়েটা বিয়ে করে না কেন, মাথায় রাজ্যের স্বপ্নের বোঝা চাপিয়ে শুধু শুধু দুঃখ পাচ্ছে!

ও তুমি বুঝবে না।

তা সত্যি। আইলীন সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে, তোমাদের ওসব মাথায় খুন চাপা কালচারের উচ্চাশা আমি বুঝি না।

কয়েক সপ্তাহ পরে শচীন্দ্রনাথ আইলীনের ঘরে ঢুকে বললে, শোন।

আইলীন সবে কাপড় ছেড়ে রাত্রের কাপড় পরছিল। সে ড্রেসিং-গাউন চাপিয়ে বললে, কি বল?

আমাকে তুমি ডিভোর্স দাও!

Beg your Pardon? আইলীনের সত্যিই মনে হল সে শুনতে ভুল করেছে।

শচীন্দ্রনাথ অস্থির হয়ে বললে, আমি মার্গারীটাকে বিয়ে করতে চাই, ডিভোর্স দাও তুমি।

আইলীন কথা বলল না সহসা। শচীন্দ্রনাথ বিরাট পুরোন ফার্নিচারে বোঝাই ঘরে ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল। পায়ের কাছে পড়ল মোটা তেপয়া টেবিল, শচীন্দ্রনাথ ব্যথায় চমকে

বলে উঠল, তোমাকে একশো দিন বলেছি, টাকা দিয়েছি, লোক আনিয়েছি, বলেছি একটু ভদ্রলোকের মতো থাক, না যতো সব পেটিকোট লেনের জিনিস এনে ঘরটাকে ইস্ট-ইণ্ডের মিউজিয়াম করে রেখেছ।

আইলীন এবার হাসল, মিউজিয়াম নিয়ে উঠে যাবার নোটিশ যখন পড়েছে ও নিয়ে চেঁচামেচি করে আর কি হবে?

শচীন্দ্রনাথ ঘর ছেড়ে চলে গেল। ফিরে এল আবার তুদিন পরে। আইলীন যেন অপেক্ষা করেই ছিল কফির ট্রে সাজিয়ে। ওকে দেখে বললে, বস। কফি খাবে?

আচ্ছা দাও। শচীন্দ্রনাথ অস্বস্তিকর একটি ভারী খাড়া চেয়ারে বসে বললে—

তুজনে কফি খেতে লাগল চুপচাপ। আইলীনের ঘরে কেমন যেন একটি 'এ্যান্টিক শপে'র গন্ধ আছে, একটুক্ষণ পরে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। শচীন্দ্রনাথ বললে, চল না বসবার ঘরে কথা বলি গিয়ে।

আইলীন অল্প কথায় হেসে বললে, এখানেই বসলে না হয় একদিন, একটু কষ্ট করে। কি বলবে বলো? ডিভোর্স চাও? আরো কয়েকমাস অপেক্ষা করে মনস্থির কর। তখনও তুমি যদি চাও, নিশ্চয় দেব!

মনস্থির আমার হয়ে গেছে। আমি এখনই চাই। তোমার যত টাকার দরকার—

টাকার আমার দরকার বৈকি! আইলীন শান্তভাবে স্বামীকে থামিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললে, টাকার লোভ দেখিয়ে তুমি আমার থেকে ডিভোর্স আদায় করতে চাও? টাকা হলে সত্যিই মানুষ অমানুষ হয়ে যায়।

আমি তা বলতে চাইনি। শচীন্দ্রনাথ মুখ তুলে বললে, অনুতপ্ত কণ্ঠে, I am sorry!

তুঃখিত বললেই বিলেতে সাতখুন মাপ! আইলীন সস্তা উডবাইন

সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে বললে, বেশ তুমি যা বলছ তাই হবে সাকী!

Thanks! শচীন্দ্রনাথ নিচু গলায় বলে, চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে, আমাকে ক্ষমা করার চেষ্টা কর তুমি, আইলীন।

তখনও দেবেন্দ্র ফিরে যায়নি দেশে। সে খবর পেয়ে ছুটে এল। সে আইলীনকে স্নেহ করত, এই মোটা-সোটা, সাদামাটা ভাতৃবধূকে সে বৌদির চোখেই দেখত। সে এসে বললে, আইলীন করছ কি তুমি? দাদা ক্ষেপে গেছেন বলে তুমিও ক্ষেপে গেলে নাকি। এক কথায় ডিভোর্স দিতে রাজি হয়ে গেলে!

আইলীনের ছোট ছোট গোল গোল চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে, একটু হাসার চেষ্টা করে বললে, Excuse my exhibitionism!

দেবেন্দ্র ঘাড় নেড়ে মুখ সরিয়ে নিলে। সে মেয়েদের চোখের জল সহ্য করতে পারে না, বিশেষ করে ভাতৃবধূর চোখে তো নয়ই।

আইলীন সুস্থির হয়ে বললে, আমি তো জানি ও কত মেয়ের সঙ্গে বেড়িয়েছে, কোন দিন তো ডিভোর্সের কথা ওঠেনি। এবার যখন উঠেছে তখন সে সিরিয়াস নিশ্চয়ই।

ক্ষেপে যাওয়াকে তুমি সিরিয়াস বলো? দেবেন্দ্র তখনও বয়সে তরুণ, অন্যায়-অবিচার-মূর্খতা তখনও তাকে বিচলিত করে।

এ এক রকমের ক্ষেপে যাওয়া বলতে পার। ওর জীবনে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ওর সফিস্টিকেটেড সোসাইটির দ্রুততার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার মতো আমার কিছু নেই, ডেবু। ও আমাকে নিয়ে বাইরে বেরুতে পারে না, আমি জানি না কি কথা বলব, কখন হাসব। না, না, আইলীন মাথা নেড়ে বললে, আমি শুধু ওর জীবনে বোঝা হয়ে আছি।

দেবেন্দ্র দুঃখের সঙ্গে বললে, তুমি শরৎ চাটুয্যে পড়নি আইলীন, তবে বুঝতে দাদা হীরের টুকরো ফেলে দিয়ে কাচ কুড়িয়ে নিচ্ছে।

তুমি আমাকে স্নেহ কর তাই একথা বলছ। আইলীন একটু থেমে বললে, I know Saki will need me once again, but I shall not be around any more!

কিন্তু আইলীনের ভবিষ্যদ্বাণী এ উপন্যাস শেষ করার সময় পর্যন্ত সত্য হয়ে ওঠেনি। শচীন্দ্রনাথের পঙ্গু দুঃসময়ের খবর পেয়ে আইলীন খবর পাঠিয়েছিল, সে ফিরে আসতে রাজি আছে। যে দূত এসেছিল খবর নিয়ে, শচীন্দ্রনাথ তাকে বলেছে, লাঠিতে হাত বুলিয়ে, She is kind! She had always been kind to me. But, শচীন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বললে, Don't ask me to re-open the book which I have finished and got rid of long, long, long ago! শচীন্দ্রনাথের বাস্তব বুদ্ধি ব্যবসায়ী মন ভদ্রলোক চলে যেতে ভাবলে—আইলীন কি কেবল তার সেবা করতেই ফিরে আসতে চায়, না কি তার মৃত্যু শেষে সম্পত্তি অধিকারের লোভও আছে দয়ায় মিশিয়ে?

এ-তো অনেক পরের ঘটনা। এখন থাক।

দেবেন্দ্রর অনুরোধ সে শোনেনি, সে বলছে, আবেগে কম্পিত-কণ্ঠে বলেনি, সহজ সুরে সহজভাবে বলেছে, I lived with him too long! I love him too much to squabble over a girl!

এর পরে সবিতা যদি ইংরেজ নারী চরিত্র সম্বন্ধে কটাক্ষ করেছে, দেবেন্দ্র বলেছে, তুমি যদি আইলীনকে চিনতে তবে কখনও ইংরেজ চরিত্র নিয়ে তিক্ত কথা বলতে না।

দেবেন্দ্র সে জন্যই সবিতার অসন্তোষকে উপেক্ষা করে রুথ-এর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে। সবিতা তাও তর্ক করেছে, তুমি শুধু তোমার বউদিকে ভাল দেখেই দুনিয়ার ইংরেজকে ভাল দেখছ।

শুধু বউদিকে নয়। তবু ধরেই নিলাম একজনকে কেবল দেখেছি।

তফাৎ হচ্ছে তুমি পাঁচজন ইংরেজকে বাইরে থেকে দেখ তাদের টুকরো টুকরো ব্যবহার নিয়ে, তাও তোমার মতে যা খারাপ, তাকে জেনারালাইজ করছ। দেবেন্দ্র সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলেছে, সবিতা, পাঁচ জনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভাল বা মন্দ বিচার করা খুবই সহজ, নিজের চিন্তা খরচ করতে হয় না, কিন্তু আর যাই কর আমি অনুরোধ করব, ও ভুল আর অন্যায় তুমি করো না।

বাঃ, গলা মেলানোটাই শুধু দেখলে তুমি? সবিতা বলে, রাস্তায় যে দশজনকে দেখলাম তাদের সকলকে তো আর ভাল করে জানার সুযোগ হচ্ছে না, তার বাইরের ব্যবহার দেখেই তো তাকে বিচার করব। তোমার মতে তো তাহলে প্রত্যেকের সঙ্গে এখন ঘর করতে বসতে হয়।

ঈশ্বর রক্ষা করুন তোমাকে। দেবেন্দ্র ছদ্ম আতঙ্কে বলে উঠেছে। সবিতা হেসেছে। দেবেন্দ্র আবার বলেছে, রাস্তার দশজনই কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে?

না। সবিতাকে স্বীকার করতে হয়, করে না।

আর যদি দশজনই খারাপ ব্যবহার করে, তবে বুঝতে হবে তোমারই কোথাও গণ্ডগোল আছে। অবশ্য বলতে পার, দক্ষিণ আমেরিকায় বা দক্ষিণ আফ্রিকায় নিগ্রোদের অবস্থার কথা! সে তাদের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, স্বার্থবোধকে প্রকাশ করছে, তাতে করে গোটা মানুষ বা গোটা দেশ কি খারাপ হয়ে গেল?

হলো না কি?

না সবিতা, প্রতি মানুষের যেমন ভাল খারাপ দিক আছে প্রতি জাতিও মন্দ ভাল নিয়েই তৈরি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম, দর্শন এ সব নিয়েই জাতির শক্তি আর দুর্বলতা—একটা পয়সারই দুটো দিক!

সবিতা কিন্তু দেবেন্দ্রর এই অনুরোধটি রেখেছে, পাঁচ জনের সঙ্গে গলা মেলাবার সহজ চিন্তাহীন পথ সে বেছে নেয়নি।

ব্যাঙ্কের জমা খরচে আইলীনের নামে মাসোহারা ছাড়া আর কোনও স্ফুট অভিব্যক্তি সে রেখে গেল না শচীন্দ্রর জীবনে। আইলীন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে হোটেলে উঠে গেল, লণ্ডনের সাবার্বে সামার হাউস কিনে তাকে বহু খরচায় ইন্টিরীয়ার ডেকরেটরের সাহায্যে শীতোপযোগী করে মার্গারীটাকে বিয়ে করে দুজনে উঠে গেল সেখানে। এর পরের পাঁচ বছর শচীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে তুলনা করা যায় পাহাড়ের চূড়া, উপত্যকা, চূড়া, তারপরেই খাদ—এই ল্যাণ্ডস্কেপের সঙ্গে। মার্গারীটাকে বিয়ে করে শচীন্দ্রনাথের মনে হলো তার বিগত উনচল্লিশ বছর সে শুধু আয়োজন করেছে মার্গারীটাকে তার জীবনে আহ্বান করার জন্যই। নিষ্ঠুর জীবন সংগ্রামে তার জীবনের যত দারিদ্র্য, অন্যায়, পাপ, অপমানবোধ, অমানুষিক পরিশ্রম—মার্গারীটার পূজার উপাচারে তারা একে একে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। মার্গারীটাকে অদেয় কি আছে, তার জন্য সামার হাউস কেনা, প্যাকার্ড গাড়ি কেনা এ-তো তুচ্ছ প্রকাশ মাত্র। তার ধনের একমাত্র উপযুক্ত সদ্ব্যবহার!

সোজাসুজি বলার সাহস কারুর নেই, তবু সজ্জন অসজ্জন বন্ধু-বান্ধব, একদা বান্ধবী তারা হুঁশিয়ার করবার চেষ্টা করল। মার্গারীটা পর্যন্ত বললে, এ তুমি করছ কি? লোকে যে বলবে, তোমাকে আমি তোমার টাকার লোভে বিয়ে করেছি। আমি তো ফার কোট চাইনি জীবনে, যারা ফার কোট পরে আর যারা পরে না তাদের ছবি যদি আঁকতে পারি, তবেই আমি খুশি!

নিশ্চয়। তোমার উচ্চাশাকে সফল করব আমি কথা দিচ্ছি। আর ফার কোট? শচীন্দ্র বললে, না, ওতো কেবল আমার পূজার উপাচার!

শচীন্দ্রনাথ কথামতো কাজ করতে আরম্ভ করল। শচীনের পাবলিসিটি বন্ধু শো-আর্ট-থিয়েটর ইত্যাদির সঙ্গেও যুক্ত, সে ভার নিলে প্রচারের। শচীন গ্যালারী ভাড়া করে মার্গারীটার প্রট্রেট

পেন্টিং একজিবিশন খুলে দিলে। হৈ হৈ পড়ে গেল না। তবে লোকে আসল বৈ-কি! নানা ব্যবসাসূত্রে শচীন্দ্রনাথ আর্ট ডিলার, আর্ট ক্রিটিক, শো বিজনেসের লোকদের অনেককেই চেনে, তারা সবাই এল উদ্বোধনী কক্‌টেল পার্টিতে, এল ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী লেখক! ছবির গুণ সম্বন্ধে কেউ কেউ দ্বিমত হলেও তারা স্বীকার করল, মার্গারীটা সত্যিকারের শিল্পী। তারচেয়েও বড় কথা, মার্গারীটাকে সবাই একবাক্যে বললে; Charming!

শচীন্দ্রনাথ গর্বে, আনন্দে, প্রেমে আর নবলব্ধ দীর্ঘ পেলব ব্লণ্ড সুইডিশ স্ত্রীকে নিয়ে দেশে বিদেশে, লণ্ডনের সোসাইটিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একজিবিশন দিল প্যারিসে, স্টকহলমে, হাউডেল-বার্গে, আবার লণ্ডনে। কিছু আর্ট ক্রিটিক মার্গারীটাকে গুণী বলে স্বীকার করলে। একটা-ছুটো করে কাজ আসতে লাগল, ধীরে ধীরে মার্গারীটার ভক্তমণ্ডলী গড়ে উঠতে লাগল। বিবাদের খাতের সূত্রপাত সেইখানে।

প্রথম দুই বছর মার্গারীটাময় হয়েছিল শচীন্দ্রর জীবন। সুখের দুই অবস্থায় শচীন্দ্রনাথ দোদুল্যমান, একাধারে অস্থির মাদকতা, সুখের তীব্র অনুভূতিতে চঞ্চল, অন্যধারে প্রগাঢ় প্রশান্তি, সর্বপ্রাপ্তির নিবিড় আলস্যে স্থিত।

বিবাহ সার্থক হয় তখনই, যখন জীবিকা আর চারিপাশের মানুষের দাবীর প্রয়োজনের সামঞ্জস্যে দুটি প্রাণী একান্ত ঘর ছড়িয়ে আত্মস্থ হতে পারে। শচীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশ বেড়িয়ে এসে জোর করে চোখ খোলবার চেষ্টা করে দেখলে, তার অলক্ষ্যে ব্যবসা টলমলো। সে আবার উঠে-পড়ে লাগল, অবসর সময় সে চাইল মার্গারীটাকে। মার্গারীটা বললে, আমি আঁকব।

শচীন্দ্রনাথ হয়তো বললে, চল আজ একটা পার্টি আছে Savoy-এ।

মার্গারীটা বললে, আমার আর্ট ক্রিটিকদের পার্টিতে নিমন্ত্রণ আছে।

মার্গারীটা বললে, আমি মাদ্রিদে যাচ্ছি একটা assignment নিয়ে।

শচীন বললে, তোমার তো টাকার অভাব নেই।

মার্গারীটা বললে, আর্টিস্ট এক জায়গায় পড়ে থাকলে কখনও বড় হতে পারে না। টাকার প্রশ্ন বড় নয়।

শচীন্দ্রনাথ নিশ্বাস ফেলে বললে, বেশ চল তাহলে।

মাদ্রিদের কাজ হয়ে গেলে, ছ-মাস পরে মার্গারীটা বললে, আমি হামবুর্গে যাচ্ছি।

শচীন্দ্রনাথ দুর্বলভাবে আপত্তি করলেও এবার আর নিজে গেল না।

মার্গারীটা শচীন্দ্রনাথের কোন পার্টিতে যেতে চায় না, সে একদিন সোসাসুজিই বললে, Business people! They bone me to death.

Oh, really! শচীন স্ত্রীকে আলিঙ্গন মুক্ত করে দিয়ে বললে।

তন্বী তরুণী শিল্পী-স্ত্রী স্বামীর আঘাতের গুরুত্ব না বুঝে হেসে উদার হয়ে ঠাট্টার সুরে বললে, Of course present company is accepted!

'প্রেজেন্ট কম্পানী' কিন্তু একাই বো-টাই পরে ডিনারে চলে গেল।

শচীন্দ্রনাথ সাড়ে-তিন বছর পরে আবার অন্য মেয়েদের দিকে প্রথম ঔৎসুক্য নিয়ে তাকালে। চার বছরের সময়ে সে সঙ্গিনীকে বললে, Let's go for a drive!

মার্গারীটাকে তখন সুখ্যাতির নেশায় পেয়েছে। ভক্তমণ্ডলীর গুঞ্জরণের ফাঁকে গুজব কানে আসলেও, মনে রাখল না সে। কিন্তু এক উইক এণ্ডে যখন শচীন ফিরে না এসে বাটলারকে ফোন করে বললে অনুপস্থিতির অজুহাত, মার্গারীটা ছাড়ল না এবারে। শচীন ফিরে আসতেই বললে, What are you upto, may I know?

শচীন্দ্রনাথের বলতে ইচ্ছে গেল, I am upto, nothing,

sweet ! আমি শুধু তোমার ভালবাসা চাই, আমার জীবনে তোমাকে সর্বস্ব করে পেতে চাই।

তোমার কি মনে হয় ? ব্যঙ্গস্বরে বললে শচীন্দ্র।

মার্গারীটা রাগে ভেঙে পড়ে বললে, তুমি কি বদলাবে না ?

শচীন্দ্রনাথের দ্বিধা কোথায় গেল, সে দুই হাতে মার্গারীটাকে বুকে জড়িয়ে বললে, বদলাব মাটি, সে মার্গারীটাকে আদর করে মাটি বলে ডাকত, তুমি যদি আমাকে কৃপা কর।

মার্গারীটা তার অপরূপ মুখ তুলে চোখের জলে উজ্জ্বল নীল চোখে বললে, তোমার জন্যই তো আজ আমার সব, আমার নাম, আমার আরাম, আমার—

শচীন্দ্রনাথের হাত শিথিল হয়ে এল। সে এই একই কথা স্বার্থপর মূর্খের মতো আইলীনকে বলেছিল, আজ এই প্রথম বুঝতে পারল তার প্রথম স্ত্রীর ব্যথা। সে বললে, নাম আর আরাম এতেই তোমার সুখ !

মার্গারীটা সুস্থির হয়ে বসে স্বামীর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললে, মিনতি করে, Please, Alskling, you know I didn't mean that. Dont be so sensitive like a grown up baby ! You know. I love you Sachi ! I love you !

জানি হয়তো। কিন্তু জানাটা শুধু সান্ত্বনা। তোমাকে আমি কাছে পাই না। আমি ডাকলেই তুমি ব্যস্ত থাক। আমার বন্ধুরা তোমাকে bore করে ! এদিকে অন্যদের নিয়ে—

You have no reason to be jealous ! মার্গারীটা বললে, আমি যদি কেবল তোমার ঘর সংসার করা স্ত্রী হতাম, তোমাকে উপেক্ষা করে অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, তাহলে তুমি বলতে পারতে। দেখ, মার্গারীটা শান্ত হয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে, তোমার জীবিকা, তোমার কাজ যেমন তোমার কাছে প্রিয়, তেমনি—

শচীন্দ্রনাথ কথা শেষ করতে দিল না, একটি মুগ্ধ আলিঙ্গনরত হাত পেছনে ব্লাউসের বোতাম খুঁজে, তপ্ত আবেগে মাটির অবিভক্ত

ঠোঁটে, ওর মুক্তোর মতো দাঁতে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে দিতে বললে, Let's just love! My beautiful angel—

মাটি অবশ বেদনায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে স্বামীর কানে মৃদু গুঞ্জন করে বললে, My passion! Oh my love! Alskling! (প্রিয়তম)।

মেড কফি নিয়ে ফিরে গেল, ফোন বেজে চলল, বাটলার দরজায় নক করতে গিয়ে নক না করে শিষ দিতে দিতে ফিরে গেল! মাটির ভক্তমণ্ডলী বৃথাই অপেক্ষা করতে লাগল বারান্দায়।

কিছুদিন মনে হল সব ঠিক হয়ে গেছে। মধুচন্দ্রিমা ফিরে এসেছে নতুন করে। কিন্তু ক-সপ্তাহ পরেই খাদ এবার গভীরতর হলো আরো। মার্গারীটা পুনরুৎসাহে মন দিলে পেন্টিং-এ। পেন্টার ফিরে এল, ফিরে এল ক্লায়েন্ট, ফিরে এল আর্ট-ক্রিটিক। শচীন্দ্রকে ডাকল সে স্টুডিওতে, ডাকল আসরে। শচীন্দ্রনাথ দু-তিনদিন চেষ্টা করে বসে, সরে পড়ল। বিভিন্ন রকমের আর্টিস্টদের আসরে শচীন্দ্রনাথ মিশতে পারে, কিন্তু ইনটেলেকচুয়েলদের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যায় এবং সূক্ষ্ম এ্যাবস্ট্র্যাক্ট তর্কে, শচীন্দ্রনাথ সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করে উঠতে পারল না। আর সে আজ এমন পর্যায়ে উঠে এসেছে যে সে যখন কথা বলে, তখন যদি শ্রোতার মনোযোগ না পায়, তার পক্ষে সে আসরে বসে থাকা সম্ভব নয়। আরো দু-একবার সেতু পড়ল খাদের ওপর, টিকল না ঝড়ে।

শচীন্দ্রনাথ একদিন শান্তভাবে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বললে, মার্গারীটা আমি ভেবে দেখলাম, এভাবে আর একসঙ্গে থাকা চলে না।

নারী-ঘটিত? মার্গারীটা অন্যমনস্কভাবে ব্যঙ্গ করার চেষ্টায় বললে।

না। শচীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের হুল উপেক্ষা করে বললে, আমরা দু-জনেই চেষ্টা করেছি, হয়নি।

আমি তোমাকে ছেড়ে কোনদিন থাকতে পারব না। মার্গারীটা, উঠতে উঠতে উত্তেজিত হয়ে বললে, আমি তোমাকে ভালবাসি সচি।

শচীন সযত্নে ওর হাত ধরে বললে, বস, বসে খাওয়া শেষ কর।

মার্গারীটা লক্ষ্মী মেয়ের মতো আবার বসে পড়ল।

আমিও তোমাকে ভালবাসি। শচীন্দ্রনাথ ওর ভাবের বাষ্পে ঈষৎ অস্বচ্ছ কালো চোখ, আতঙ্কে স্বচ্ছ নীল চোখে রেখে দিয়ে বললে। একেবারে প্রথম যৌবনে ভালবেসেছিলাম আইলীনকে। তারপর তুমি ছাড়া এমনভাবে কেউ আমাকে পূর্ণ রিক্ত করে দিতে পারেনি?

তোমার কি অনুতাপ হচ্ছে আইলীনকে ডিভোর্স করে?

না, মাটি, শুধু দুঃখ হয়, ওর goodness-কে যথেষ্ট সমাদর করতে পারিনি, সে জন্যে। তুমি আমার জীবনে আসার বহুদিন আগেই ওকে আমার মুক্ত করে দেওয়া উচিত ছিল। শেষের ক-বছর ওর অস্তিত্ব আমার জীবনে এত বিলুপ্ত হয়ে এসেছিল যে সেই অনাদর আর উপেক্ষা থেকে সে অন্তত বাঁচতে পারত।

(শচীন্দ্রনাথ কি করে জানবে,—'আমরা দুজন একটি গাঁয়েই থাকি'—সেই সুখের সান্ত্বনায় আইলীনের জীবন ভরে ছিল, আত্ম-প্রসাদ ছিল স্ত্রীর অধিকারে শচীন্দ্রনাথের রেস্টুরেণ্টে কাজ করায়।)

শচীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপচাপ বেকন কেটে কেটে, কাঁটায় বিন্‌স বিঁধিয়ে খেতে থাকে। তারপরে মুখ না তুলেই ধীরে ধীরে বলে, We are both ambitious, আমি যদি ব্যবসা ছাড়ি, আমার কোন মূল্য থাকবে না আমার কাছে, তুমি যদি পেন্টিং করা ছেড়ে দাও, তুমি আর তুমি থাকবে না।

মার্গারীটা সন্দিগ্ধভাবে বললে, কি বলতে চাইছ তুমি?

আমি বলতে চাইছি, শচীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মনোযোগসহকারে একটি একটি করে বিন্‌স মুখে দিতে-দিতে বললে, আমাদের দুজনের জীবন-যাত্রার ধরন সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন; কোন ভাবে, কোন দিকে মিল নেই। শচীন্দ্রনাথ অনুত্তেজিতভাবে বলার চেষ্টা করে বললে, আমি সিদ্ধান্তে

এসেছি, সার্থক বিবাহিত জীবনে ভালবাসাই একমাত্র সেফ গ্যারান্টি নয়, সে জন্যে আমার মনে হয়—

মার্গারীটা কাপ ছুঁড়ে বললে, আমি তোমাকে ডিভোর্স দেব না, দেব না, দেব না—বাটলার কাপ ভাঙার শব্দে ছুটে আসতে, শচীন আস্তে আস্তে বললে, আরেকটা কাপ এনে দাও মিসেস ব্রাটকে। কাঁচ ভাঙা পরে তুলে নিও আমরা চলে গেলে।

Certainly, Sir! বাটলার নতুন কাপ সসার এনে, বাউ করে ঘর ছেড়ে চলে গেল ভেতরে!

দু-তিন সপ্তাহ পরেই মার্গারীটা সলিসিটরের চিঠি পেল, ডিভোর্সের আবেদন করে। দেবেন্দ্র তখন বিয়ে করে সবিতাকে নিয়ে এসেছে, লণ্ডনে দাদার হুকুমে। সে আইলীনের কাছে নিজে ছুটে গিয়েছিল, দেবেন্দ্রর মনে পড়ল, আর এবারে সে গেল তলব পড়ায়।

দেবেন্দ্র মার্গারীতার স্টুডিওতে ঢুকে দেখে সে তার ছবি ছিঁড়ে, সব কিছু তছনছ করে স্তূপীকৃত জঞ্জালের মধ্যে ভূতের মতো বসে আছে। সে দেবেন্দ্রকে দেখে ছুটে তার হাত ধরে বললে, Damn him, why do I love him so! এর উত্তর কার বা জানা আছে?

আমাকে তুমি রক্ষা কর, আমাদের বিয়ে তুমি রক্ষা কর, ডেবু! I beg of you—

দেবেন্দ্র ওর হাত ছাড়িয়ে বললে, তুমি তো দাদাকে চেন, কারুর কথা তিনি কানে নেন না, একবার মন স্থির করলে!

একমাত্র তুমি বললে শুনবে।

দেবেন্দ্র ক্লান্ত হেসে, মাথা নেড়ে নিশ্বাস ফেলে বললে, তুমি বলছ যখন নিশ্চয় বলব। কিন্তু—

মার্গারীটা আবেগে, দেবেন্দ্রর গালে চুমু খেয়ে বললে, আমি জানতাম, তুমি না করবে না।

সবিতাকে বলার আগেই দেবেন্দ্র অনেক দ্বিধার পর বললে দাদাকে, মার্গারীটা বড় কষ্ট পাবে দাদা! ও আপনাকে—

শচীন্দ্রনাথ ভাল করে ছোট ভাইকে দেখে বললে, হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে, মুখ সরিয়ে রেখে, সব কষ্টই মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে। মার্গারীটাকে যদি এই দুঃখের হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম সুখী হতাম আমিই সবচেয়ে বেশি। শচীন্দ্রনাথ বললে না যে এ মধ্য বয়সে মার্গারীটার মতো স্ত্রীকে বিদায় দিতে তার আরো কত বেশি দুঃখই না হবে! সে গ্লাস হাতে রেখেই বললে, অন্যমনস্কভাবে, কষ্ট দু-দিনের। তোমার আমার কিছু করার নেই।

দেবেন্দ্র বুঝল দাদার ভদ্রভাবে বলা: তোমার নাক গলাতে আসার কোন প্রয়োজন নেই। অন্য কেউ বললে ধমকে ঘর থেকে বার করে দিত শচীন্দ্র।

যাক গে বাজে কথা। তোমার কাজ কিরকম চলছে? তোমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

না দাদা, আমরা ভালই আছি।

ভাল, ভাল। সবিতা চমৎকার মেয়ে! তোমার ভাগ্য ভাল।

হ্যাঁ, দাদা! দেবেন্দ্র স্বীকার করে।

সবিতা সব কথা শুনে বলেছিল, বেচারা মার্গারীটা! বেচারা দাদা! বিয়ে করে আর সুখী হতে পারল না। ডিভোর্স করে কি পারবে?

দেবেন্দ্র কোন উত্তর দেয়নি। নিজের চিন্তায় ডুবে গেছে। মার্গারীটা অনেক যুদ্ধ করে, শেষ পর্যন্ত মোটা মাসোহারায় রফা করতে রাজি হয়ে বিদায় নিল শচীন্দ্রনাথের জীবন থেকে। ডেইলী মিররের প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে ছবিসহযোগে খবর বেরুল, Blonde Scandinavian Beauty Weeps At The Court —রূপসী প্রোর্ট্রেট পেন্টার মার্গারীটা কাঁদছে তার ধনবান ভারতীয় স্বামীর জন্য! সে মাসোহারা চায়নি, রিপোর্টারকে মার্গারীটা নাকি

বলেছে, আমি চেয়েছিলাম স্বামীর প্রেম ! আমার ভারতীয় স্বামীর প্রেম !

জীবনী বেরিয়েছে শচীন্দ্রনাথের।

শচীন্দ্রনাথ যেন ক্ষেপে গেছে। সামার-হাউস বিক্রি করে দিলে, বিক্রি করে দিল প্যাকার্ড, বিদায় করে দিলে মেড, বাটলার, উর্দীপরা শোফারকে, লণ্ডনে পিকাডিলীর এক হোটেলে নতুন করে মধ্য বয়সে শুরু করলে ব্যাচেলার লাইফ, বন্ধন রইল না কিছু। অন্যান্য সমস্ত রেস্টুরেণ্ট বিক্রি করে একমাত্র নটরাজ রেখে, বাড়ি কেনা-বেচার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করলে !

বিবাহিত জীবনের ওঠা-পড়ায় ক্ষতি হয়েছিল, তার চতুর্গুণ লাভের প্রতিজ্ঞায় সে সমস্ত ব্রিটেনের হেলথ রিসর্ট প্রদক্ষিণ করে পছন্দ মতো জায়গায় পুরনো বাড়ি কিনে অপূর্ব ইটালীয়ান কায়দায় সামার হাউস তৈরি করে ভাড়া খাটাতে লাগল।

সবিতা দেবেন্দ্রকে বললে, কি করবে দাদা অত টাকা করে? দাদাকে একটু থামতে বলো !

বন্ধুরাও ঠাট্টা করে বললে, সাচী অত টাকা করে তুমি করবে কি?

শচীন্দ্রনাথ হুইস্কির গ্লাস সাবধানে কাউণ্টারে রেখে বললে, টাকা, টাকা ! টাকা করাটাই তোমরা দেখ। আরে, টাকা করা তো বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে কিছু করা এবং যা তুমি করছ, হুইস্কি একটু সিপ করে শচীন্দ্রনাথ বলতে থাকে, যা তুমি করছ তাকে মন-প্রাণ দিয়ে আরো বড় করে তোলা, আরো ভাল করা, আরো ছড়িয়ে দেওয়া, সেই হচ্ছে জীবনের ড্রাইভ, বেঁচে থাকার একমাত্র জাস্টিফিকেশন !

অদূরে দাঁড়ানো ইংরেজ ব্যাঙ্কার বন্ধু এতক্ষণে সচেতন হয়ে বললে, কি বলছে, সাচী? মনে হচ্ছে বক্তৃতা দিচ্ছে।

চির অনুগত পাবলিসিটি বন্ধু হেসে বললে, আরে শুনলে না তো

সাচীর জীবন দর্শন ! Any way this occasion calls for another round !

বার এ্যাটেণ্ডারের ডাক পড়ল ।

শচীন্দ্রনাথ ভাইদের কখনও নারীসংক্রান্ত কথা বলেনি, কিন্তু দীনেন অক্সফোর্ড-এ যাবার আগে তাকে বলেছে, I am all for pretty girls, but make sure her brain is in the right spot ! বুদ্ধির কলটা ঠিক জায়গায় আছে কি না দেখে নিও। সৌন্দর্য আর বুদ্ধিহীনতা, এ দুটো সমন্বয়ের খপ্পরে পড়লে, a man is a goner !

শচীন্দ্রনাথ সেদিন মুড-এ ছিল, দীনেন্দ্রনাথকে প্রথম হুইস্কির গ্লাস হাতে দিয়ে বললে, চিয়ারস !

চিয়ারস ! দীনেন গ্লাস ঠুকে খুশি হয়ে বললে ।

Man is essentially alone । শচীন্দ্রনাথ গ্লাস উঠিয়ে বললে, This will go a long way to your lonely struggle ! সেজন্য ভেব না, তোমার ড্রিঙ্কস-এর জন্য আমি পকেট-মানি দেব ।

দীনেন মনে মনে বললে, এই তেতো গলাজ্বালা-করা ওষুধের জন্য আমার পয়সার দরকার হবে না । নিজের সম্বন্ধে মানুষ কতটুকুই বা জানে !

হ্যাঁ, কি বলছিলাম, women, মামা বললে ভাগ্নেকে, they are exquisite creature, বিধাতার অপরূপতম সৃষ্টি, কখনও সময় আসবে, ঘটনা ঘটবে, you will think worst of them, কিন্তু কখনও তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ কর না, never—

সরু মোটা, বোকা চালাক, ফরশা কালো, কোন মেয়েই শচীন্দ্রনাথের কাছে কোনদিন অভদ্র ব্যবহার পায়নি । কেউ সাহায্য পেয়েছে, কেউ পেয়েছে মর্মবেদনা, কেউ পেয়েছে আশা, কেউ হতাশা । অর্থাৎ শুধু হাতে কেউ ফিরে যায়নি !

গীতিকে নিয়ে গেছে সবিতা শচীন্দ্রনাথের কাছে। এর পরে সবিতাকে ছাড়াও গীতি গেছে, কখনও ক্লাসের ফাঁকে লাঞ্চ খেতে একসঙ্গে, কখনও বা এমনি। বাঙালী ছাত্র বন্ধুমহল ঈষৎ ঈর্ষ্যা, ঈষৎ ইঙ্গিতভরে গীতিকে বলেছে, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে মেশো তুমি? সাবধান!

দূর, বয়স্ক ভদ্রলোক!

বয়স্ক তো কি হয়েছে! আরো বেশি সাংঘাতিক!

আমার কাছে তো সাংঘাতিক মনে হয় না!

বলো না পরে, সাবধান করে দিইনি!

গীতি হাসে। বলে গিয়ে সবিতাকে। সবিতাও হাসে। সবিতার সব বাঙালী বন্ধুরাই বিশেষ এক ধরনের ঔৎসুক্য নিয়ে তাকে শচীন্দ্রনাথের কথা জিজ্ঞাসা করে; সবিতা তাদের কোন মুখরোচক গুজবের খোরাক যোগাতে নারাজ।

শচীন্দ্রনাথ বাঙালী মহলের আসল আড্ডা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। এখনও বহু বাঙালী ছেলে আসে তার কাছে, মেয়েরাও, সাহায্যের দরকারে, অর্থের বা চাকরির। বাংলা দেশের এক বিখ্যাত অভিনেত্রী লণ্ডনে এসে দেখা করল শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে। নাম, দুর্নাম সে শুনে এসেছিল, মনে করেছিল ওরিয়েণ্ট সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে যাবে শচীন্দ্রনাথ; সে চেয়েছিল তার সাহায্যে লণ্ডনের থিয়েটার অথবা টেলিভিসনে ঢুকতে। শচীন্দ্রনাথ একেবারে যে চেষ্টা করেনি তা নয়, কিন্তু খুব ভরসা নিয়ে করেনি, তাই আন্তরিকতা ছিল না চেষ্টায়। শচীন্দ্রনাথ ওর অভিনয় দেখেনি কোনদিন, বাংলা দেশের বি.এ. পাশ হলেও ইংরেজীতে কথা বলতে গিয়ে পাঁচবার ঢোঁক গিলতে হয় তাকে। বাংলাদেশে ওর ফিগার সুন্দর বললেও ওর অসমতল মেদবৃদ্ধি দেখে শচীন্দ্রনাথ গীতিকে বলল, আমাদের দেশের মেয়েরা স্বাস্থ্যচর্চা করতে জানে না। ভিভিয়েন লে-র এতো বয়স হয়েছে, ওর শরীরের গড়ন দেখলে কেউ বলবে? সে যাই হোক বঙ্গ-অভিনেত্রী কয়দিন

লাঞ্চ খেল শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশায় আশায়। এর পরে পঙ্গু শচীন্দ্রনাথ যখন দেশে ফিরে গেল বিধ্বস্ত দেহ-মন নিয়ে, খবর দিলে অভিনেত্রীকে, বহু দিনের চেষ্টায় সুখ্যাত তারকা মাত্র পাঁচ মিনিটের দর্শন দিয়ে মনে করল শচীন্দ্রনাথকে সে ধন্য করে দিয়ে গেছে! কিন্তু সে আরেক ঘটনা।

পৃথিবী যখন শচীন্দ্রনাথের দুই স্বর্ণ মুঠিতে তখন এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল। শচীন্দ্রনাথ গাড়ি নিয়ে কখনও বেরোয় না রাত্রে, দূরে যেতে হলে ক্যাব নেয় নইলে হেঁটেই এ পাড়া থেকে ও পাড়ার বার-এ যায়। সে রাত্রে কি হলো কে জানে, খবর পেল তার এক বহু পুরাতন বন্ধু বিখ্যাত ভারতীয় জার্নালিস্ট সোম-এর হার্ট-এর কব্জা বিগড়ে হঠাৎ পঙ্গু হয়ে গেছে। শচীন্দ্রনাথ বন্ধুদের সঙ্গে প্রাইভেট বার-এ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকুলে (ফরাসী রেড ওয়াইন) পান করছিল, রাত্রে খেতে যাবার আগে, খবর পেয়ে সে বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। বন্ধুরা বললে, ক্যাব ডেকে দিচ্ছি। শচীন্দ্রনাথ বললে, না আমি ড্রাইভ করে যাব। বন্ধুদের বারণ শুনলে না। শচীন্দ্রনাথ সকাল থেকে আরম্ভ করে রাত পর্যন্ত মদ্যপান করে, কেউ তাকে কখনও মাতাল হতে দেখেনি, হয়তো দিনের শেষে গ্লাস ধরতে গিয়ে ঈষৎ হাত কেঁপেছে, এই পর্যন্ত!

শচীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস ছিল স্টিয়ারীং ধরেও তার হাত কাঁপবে না। কিন্তু জীবনে এই প্রথম তার বিশ্বাস বিশ্বাসঘাতকতা করল। কার এ্যাকসিডেন্টে শচীন্দ্র হাসপাতালে আশ্রয় নিল দশ মাসের জন্য, একটা পা কেটে বাদ দিতে হলো, হাত ভেঙে থাকল। সমস্ত দেহ দুমড়ে মুচড়ে এমন অবস্থায় দাঁড়াল কেউ ভাবতে পারলে না, শচীন্দ্রনাথ আর কোনদিন মানুষের মতো লোকসমক্ষে দাঁড়াতে পারবে এসে! ডাক্তার, নার্স, সকলকে অবাক করে দিয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে শচীন্দ্রনাথ সেরে উঠতে লাগল। এতোদিনের মদ্যপানাক্রান্ত লিভার বেঁকে বসল।

একটু সেরে উঠতে আরম্ভ করলে, মণীন্দ্রনাথ দাদাকে গীলফোর্ডের সামনে ফার্নহামের কটেজ হাসপাতালে নিয়ে এল। দেখা-শোনা করতে তার সুবিধা হবে।

শচীন্দ্রনাথ আজীবন দ্রুত ড্রাইভে প্রাণপণ ছুটেছে, অসুখ করেনি কখনও তা নয়, একটু সেরে উঠতেই হিসেব-পত্র নিয়ে বসেছে ম্যানেজার, একাউন্টেন্ট, পাবলিসিটি অফিসার, সেক্রেটারীর ডাক পড়েছে। কিন্তু এবার শচীন্দ্রনাথকে থামতে হলো, বসে পড়তে হলো। চাকাওয়ালা চেয়ারে নার্স রুগীকে বাগানে রেখে যায়। প্রথম প্রথম লণ্ডনের হাসপাতালে বহু বন্ধু পরিচিত আত্মীয় ভীড় করেছে, ফার্নহামে কারুর বড় একটা টিকি দেখা গেল না, সবাই ব্যস্ত নিজের কাজে, নিজের সমস্যায়, সময় কোথায় তিরিশ মাইল দূরে এক পঙ্গু বৃদ্ধকে দেখতে যাবার!

শচীন্দ্রনাথ সারাদিনই প্রায় একা একা বসে থাকে। অপেক্ষা করে থাকে কখন আসবে মণীন্দ্রনাথ, কখন আসবে মলি (শচীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী), এরা দুজনই নিত্য-নিয়মিত-ভিজিটর।

দিনগুলো কি মন্থর হয়ে গেছে, ভাব-ভাবনা, চিন্তা-অনুভূতির মালায় এক-একটি ফুলের মতো দিন একটি একটি করে শুকিয়ে ঝরে ঝরে খসে যাচ্ছে। কটেজ হাসপাতালের বাগানে বসে থাকে শচীন্দ্রনাথ সারাদিন ; যেদিন দিন ভাল থাকে দেখে, চেরী গাছের ঘন বাদামি পাতায়, রৌদ্রের উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলো বিগত কালের ভাল-বাসার স্পর্শের মতো এলোমেলো খেলা করছে। মনে কত রকমের ছবি ভেসে আসে! কোন মুখ, কোন ছোট্ট ঘটনা, ভুলে যাওয়া একটু ব্যথা, একটু ভালবাসা পাতায় ঝিলমিল করতে থাকে। কোথায় কে চলে যায়, একদা নিকট, নিকটতম মানুষ কে কোথায় চলে গেছে, জানতে মন চায়।

শচীন্দ্রনাথ কোন সময়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে, কখন বা পায়রার

খুঁটে-খুঁটে খাওয়া দেখে, চোখ বুজে আসে ক্লান্তিতে, চারদিকের আলো দপ করে নিভে যায়। হয়তো কোন শব্দে চোখ খোলে নার্স আসে চা নিয়ে অথবা আসে ফিসিওথেরাপিস্ট। পৃথিবী ফিরে আসে সবুজ নীল আর সোনা রঙের সুন্দর সমাবেশে ; ফিরে আসে বর্তমান অসাধ্যতার গ্লানি ; বুঝতে পারে শচীন্দ্রনাথ, চোখ দিয়ে, ঠোঁটের কোণ দিয়ে লালা গড়িয়ে ড্রেসিং গাউন ভিজে গেছে, ক্ষমতা হয় না পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মোছার, নার্স মুছে দেয় যত্ন করে। হয়তো বলে, দিনটি বড় সুন্দর আজ, না ?

এ বছর মনে হচ্ছে, শচীন্দ্র নিজেকে জোর করে কথা বলায়, এ বছর গ্রীষ্মকাল ভালই যাবে বলে মনে হচ্ছে।

অন্তত তাই আশা করা যাক, touch wood ! নার্স চেয়ারে হাত দিয়ে হেসে বলে।

মানুষ আর কি-ই বা করে ? শচীন্দ্রনাথ ভাবে—আশা করে, চেষ্টা করে আর আশা করে।

আশা করা, অপেক্ষা করা আর বসে থাকা। বসে থাকা আর ভাবা। টাকা পয়সার চিন্তা, ব্যবসার চিন্তা যে নেই তা নয়। কিন্তু তার অতি ধীরগতি ভাল হওয়ার সঙ্গে টাকার অঙ্কের যেন কোথায় গরমিল হয়ে যায়। বিগত জীবনের অসংখ্য ভুলে যাওয়া, আপাত-তুচ্ছ ঘটনা মনে ভীড় করে আসে। মনে পড়ে মার কথা, মার ছোট্ট একটু আদর, মার দুঃখ, মার চিন্তা—জীবনে মা যে আবার এত বড় হয়ে কোনদিন ফিরে আসবে শচীন্দ্রনাথ ভাবেনি। আত্মপর্যবেক্ষণ, আত্মদর্শনের শিক্ষায় শচীন্দ্রনাথের মনের চিন্তা গড়ে ওঠেনি। তাই সে কার্য-কারণ খুঁজে পায় না, খোঁজার সাধ্যও তার হয়নি এখনও। মনে করতে ভাল লাগে, ভাল না লাগলেও না-ভাল-লাগা স্মৃতি কোন ভেতর থেকে উঠে আসে কে জানে !

শুধু তাই নয় আস্তে-আস্তে শোনার কানও তৈরি হয়ে উঠছে শচীন্দ্রনাথের। মণীন্দ্র এলে নিজের থেকেই বড় ভাই হিসেবে জিজ্ঞাসা

করে তার পসারের কথা, তার সুখ-দুঃখ বাধা-বিঘ্নের কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। আগে ছোট ভাই যখনই দাদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে, দেখেছে লোকজন ঘিরে রয়েছে দাদাকে। ভাসা-ভাসা, উপর-উপর কুশল আদান-প্রদান হয়েছে, এই পর্যন্ত। শচীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে শুনল তার ডাক্তার ভ্রাতা খুব সামান্যই সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। তার ধারণা ছিল মণি দু-হাতে পয়সা করছে, আর জমাচ্ছে, যা জমাট প্র্যাকটিস শোনে লোকের কাছে। মণি বলে, প্র্যাকটিস ভালই। প্রাইভেট প্র্যাকটিস প্রায় নেই বললেই চলে। সরকারী ডাক্তার আমরা, রুগী পিছু uniform rate-এ টাকা পাচ্ছি। সে তার সর্দিই হোক আর ক্যান্সারই হোক।

অর্থাৎ যারা তোমার সার্জারীতে আসছে চিকিৎসার জন্য। শচীন্দ্র জানে মোটামুটি কিভাবে এদেশের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস চলে, তবু তার শুনতে ইচ্ছে যায় ভাইয়ের মুখ থেকে।

শুধু আসার ওপর নির্ভর করে না, রুগীর নাম আমার রেজিস্ট্রি খাতায় থাকলেই হলো, সে বছরে একবারও হয়তো না আসতে পারে, তবু তার নামের পিঠে আমরা টাকা পেয়ে যাচ্ছি।

সে তো ভালই।

ভাল তো বটেই। কারণ যে-সংখ্যক রুগী আসে তাদের নিয়েই আমাদের হিমসিম খেতে হয়।

তোমার কত পেশেণ্ট আছে?

ধরুন আমার তিন হাজার পেশেণ্ট আছে। গভর্নমেণ্ট আমাকে তিন হাজার পাউণ্ড দিচ্ছে বছরে। জানেনই তো এদেশের গলাকাটা ইনকাম-ট্যাক্স।

মায়ার পেছনে বছরে প্রায় পাঁচশ পাউণ্ড যায়, গাড়ি আছে, বাড়ির রেট দিতে হয়, একটি মেড কোনরকমে রাখা চলে, তাও আমাদের দু-জনকেই কিছু কিছু ঘরের কাজে সাহায্য করতে হয়। রোজগার করেও আরাম কোথায় বলুন?

হুঁ, হুঁ। শচীন্দ্রনাথ দুঃখের সঙ্গেই বলে, তুমি যদি দেশে ফিরে যেতে, আজ কত আরামেই না থাকতে পারতে, কত নাম হতো, দেশের উপকার হতো। দুজনে কিছুক্ষণ কথা বলে না।

নার্স এসে বলে, You are wanted on the phone, Doctor!

মণীন্দ্র উঠে চলে যায়। শচীন্দ্রনাথ বসে বসে ভাবে মণির কথা! ভাবে মানুষের জন্য মানুষ কতটুকু করতে পারে? সব ভাইয়েরা যতদূর লেখাপড়া করতে চেয়েছে তারা করেছে। দেবেন্দ্র ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান হয়ে প্রচুর ডিগ্রি নিয়েও জীবনে কিছু করতে চায়নি, ওর কিসের ক্ষোভ ছিল, কেন সে ভালবাসত না পৃথিবীকে, না কি ভালবাসত তার নিজের মতো করে, নিষ্ক্রিয় দর্শকের মতো ; যাক সে তো মরেই গেল। মৃত্যুশয্যায় যেন দেবেন্দ্র শান্তি পেল! হতভাগা! শচীন্দ্রনাথ কাঁপা ঠোঁটে বলে ওঠে।

নার্স পেছন থেকে এসে বললে, কিছু বললে কি?

এক গ্লাস জল দেবে? ড্রিঙ্কস বারণ।

দিচ্ছি।

নার্স জল খাইয়ে, মুখ মুছিয়ে চলে যায়!

সবিতা তাকে গ্রাহ্য করলে না! কেন সে ফিরে যাবে না দেশে? গুটি-কয় পাউণ্ডের জন্য উদয়াস্ত খেটে একা একলা ঘরে মাটি কামড়ে পড়ে আছে লণ্ডনের। কেন সে নিয়ে গেল না মায়াকে দেশে, মানুষ করত বাঙালীর মতো করে, তারপরে সে তো আছেই, উচ্চশিক্ষার জন্য ফিরে আসতে পারত এখানে। মানুষ কি ভেবে যে কি সিদ্ধান্তে আসে শচীন্দ্রনাথের জানতে ইচ্ছে করে। সে বুঝতে পারে না।

সবিতা এসেছিল এক রোববারে। শুকনো মুখ নিয়ে, উদাসীন চোখের দৃষ্টি! জীবনকে সে যেন কষ্ট করে কোনরকমে সহ্য করছে। জানতে চাইল শচীন্দ্রনাথ দেশে ফিরতে চায় না কেন, সে এখন কি মত বদলেছে?

না। সবিতা স্পষ্টস্বরে বলে, সে ফিরে যাবে না দেশে মায়ার লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত!

ওখানেও তো ইংরেজী স্কুল আছে! মণি যদি খরচ না দেয়, আমিই না হয় চালাব।

সবিতা কথা বলে না, ভাবে ভাসুর তো মায়াকে বোর্ডিং স্কুলে পড়াবার কথা আগে কোনদিন বলেননি! It is too late now—সবিতা মনে মনে বললে। শচীন্দ্রনাথ বুঝতে পারে না সবিতাকে, কিসের আকর্ষণে সে লণ্ডনে পড়ে আছে, সে কেন কথা বলে না, কি সে চায়—জানে না।

কিন্তু মায়া এল কাছে। এতদিন সে দূর থেকে ভিড়ের মধ্যে জ্যেঠুকে দেখেছে। এবার ছুটিতে বাড়ি ফিরতে মণীন্দ্র একদিন নিয়ে এল। শচীন্দ্রনাথ যাবার সময় বলে দিল, কাল তুমি ওকে দুপুরবেলা পাঠিয়ে দিও, বিকেলবেলা নিয়ে যেও। আসবে তো তুমি মায়া?

আসব। মায়া মাথা এলিয়ে বললে।

মায়া প্রায় রোজই আসত, বসে বসে ওর লেখাপড়ার স্কুলের বন্ধুদের গল্প বলত। আর শুনত জ্যেঠুর কাছে বাবার দেশের কথা। চাঁদপুর যে কেমন দেখতে, সেখানে লোকেরা যে কি ভাবে থাকে, কি খায় কি ঘরে থাকে, তার কোন ধারণাই ছিল না। সে আগ্রহের সঙ্গে শুনত আর জিজ্ঞাসা করত। কি ভাবে জ্যেঠু এল এদেশে, বাবা-মা এল, কাকারা এসে একজন পড়ে দেশে ফিরে গেল, দীনেন কি ভাবে এল, কেন। মায়া যেন অন্য জগতের গল্প শুনছে। ফিরে গিয়েই সন্ধ্যাবেলা ডাইরিতে লিখে রাখত সে সব শোনা কথা। শচীন্দ্ররও গল্প করতে ভাল লাগত, বলতে বলতে মনে হতো না, বহুদূর অতিক্রম করে আসা জীবন খুব বেশি দূরে সে ফেলে এসেছে। এই যেন সেদিনের ঘটনা, 'চল' বললেই সবাই মিলে ফিরে যাওয়া যাবে।

মায়া একদিন গল্প করতে করতে বললে, আমি বড় হলে একবার দেশ দেখে আসব।

তোমার দেশে গিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না ? জ্যেঠু উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করে।

থাকতে ? মায়া একটু ভেবে নিয়ে বলে, না দেখে তো বলতে পারছি না।

বেশ, শচীন্দ্রনাথ বলে বসে, তুমি আমার সঙ্গে বড়দিনের ছুটিতে চল, দেশ দেখে আসবে।

সত্যি জ্যেঠু ? মায়া মুখ উজ্জ্বল করে বলে, আমাকে নিয়ে যাবে ?

নিশ্চয়ই। জ্যেঠু আশ্বস্ত করে মায়াকে।

মণীন্দ্রনাথ পরের দিন একা আসলে শচীন্দ্রনাথ বলে, ভাবছি নভেম্বর নাগাদ দেশে যাব একবার ! চল না আমার সঙ্গে ! মায়াকেও নিয়ে যাব সঙ্গে।

মণির চোখের আলো দপ করে জ্বলে নিভে গেল।

ভাল কথাই তো বলছেন। কিন্তু এতো খরচ !

খরচের কথা কে বলেছে ! যাচ্ছ তো আমার সঙ্গে ;

মণি ইতস্তত করে বললে, আপনার এই অবস্থায় এতো খরচ করবেন ?

মরিনি তো ! শরীর খারাপ আছে, ভাল হবে। শচীন্দ্রনাথ আপন মনেই বললে, দেশ থেকে শরীরটা সারিয়ে আসি, আবার তো কাজে লাগতে হবে !

মণির ইচ্ছে হলো বলে, কাজ আর নাই বা করলেন দাদা। কিন্তু সে জানে কাজই দাদার জীবন, কাজের প্ল্যান করা, আর প্ল্যানকে কাজে গড়ে তোলা—এ ছাড়া শচীন্দ্রনাথকে ভাবা যায় না। মণি চুপ করে আছে দেখে শচীন্দ্র বললে, কি অন্যদের মতো তোমারও বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি কাজ করতে পারব, হ্যাঁ ?

কেন পারবেন না ? একটু সময় দেবে, এই যা !

হুঁ, হুঁ, শচীন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বললে। শরীর ভাল নয় এখন—আর সে জন্যই তো আমার সঙ্গে একজন ডাক্তার থাকা দরকার।

চল চল। তোমার জায়গায় লোকামের ব্যবস্থা করে, চল। একবার ঘুরে এস। তুমি তো একবারও দেশে ফেরনি এসে!

মণি বললে, আচ্ছা ভেবে দেখি! দাদা বুঝল, অর্থাৎ স্ত্রী রাজি হয় কি না জিজ্ঞাসা করে দেখি। শচীন্দ্রনাথ একটু দ্বিধাভরে ইতস্তত করে বললে, আর দেখি, দেশে যদি মন টেঁকে থেকেই যাব ওখানে। অবনও বলছে।

সে তো খুব ভাল কথা দাদা। অবন আপনার দেখা-শোনা করতে পারবে।

শচীন্দ্রনাথ কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে রাজি নয়, বললে দেখা শোনার এমন কি দরকার। সে একজন লোক এখানে রেখে দিলেই চলবে। গিয়ে তো দেখি—

মণি গিয়ে রুথকে বলতেই সে কিন্তু খুব উৎসাহ দেখাল:

বেশ তো ঘুরে এস না কেন! কাগজে বিজ্ঞাপন দাও Locum পেয়ে যাবে।

সবিতাও রাজি হলো, তার মতামত যে সঠিকভাবে কেউ চেয়েছে তা নয়, এক মায়া ছাড়া। তবুও সে খুশিই হলো, মায়ার দেশ দেখার সুযোগ হচ্ছে বলে।

শচীন্দ্রনাথ গেল দেশে, সঙ্গে গেল মণি, মায়া। তিনজন তিন ভাবনা নিয়ে পাড়ি দিল দেশে। শচীন্দ্রনাথ গেল অক্লান্ত, বিশৃঙ্খল জীবনের শেষে স্থায়ীত্বের সন্ধানে; মণীন্দ্রনাথ চলল পরিত্যক্ত দেশের অভিমান ভাঙাতে; আর কিশোরী মায়া গেল তার মাতৃভূমি আবিষ্কারের তরুণ স্বপ্ন নিয়ে।

সাত

মায়ার ইংলিশ চ্যানেল পারাপার

তিনমাস পরে মায়াকে সবিতা দেখে আরও বেশি খুশি হলো। সে যেন একটু বদলে গেছে। প্রশ্ন করে করে কথা বলাতে হয় না।

বাড়িতে লোক এসে আলাপ করে, আপ্যায়ন করে নিজের থেকেই। আপনা থেকেই তার গল্প, অজস্র কথা। অবনের ছেলে স্বপনকে তার খুব ভাল লেগেছে। ন্যাশনাল স্কুল সার্টিফিকেট দেবে দু-বছর পরে। কলকাতায় সে কি মশা রে বাবা! কিন্তু কি সুন্দর মাছ খেতে। কাকিমা কত আদর-যত্ন করেছে মায়াকে। কত লোকদের বাড়িতে তারা বেড়াতে গেছে। কি ভাল লোকেরা! যারা ইংরেজী বলতে পারে না স্বপন তাদের ইণ্টারপ্রেটার-এর কাজ করেছে।

কলকাতা বিশ্রী নোংরা না?

নোংরা! হ্যাঁ তা একটু আছে। মায়া সঠিক বলতে পারে না, পরিচ্ছন্ন নিউ আলিপুর থেকে বেরুলেই গাড়ি করে বেরিয়েছে। জীবনে কোনদিন ট্রাম দেখেনি। তাই একদিন শখ করে ট্রামে উঠেছিল। সে নোংরা দেখবে কোথায়? কখন?

গরীব লোক দেখনি?

ভিখিরি? হ্যাঁ—! বড়লোকদের বাড়ি যেতে দেখেছে, কিছু কিনতে গাড়ি দাঁড়ালে ভিখিরিরা ভীড় করে হাত পেতেছে। মায়ার পকেটমানি তো ভিক্ষা দিতেই গেছে। আর বাংলা দেশে চাকর-বাকরেই বাড়ি ভর্তি, যেমন বিচ্ছিরীভাবে ওরা থাকে, তেমন বিশ্রী ব্যবহার করা হয় ওদের সঙ্গে। এ সব সে দেখেছে, তবু তার ভাল লেগেছে বাবার দেশ, মার দেশ! জ্যেঠুর কাছে কত লোক কত দূর-দূর থেকে দেখা করতে আসত। বাড়ি সব সময় গমগম করছে। তারা চা খাচ্ছে, কফি খাচ্ছে, মিষ্টি খাচ্ছে। স্বপন মায়াকে বলেছে, এরা সকলে কখনো-না-কখনো জ্যেঠুমণির কাছে সাহায্য পেয়েছে, এখনো কেউ-কেউ তাঁর আর্থিক সাহায্যে সংসার চালায়।

জ্যেঠুমণির খুব দয়া না?

হুঁ। সবিতা মনে মনে ভাবে এ-কি দয়া, না-কি দয়া-দাক্ষিণ্য করে ভীড় হাতে রেখে দেবার জন্য দয়া দেখানো? সে তার ভাসুরের দয়া নেয়নি, অগ্রাহ্য করেছে, তাই শচীন্দ্রনাথের এতো ঔদাসীন্য—কই

দয়ালু তো বলে তার অসুখে-বিসুখে, জ্বালা-যন্ত্রণায় তাকে দেখতে আসে না, খবরাখবর করে না! খ্রীস্টমাসে, পুজোয় দেশ থেকে ফিরে এসে ভুলেও তার কথা মনে করে কিছু হাতে ধরে দেয় না।

মা তুমি আমার কথা শুনছ না!

না, না, শুনছি তো! সবিতা নিজেই অবাক হয়ে গেল তার অভিমান আর ক্ষোভের তীব্রতা দেখে। সে আশা করে কেন, সে আশা করে কোন্ স্পর্ধায়? সে নিজেই বা কি করে একদাপূজ্য ভাসুরের জন্যে?

মায়া দেশ থেকে ফিরে অল্পদিনের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। দেহে রেখার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইছে। সজাগ হয়ে উঠছে নিজের সম্বন্ধে। পরের ছুটিতে মার কাছে এসে বললে, মা আমার একটা দাঁত উঁচু, ঠিক করে দাও না!

মণিকে বলেছিস?

বলেছি। বলে সামান্য উঁচু দাঁতে ছেলেরা আরো ভালবাসে। আমাকে খালি ঠাট্টা করে।

আচ্ছা, মা হেসে বলে, নিয়ে যাব'খন! সস্নেহে মেয়েকে লক্ষ্য করে। তার কৃষ্ণ-সুন্দরী কন্যা। সে জানে বাঙালীরা তার মেয়েকে সুন্দর দেখবে না। সবিতার কিন্তু ভাল লাগে মায়ার উজ্জ্বল শ্যামল রং। মায়া বলে ওর ক্লাসের মেয়েরা ওর চুলের আর গায়ের রঙের কি হিংসেই না করে। তার জন্যে মায়ার কোন অহমিকা নেই।

বড় হয়ে উঠতে থাকার সময়ে মায়া সকলের 'ডারলিং' হয়ে বড় হয়ে উঠতে লাগল। বড় হতে লাগল আর সে সরে আসতে থাকল মার কাছে; মায়া সবিতার সখী, সবিতার বন্ধু। দ্বৈত-আনুগত্যে মায়া বড় হয়ে উঠেছে, বহু মর্ম-দুঃখে তাকে শিখতে হয়েছে দুই প্রতিপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখা। একদিকে তার মা, অন্যদিকে জ্যেঠু, কাকা, কাকীমা। একদিকে তার জন্মভূমি বাংলাদেশ, অন্যদিকে রসে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে

পরিপুষ্ট তার দেহ-মনের পীঠস্থান ইংলণ্ড ! সে ভালবাসে বাংলাদেশকে, সে ভালবাসে ইংলণ্ডকে। কাকে সে বেশি ভালবাসে সে জানে না, কাকে যে তার বেশি ভালবাসতে হবে এ প্রশ্ন তার মনকে আর আগেকার মতো বিড়ম্বিত, বিপর্যস্ত করে তোলে না !

মায়া স্কলারশিপ পেল রোডিন থেকে। কাগজে নাম বেরুল মায়ার। মণীন্দ্র একটা পার্টি দিল ওর বাড়িতে, শুধু আত্মীয়-স্বজনের জন্যে। শচীন্দ্রনাথ, সবিতা, দীনেন, তার স্ত্রী—সবাই জড়ো হলো মণির ছোট গরম বসবার ঘরে।

শচীন্দ্রনাথের আনা স্যাম্পেন দিয়ে টোস্ট করা হলো।

মায়া বললে, আমি ডাক্তারী পড়ব। স্বপন চিঠি লিখেছে, ও এবার ন্যাশনাল স্কুল সার্টিফিকেট দিচ্ছে। জ্যেঠু ওকে বিলেতে পড়াবে কথা দিয়েছে। ও বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে পড়বে। স্বপন হবে বৈজ্ঞানিক, আমি হব ডাক্তার।

মায়া বেবি-স্যাম-এর গ্লাস হাতে মার হাত ধরে জ্যেঠুর কাছে এসে বললে, জ্যেঠু, তুমি খুশি হয়েছ আমি ডাক্তার হব শুনে ?

নিশ্চয় মায়া ! শচীন্দ্রনাথ মায়ার নরম দীর্ঘ হাত নিজের একদা বলিষ্ঠ হাতে তুলে নিয়ে বললে, আরো খুশি হব তুমি যদি ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরে যাও।

মায়া দুষ্টু হেসে বললে, কেন জ্যেঠু, তুমি নিজে তো দেশে এক মাসের বেশি টিকতে পার না ! মার দিকে তাকিয়ে সে বললে, জ্যেঠু বিরক্ত হয়ে বলত, অসহ্য ! অসহ্য ! এ দেশে থাকলে আমার বয়স একশো বছর বেড়ে যাবে !

সে কথা সত্যি, প্রতিবছরে মন কেমন করে ওঠে। ছুটে যাই কিন্তু টিঁকতে পারিনে আমার নিরানন্দ, বিশৃঙ্খল দেশে। জ্যেঠু স্বীকার করে, সে জন্যই তো আমি চাই তোমরা ফিরে গিয়ে দেশটাকে বাসযোগ্য, আনন্দময় করে তোল।

মায়ার ইচ্ছে করল জ্যেঠুমণিকে জড়িয়ে আশ্বস্ত করে। সে শুধু

সস্নেহে বললে, যাব জ্যেঠু, যাব ফিরে। স্বপন যার কাছে প্রতিজ্ঞা করে আসছে সে-ও ফিরে যাবে। যাব, কাজ করব, কিন্তু—মায়া তার সুক্ষ্ম কৃষ্ণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে চিন্তিতভাবে বললে, কিন্তু চিরকাল থাকতে পারব কি-না জানি না। তোমার মতো হয়তো আমাকেও ইংলণ্ড বারেবারে ছুটে আসতে হবে। মন কেমন করে ওটার তাগিদে!

সবিতা মায়ার দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি যেখানে সুখী হবে, যেখানে তোমার ইচ্ছা করবে সেখানেই তুমি থাকবে মায়া!

আর তুমি?

আমি? সবিতা উত্তর দিল না, কারণ উত্তর তার জানা নেই। মায়ার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়ে সে ছেড়ে দিলে।

একদিকে পৃথিবীর পরিধি সঙ্কীর্ণতর হয়ে এসেছে, অন্যদিকে পেশাদার রাজনীতিকদের জটিল মস্তিষ্কের জটিল চিন্তায়, ক্ষমতা আর লোভের বিকারে কেবল মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা, সংশয়,—ভয়ঙ্কর সংঘর্ষসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সবিতার মতো অতি সাধারণ মেয়ে তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে—মানুষ ক্রমাগত অধিক সংখ্যায় সরে আসছে মানুষের হৃদয়ে—ভোলা জার্মান বিয়ে করে ইংলণ্ডে থেকে গেছে: দীনেন জার্মান বিয়ে করে পাড়ি দিয়েছে ল্যাটিন আমেরিকায়: গীতি বাঙালী বিয়ে করে ফিরে ফিরে গেছে ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পদ, জ্ঞান, প্রেম সঙ্গে করে নিয়ে। এই নতুন জানা, মেলা, বিনিময়ের পথকে রুদ্ধ করতে পারবে না, ইংলণ্ডের ইমিগ্রেশন ল কিংবা ভারতবর্ষের ভারতীয়দের জন্য স্টার্লিং-ডলার-দারিদ্র্যের ব্যর্থ কারাগার! নতুন যুগ আরম্ভ হয়েছে—ভারতবর্ষ আর ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ আর ইউরোপ, ভারতবর্ষ আর আমেরিকা, ভারতবর্ষ আর রাশিয়া, ইংলিশ চ্যানেল পারাপার করার মতোই নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। স্বপন আসবে সেই নতুন যুগের এ্যামবেসেডর হয়ে: কিছু দেবে, কিছু ঝেড়ে ফেলবে, কিছু নেবে, কিছু ছেড়ে দেবে: আদানে-প্রদানে, জ্ঞানে প্রেমে সার্থক করে তুলবে নতুন যুগের সূচনা! সবিতার

মতো ব্যর্থতা নিয়ে, অপচয় নিয়ে, পঙ্গুতা নিয়ে তারা ফুরিয়ে যাবে না নিশ্চয়ই! দুর্বার রুক্ষ ইংলিশ চ্যানেলের সঙ্কীর্ণ যাত্রাটুকুর কষ্ট সয়ে উঠতে পারলে, সহজতর উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে সুন্দর পরিবেশময় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রান্ত-জীবনের সুবিস্তৃত অভিযান। সে অভিযানে এগিয়ে যাওয়ার সাহস হয়েছিল আমার, সবিতা মনে-মনে বললে, কিন্তু ক্ষমতা ছিল না, শক্তি ছিল না আমার তাকে সার্থক করে তোলার।

সবিতা সোফায় বসেছিল, কার্পেটের ওপর ওর পায়ের কাছে বসেছিল মায়া, সবিতা মায়ার মাথা বুকে টেনে আস্তে-আস্তে বললে, I want to bless you, my darling! আমি তোমাকে আশীর্বাদ করতে চাই!

মায়া হ্যার-ড্রেসার থেকে সযত্নে তৈরি করা চুলের মায়ায় মাথা সরিয়ে নিলে না। মনে-মনে ভাবলে মার নিশ্চয় নেশা হয়েছে শ্যাম্পেন ড্রিঙ্ক করে: অভ্যাস তো নেই! সে তার বুদ্ধিতে, প্রেমে উজ্জ্বল চোখ তুলে বললে, Please bless me, Ma!

দীনেন ব্যাপারটা লক্ষ্য করে গ্লাসসুদ্ধ হাত বাড়িয়ে বললে, Let's drink for the Mother's blessing!

চিয়ারস!

সকলে গ্লাসসুদ্ধ হাত বাড়িয়ে এক সুরে হেসে বললে, চিয়ারস!

সবিতা লজ্জায় মুখ সরিয়ে নিলে না, শ্যাম্পেনপানরতা নতুন সাহসে, সগর্বে, সপ্রেমে মায়ার কপালে চুম্বন রেখে দিলে চিরদিনের জন্যে!
